দক্ষিণ পশ্চিম বঙ্গের ইতিহাস

(প্রাচীন যুগ)

কান্তি প্রসন্ন সেনগুপ্ত

দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাস

[প্রাচীন যুগ]

কান্তিপ্রসন্ন সেনগুপ্ত

অধ্যাপক, তাম্রলিপ্ত মহাবিদ্যালয়

কে পি বাগচী এ্যাণ্ড কোম্পানী

কলকাতা

প্রথম প্রকাশ : ১৯৮৭

ISBN 81-7074-004-5

কে পি বাগচী এ্যাণ্ড কোম্পানী, ২৮৬ বি. বি. গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত এবং ইন্দ্রলেখা প্রেস, ১৬, হেমেন্দ্র সেন স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০০৬ হইতে মুদ্রিত।

উৎসর্গ

শ্রদ্ধেয় বৌদি

(যিনি আমার দাদা শ্রদ্ধেয় শ্রীশান্তি প্রসন্ন সেনগুপ্তের কর্মজীবনের প্রায় সবটাই মেদিনীপুর জেলায় কাটিয়েছেন)।
স্বর্গত সন্ধ্যা সেনগুপ্তের পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশ্যে নিবেদিত হল।

ভূমিকা

স্নাতক পর্যায়ে দক্ষিন-পশ্চিম বাংলার ইতিহাসকে পাঠ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত করে, ইতিহাসের পাঠ্যক্রমে বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয় একটি নতুন দৃষ্টান্তের সৃষ্টি করেছে বলেই আমার বিশ্বাস। ইতিহাস মূল্যায়নের ক্ষেত্রে সার্বিক ইতিহাসের পাশাপাশি ক্ষুদ্র এবং নাতিক্ষুদ্র অঞ্চলগুলির ভূমিকা সঠিক অনুপাতে বিশ্লেষণ না করলে ইতিহাস-চর্চার গভীরতা অনেকাংশে অসম্পূর্ণ থেকে যায়। নবজাতক এই বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম নির্মাতাগণ স্নাতক (সাম্মানিক) স্তরেই ছাত্র-ছাত্রীদের আঞ্চলিক ইতিহাসের সঙ্গে পরিচিত করাবার কাজটিকে যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে নিঃসন্দেহে একটি বলিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গি এবং দূরদর্শীতার পরিচয় দিয়েছেন।

সামগ্রিক বাংলার ইতিহাসে দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলা, বিশেষতঃ মেদিনীপুর জেলার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। এই অঞ্চলের প্রাচীনতম যুগ থেকে ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ধারাবাহিক ইতিহাসকে প্রণিধানযোগ্য করে তোলা একটি আকর্ষণীয় অথচ জটিল কাজ। অতি প্রাচীন এবং প্রাচীন যুগের ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ করা অধিকতর দুরূহ। এই গুরু দায়িত্বটি পালন করতে অগ্রসর হয়ে ডাঃ কান্তিপ্রসন্ন সেনগুপ্ত তাঁর নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন।

বলা বাহুল্য, বিষয়টি সম্পর্কে উপযোগী পাঠ্য পুস্তকের অভাব রয়েছে। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বসুর গ্রন্থখানি একমাত্র নির্ভরযোগ্য পুস্তক ছিল, কিন্তু অধুনা ঐ পুস্তক পুণর্মুদ্রণের অভাবে দুষ্প্রাপ্য। শ্রীমান কান্তিপ্রসন্ন আমার প্রাক্তন ছাত্র, এবং তমলুক কলেজের ইতিহাস বিভাগের প্রধান ও একজন অভিজ্ঞ অধ্যাপক হিসেবে সুপরিচিত। মিশনারীদের বঙ্গদেশে শিক্ষাপ্রসারের ও অন্যান্য ক্ষেত্রে অবদান সম্পর্কিত তাঁর গবেষণা—গ্রন্থটি বিদেশী গবেষকদেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করে উচ্চমানের প্রশংসা লাভ করেছে। তমলুক কলেজে দীর্ঘকাল অধ্যাপনার কাজে যুক্ত থাকায় মেদিনীপুর জেলা তথা দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলাকে তিনি বিশেষভাবে জানার সুযোগ পেয়েছেন।

শ্রীমান কান্তিপ্রসন্নর কঠোর পরিশ্রমের স্বাক্ষর বহনকারী দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলার এই প্রাচীনকালের ইতিহাসটি শিক্ষক-শিক্ষিকা ও ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে বিশেষভাবে আদৃত হবে। গ্রন্থখানিতে সাতটি সুপরিকল্পিত অধ্যায়ে স্নাতক পর্যায়ের পাঠ্যসূচীকে আলোচনা করা হয়েছে। প্রাচীন যুগে বাংলার জনপদ

সমূহ থেকে আরম্ভ করে শেষ পর্যায়ে ঐ অঞ্চলের প্রাচীন যুগের সাংস্কৃতিক বিবর্তনের ধারাকে উপস্থাপিত করা হয়েছে। একটি পৃথক অনুচ্ছেদে স্থান পেয়েছে তাম্রলিপ্তের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ।

এই পুস্তকটি ইতিহাসের (সাম্মানিক) ছাত্রদের দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলার পাঠ্যপুস্তকের অভাব অনেকাংশে পূর্ণ করতে পারবে এই আশা রাখছি।

অক্টোবর, ১৯৮৬

ভূপেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

নিবেদন

নবপ্রতিষ্ঠিত বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৮৫ সাল থেকে স্নাতক সাম্মানিক স্তরে "দক্ষিণ পশ্চিমবঙ্গের" ইতিহাস পাঠ্যাতালিকাভুক্ত হয়েছে। বিদেশে আঞ্চলিক ইতিহাস পঠন-পাঠনের চর্চা শুরু হলেও এ দেশে এই উদ্যোগ অভিনব। স্বাভাবিক কারণেই গতানুগতিক ধারা থেকে সরে আসার ফলে, তা নিয়ে প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি হয়। এর প্রথম প্রতিক্রিয়াটা হয়েছে শিক্ষক মহলে। তার কারণ খুবই সহজ, যে বিষয়টা পড়াবার জন্য ধার্য করা হল, যে বিষয়ে কোন পাঠ্যপুস্তক নেই। পাঠ্যতালিকায় যে সব বইয়ের নাম আছে তারমধ্যে এখনও কিছু আছে যা কোনভাবেই ইতিহাস গ্রন্থ বলা চলে না। আবার এমন অনেক বই আছে যার উল্লেখ খুবই প্রয়োজনীয় ছিল।

ঘটনাক্রমে কলেজে এ বিষয়টি পড়াবার দায়িত্ব আমাকে নিতে হয়। স্বাধীনতার বছর কাঁথি কলেজে ছাত্রজীবন শুরু করে কর্মজীবনের গোড়া থেকে দীর্ঘ ৩০ বছরের উপর এ অঞ্চলেই কেটে গেছে। এছাড়া ১০ বছরের উপর "তাম্রলিপ্ত সংগ্রহশালা ও গবেষণা কেন্দ্র" প্রতিষ্ঠা ও সংগঠনের কাজে যুক্ত থাকায় এ অঞ্চলের ইতিহাস গভীরভাবে জানবার ও চর্চা করার সুযোগ ঘটে।

তাই বিষয়টা পড়াতে গিয়ে প্রথমেই মনে হয়েছে, যাঁরা এই পাঠক্রম রচনা করেছেন তাঁরা খুবই আশাবাদী। প্রাচীনতম কাল থেকে আরম্ভ করে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত ঘটনাপ্রবাহকে বিশ্ববিদ্যালয়ের দু'বছর সময়সীমার মধ্যে তৈরী করা খুব কষ্টসাধ্য, প্রায় অসম্ভবই বলা চলে। পাশের পাঠ্যক্রমে ভারতবর্ষের ইতিহাসকে যেমন ভাগ করা হয়েছে এখানেও সে রকম করলে ব্যাপারটা অনেক সহজ হত। এছাড়া বিস্তারিত পাঠ্যক্রম একটু অদল বদল করে সাজালে তা আরও বিজ্ঞানসম্মত হত। এখানে দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গের প্রাচীন ভৌগোলিক সীমা সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তাতে কোন স্পষ্ট ছবি ফুটে ওঠে না।

যখন পড়াতে আরম্ভ করেছি, সে সময় আমার প্রেসিডেন্সী কলেজের শ্রদ্ধেয় শিক্ষক, বর্তমানে বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মহাশয়ের সঙ্গে কথা হয়। আমার অসুবিধের কথা সব শুনে বললেন, যখন বিষয়টা তৈরীই করছ তখন একট পাঠ্যপুস্তক লিখেই ফেল না? উনি জানতেন এর ঠিক কিছুদিন আগে পশ্চিমবঙ্গ পুস্তক পর্ষদের" একটি বই লিখে জমা দিয়েছিলাম। এই আলোচনার,

পরেই লেখাটা আরম্ভ হয় এবং কলকাতার এক বিখ্যাত প্রকাশক সংস্থা তা ছাপতেও রাজী হয়। লিখতে গিয়ে দেখা গেল ছাত্রছাত্রীদের জন্য বিষয়কে পুস্তক আকারে সাজাতে গিয়ে অনেক পরিশ্রম ও সময় লাগছে। তাই শ্রদ্ধেয় উপাচার্য মহাশয়ের পরামর্শেই যেমন যেমন তৈরী হচ্ছে তখন তেমন বিভিন্ন পর্বে (প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক) প্রকাশের ব্যবস্থা হয়েছে। আশা করা যায় যতটা সম্ভব কম সময়ের ব্যবধানেই অন্য পর্বগুলোও প্রকাশ করা যাবে।

পুস্তকের এই পর্বের বিষয় সাজাবার পরিকল্পনা সম্পর্কে কিছু বলা প্রয়োজন মনে হয়। প্রথম অধ্যায়ে দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গের ভৌগোলিক পরিচয় দেবার পর এখানকার প্রাচীন জনপদসমূহের বিবরণ প্রথমেই "তাম্রলিপ্তের" শুধু উল্লেখ করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রাক্‌গুপ্ত, গুপ্ত ও গুপ্তোত্তর, তৃতীয় অধ্যায়ে গৌড়েশ্বর শশাংক ও তাঁর পরবর্তী প্রাক্ পাল পর্ব, চতুর্থ অধ্যায়ে "পাল" এবং পঞ্চম অধ্যায়ে "সেন" যুগের ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত ধারা বর্ণনা প্রসঙ্গে 'দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গের' সঙ্গে এদের রাজনৈতিক সম্পর্ক ও যোগাযোগের বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে পাঠ্য তালিকায়, ১, ২, ৪, ৭ প্রভৃতি অংশে উল্লিখিত বিভিন্ন বিক্ষিপ্ত বিষয়কে একত্রিত করে "তাম্রলিপ্ত" সম্বন্ধে একটি গবেষণামূলক বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে।

সপ্তম অধ্যায়ে পাঠ্যতালিকায় ২য় অংশে যে প্রাচীন জনগোষ্ঠীর উল্লেখ আছে, তার সঙ্গে ১০ম অংশের পাল-সেন যুগের সমাজ ও সংস্কৃতির ইতিহাস একসঙ্গে বিস্তারিতভাবে লেখা হয়েছে। জনগোষ্ঠীর পূর্ণাঙ্গ পরিচয়ের পরই তাদের সমাজ, অর্থনীতি, ধর্ম ও সাংস্কৃতিক জীবনের আলোচনা যুক্তিসঙ্গত বলে মনে হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে 'দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গের' তথা বঙ্গদেশের প্রাচীন ইতিহাসের বিশেষ একটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ একান্ত প্রয়োজন। আর্য পূর্বযুগে বঙ্গদেশের রাজনৈতিক অবস্থা কি ছিল, তা সঠিক বলা সম্ভব নয়। মনে হয় তখনকার বিভিন্ন অঞ্চলে স্বাধীন বা অর্ধস্বাধীন জনগোষ্ঠী বিদ্যমান ছিল। আর্যদের অধিকার পূর্বদিকে প্রসারিত হলে, তাঁদের দৃষ্টি স্বাভাবিকভাবেই বঙ্গদেশের দিকে নিবদ্ধ হয়। এ ব্যাপারে তাঁরা কতটা সফল হয়েছিলেন তাও বলা সম্ভব নয়। তবে মৌর্য ও গুপ্ত সম্রাটগণ বঙ্গদেশে এসেছিলেন ও কিছু কিছু অঞ্চল অধিকার করেছিলেন বলে অনুমান করা হয়। গুপ্ত পরবর্তী যুগে বঙ্গদেশের শক্তিশালী রাজারা

শশাংক, পাল ও সেন) নিজেদের রাজ্যসীমার বাইরে সাম্রাজ্য গঠনের স্বপ্ন দেখেছিলেন এবং তাতে অনেকে সফলও হয়েছিলেন। অর্থাৎ সে সময় বঙ্গদেশের রাজারা ছিলেন অন্যান্য ভারতীয় রাজাদের মত সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। তাঁরা কারো অধীন ছিলেন না। প্রাচীন বঙ্গদেশের রাজনীতির এই বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কথা মনে রাখা একান্ত আবশ্যক। কারণ মধ্যযুগের সূচনা থেকেই এর পরিবর্তন ঘটতে থাকে।

'দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গে'র ইতিহাসের পাঠ্যসূচী নিয়ে মনে নানা প্রশ্ন ছিল, এখনও কিছু আছে। তবে গভীরভাবে অনুশীলনের ফলে একটা বিশ্বাস বদ্ধমূল হয়েছে যে, ঠিকভাবে অধ্যয়ন করলে এতে বঙ্গদেশের সামগ্রিক ইতিহাসের ধারা খুব ভালো করে অনুধাবন করা যাবে। এ ভাবে জানার বা বোঝবার চালু পাঠ্যসূচীতে একেবারেই ছিল না।

পরবর্তী পর্যায়ে স্নাতকোত্তর স্তরে এই ইতিহাস আরো বিশেষভাবে পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা নিশ্চয়ই থাকবে আশা করা যায়। সেক্ষেত্রে 'দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গের' ইতিহাসের বিভিন্ন পর্বে নানা বিষয়ে উচ্চতর গবেষণার সুযোগ আসবে। এই ধরণের একটা পরিপূর্ণতার মধ্য দিয়েই এই পাঠ্যক্রম চালু করার সত্যিকার সার্থকতা। এই পাঠ্যক্রম সমগ্র বঙ্গদেশের ইতিহাসের বৃহত্তর পটভূমিকাতেই একমাত্র 'দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গে'র ইতিহাস পাঠ করা সম্ভব। বৃহত্তর যে পটভূমিকা বাদ দিয়ে, এই অঞ্চলের ইতিহাসের গতি বা প্রকৃতি কিছুই বোঝা বা বোঝান একেবারেই সম্ভব নয়। ফলে দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাস পঠন-পাঠনের অর্থই হচ্ছে বঙ্গদেশের ইতিহাসের সামগ্রিক ধারাকে আরও গভীরভাবে জানা।

এই পুস্তক রচনাকালে বহু শ্রদ্ধাভাজন, বন্ধুস্থানীয় ও স্নেহভাজন ব্যক্তির কাছে বুদ্ধি, পরামর্শ ও অকাতর সাহায্য পেয়েছি। এদের সকলের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। এদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলেন, শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক কল্যাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, অধ্যাপক কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত, অধ্যাপক সুনীল দাশগুপ্ত, অধ্যাপক কানাইলাল চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক চিত্র অধিকারী, অধ্যাপক বিনয় চৌধুরী, অধ্যাপক কল্যাণ রুদ্র, অধ্যাপক পশুপতি দাশগুপ্ত ও শ্রীপ্রদীপ রায় এবং শ্রী অশোক মুখোপাধ্যায়।

আমার স্নেহভাজন ছাত্র শ্রীবাণীব্রত ত্রিপাঠীর নিরলস সাহায্য ছাড়া এই দুরূহ কাজ এত কম সময়ে কিছুতেই করা সম্ভব হত না।

আমাদের কলেজের গ্রন্থকারিক শ্রীনন্দলাল বেরা ও তার সহকর্মীরা আমার

অত্যাচার সব সময়ই হাসিমুখে সহ্য করেছেন। এছাড়া বিশেষভাবে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ও অন্যান্য পাঠাগার থেকেও সব সময় সাহায্য পেয়েছি।

শ্রদ্ধেয় উপাচার্য শ্রীভূপেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই পুস্তকের দীর্ঘ ভূমিকা লেখায় আমি খুবই কৃতজ্ঞ। তাঁর পরামর্শ ও উৎসাহ ছাড়া এই কাজে হাত দেবার কথা হয়ত চিন্তাই করতাম না।

আমার স্ত্রী অধ্যাপক শুভা সেনগুপ্ত ও পুত্র শ্রীমান অরিজিৎ সেনগুপ্তও সবসময়ই এই কাজে আমাকে নানাভাবে সাহায্য করেছে।

বিখ্যাত কে পি বাগচী প্রকাশনার কর্তৃপক্ষ বিশেষ করে কনকবাবুর কথা বিশেষভাবে উল্লেখের অপেক্ষা রাখে। তাঁদের উৎসাহ ও আগ্রহেই এই পুস্তক ছাপান সম্ভব হচ্ছে।

সবশেষে সহকর্মী অধ্যাপকমণ্ডলী ও ছাত্র সমাজের কাছে একটি আবেদন রাখব। বহু প্রামাণ্য গ্রন্থ এবং গবেষণালব্ধ তথ্য আহরণ করলেও এই পুস্তকের পরিকল্পনা ও বিশ্লেষণ সম্পূর্ণ আমার নিজস্ব। সে ক্ষেত্রে কোথাও কিছু ত্রুটি বা বিচ্যুতি থাকতেই পারে। বিশেষ করে এইটি যখন এ বিষয়ে একটি প্রথম প্রয়াস। সে রকম কিছু নজরে এলে আমাকে জানালে বাধিত হব। যাদের কথা মনে রেখে বইটি লিখতে উদ্যোগ নিয়েছি, তাঁদের কাছে যদি এটি গ্রহণযোগ্য হয় তাহলেই সকল পরিশ্রম সার্থক বলে মনে করব।

১৭. ১১. ১৯৮৬ **কান্তিপ্রসন্ন সেনগুপ্ত**

২৯এ, পণ্ডিতিয়া রোড
কলিকাতা ৭০০০২৯
৪২-৫৬৩৭

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

প্রাচীন ভৌগোলিক সীমা

দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গের ভৌগোলিক সীমা নির্ধারণ করিতে গেলে তাহা সমগ্র বঙ্গদেশের প্রাচীন ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যেই করিতে হইবে।

প্রাচীন বঙ্গদেশের ভৌগোলিক সীমানা মোটামুটি উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, পূর্বে ব্রহ্মদেশ ও পশ্চিমে স্বর্ণরেখা নদী পর্যন্ত প্রসারিত ছিল বলিয়া মনে করা হয়। অতীতকালে বঙ্গদেশকে প্রকৃতি মোটামুটি চারিটি প্রধান ভাগে ভাগ করিয়াছিল। যাহা অনেক সময় প্রাচীন রাজনৈতিক বিভাগের সঙ্গে প্রায় সমতুল্য। গঙ্গার উত্তর এবং ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিমে বিস্তীর্ণ অঞ্চল তখন পুণ্ড্রবর্ধন নামে পরিচিত ছিল। বিখ্যাত বরেন্দ্র অঞ্চল ছিল ইহার অন্তর্গত। ভাগীরথীর পশ্চিমের বিস্তীর্ণ অঞ্চলের নাম ছিল বর্ধমানভুক্তি, ইহার অন্তর্গত ছিল বিখ্যাত রাঢ় অঞ্চল। ভাগীরথী, পদ্মা ও নিম্ন ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনার মধ্যবর্তী অঞ্চলকে বলা হইত বঙ্গ। টলেমী ও প্লিনির মতে এইখানেই ছিল বিখ্যাত গঙ্গারিডি অঞ্চল। কালিদাসের বর্ণনায় ইহাকেই "বঙ্গ" বলা হইয়াছে। কালিদাসের মতে এই অঞ্চলে নৌ পরিচালনায় দক্ষ লোকেদের বাসস্থান ছিল। মেঘনার পূর্বদিকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত অঞ্চলকে বলা হইত সমতট। অবশ্য খুব স্বাভাবিক কারণেই প্রকৃতির দ্বারা বিভক্ত এই চারিটি অঞ্চলের সীমা-রেখা মাঝেমাঝেই পরিবর্তিত হইত।

বঙ্গদেশের প্রকৃতির বিশেষ বৈশিষ্ট্য হইল ইহার নদী সমূহ। ইহাদের মধ্যে ব্রহ্মপুত্র এবং গঙ্গা তাহার শাখা প্রশাখার দ্বারা বঙ্গদেশের সমস্ত অঞ্চল আবৃত করিয়া রাখিয়াছে এবং ইহা বঙ্গদেশের ভাগ্যকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। নদী প্রবাহের গতি পরিবর্তন তাই প্রায় সব সময়ে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের কারণ হইয়াছে।

গঙ্গা বিহার হইতে রাজমহল পাহাড়ের নিকট বঙ্গদেশে প্রবেশ করিয়াছে। এইখানকার দুইটি সংকীর্ণ গিরিপথ (তেলিয়াগঢ়ি ও সক্রিকলি) ছিল বাহিরের আক্রমণ হইতে বঙ্গদেশ প্রতিরক্ষার প্রধান কেন্দ্র। গঙ্গা বঙ্গদেশে প্রবেশ করিয়া গৌড়ের দক্ষিণ দিক দিয়া আরো প্রবাহিত হইবার পর দুইভাগে বিভক্ত হইয়াছে। তাহার একটি শাখা প্রথমে ভাগীরথী ও পরে হুগলী নামে দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত

এবং অন্য শাখা পদ্মা নামে দক্ষিণ পূর্বদিকে প্রবাহিত। এই পদ্মা দিয়াই গঙ্গার প্রধান জলপ্রবাহ চলিয়া যায়।

গঙ্গার নিম্নশাখা ও পদ্মার নিম্নশাখায় পরে বহু নদী মিশিয়াছে। তাহার মধ্যে অজয় প্রধান। এই জলধারা হুগলীর ত্রিবেণীর নিকট তিনভাগে বিভক্ত হইয়াছে। তাহার একটি সরস্বতী সাতগাঁও (পূর্বেকার সপ্তগ্রাম) এর দক্ষিণ-পশ্চিমে প্রবাহিত। অপরটি যমুনা দক্ষিণ-পূর্বদিকে প্রবাহিত। মধ্যেকার প্রধান শাখাটি প্রথমে ভাগীরথী পরে নীচের দিকে হুগলী নামে কলিকাতা হইতে আদিগঙ্গা, কালিঘাট, বারুইপুর, মগরা হইয়া সমুদ্রে মিশিয়াছে।

অনেকে মনে করেন সরস্বতীর প্রবাহ বর্তমান তমলুকের নিকট আসিয়া রূপনারায়ণ দামোদর ও অন্যান্য অনেক ছোট নদী প্রবাহের সহিত মিশিয়াছে। খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী নাগাদ সরস্বতীর এই প্রবাহমুখে পলি জমিতে থাকে এবং সম্ভবত সেইজন্য বন্দর নগরী তাম্রলিপ্তের গৌরবলুপ্ত হয় এবং তাহার স্থান অধিকার করে সাতগাঁও বা সপ্তগ্রাম। চতুর্দশ হইতে ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যে ভাগীরথীর স্রোতধারা পরিবর্তিত হওয়ায় সপ্তগ্রামের গৌরবও অস্তমিত হয়। তাহার স্থান প্রথমে অধিকার করে হুগলী ও পরে কলিকাতা। সরস্বতী নদী বর্তমানে মৃত এবং ভাগীরথী ও হুগলীও পূর্বেকার গতি পরিবর্তন করিয়াছে। বঙ্গদেশের প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিক পরিবেশের উপর নদী প্রবাহের (বিশেষভাবে গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র) প্রভাব অপরিসীম। এই দুইটি নদীর শাখা প্রশাখা বঙ্গদেশের ভাগ্য নির্ণয়ে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করিয়াছে।

বিভিন্ন সময়ে রাজনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নূতন করিয়া বিভিন্ন অঞ্চলের সীমারেখা টানা হইত। সেইজন্য প্রাচীন যুগে সমগ্র বঙ্গদেশের একটা বিশেষ নাম দেখা যায় না। ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চল ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত ছিল। যেমন উত্তরবঙ্গে পুণ্ড্র ও বরেন্দ্র (বরেন্দ্রী), পশ্চিমবঙ্গে রাঢ় ও তাম্রলিপ্ত, দক্ষিণ ও পূর্ববঙ্গে বঙ্গ সমতট, হরিকেল এবং বঙ্গাল প্রভৃতি দেশ ছিল। উত্তর পশ্চিমবঙ্গের কতকাংশ আবার গৌড় নামে সুপরিচিত ছিল। ইহাদের সীমা ও বিস্তৃতি সঠিকভাবে নির্ণয় করা সম্ভব নয়। কারণ বিভিন্ন সময়ে তাহার হ্রাস বা বৃদ্ধি পাইত।[১]

মধ্যযুগে সম্ভবতঃ বাঙ্গলা নামের উৎপত্তি হইয়াছিল। আবুল ফজলের মতে, এই দেশের প্রাচীন নাম ছিল বঙ্গ। এই দেশের রাজারা প্রাচীনকালে প্রকাণ্ড ও বিস্তৃত "আল" (বাঁধ) নির্মাণ করিতেন। মনে হয় ইহার জন্যই বাঙ্গাল বা বাঙ্গলা নামের উৎপত্তি; অবশ্য এ অনুমান সত্য নাও হইতে পারে।[২]

ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক সীমা ভূ-প্রকৃতি, জনবসতি ও ভাষার সমতার দ্বারা নির্মিত হয়। জনবসতি ও ভাষার ঐক্যের মাধ্যমে বঙ্গদেশের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য একদিনে গড়িয়া উঠে নাই। নানা ঘটনার মধ্য দিয়া ধীরে ধীরে দানা বাঁধিতে আরম্ভ করিয়া মধ্যযুগে পূর্ণভাবে প্রকাশিত হয়। বঙ্গদেশের বিভিন্ন জনপদরাষ্ট্র পুণ্ড্র, গৌড়, সুহ্ম, রাঢ়, তাম্রলিপ্ত, সমতট, বঙ্গ, বঙ্গাল, হরিকেল প্রভৃতি নিজস্ব রাষ্ট্রস্বাতন্ত্র্য বিলোপ করিয়া এক অখণ্ড ভৌগোলিক রাষ্ট্রীয় ঐক্য-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া এক বঙ্গ বা বাংলা নামে যখন অভিহিত হইতে আরম্ভ করিল বঙ্গদেশের ইতিহাসের প্রথম পর্ব তখন প্রায় শেষ হইয়া গিয়াছে।[৩]

প্রাচীন বঙ্গদেশের সামগ্রিক এই ভৌগোলিক সীমার মধ্যে দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গের সীমানা যথাযথভাবে নির্ধারণ করা খুব সহজসাধ্য নহে। কারণ বারেবারেই নানা রাজনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই সীমারেখা নূতন করিয়া টানিতে হইয়াছিল। তবে মোটামুটিভাবে প্রাচীনকালে দক্ষিণ পশ্চিমবঙ্গের ভৌগোলিক সীমা একদিকে, নিম্ন দামোদর হইতে অন্যদিকে রূপনারায়ণ হইয়া সমুদ্র পর্যন্ত প্রসারিত ছিল বলিয়া মনে হয়। এই সীমারেখার মধ্যে প্রাচীনকালে বিখ্যাত জনপদ যথা রাঢ়, সুহ্ম, ও বঙ্গ অন্তর্ভুক্ত ছিল বলিয়া মনে করা হয়। কারণ প্রাচীন ভারতীয় মহাকাব্যগুলিতে ও পুরাণে এবং বৌদ্ধ কাব্যগ্রন্থ ও জাতক কাহিনীতে যে সব ঘটনার বর্ণনা আছে তাহাতে এইরূপ মনে করার যথেষ্ট সঙ্গত কারণ আছে।

দক্ষিণ-রাঢ় সুহ্ম

কালিদাসের রঘুবংশ কাব্যে রঘুর দিগ্বিজয় সম্পর্কে সুহ্মদের উল্লেখ আছে। কবি সুহ্ম বংশীয়দের বেতসলতার সহিত তুলনা করিয়াছেন। ইহাতে তাহাদের লোকপ্রকৃতি সম্বন্ধে ইঙ্গিত আছে কিনা বলা শক্ত।

মহাবীর ও তাহার কয়েকজন শিষ্যকে ধর্মপ্রচারের জন্য রাঢ় দেশে ও সুহ্ম-ভূমিতে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইয়াছিল। (আঃ খ্রীঃ পূর্বঃ ষষ্ঠ শতক)। জৈনদের ধর্মগ্রন্থ "আচারঙ্গ সূত্রে" ইহা বর্ণিত আছে। এই কাহিনীতে এই অঞ্চলের অধিবাসীদের রূঢ় আচরণ ও কুখাদ্য ভক্ষণের ইঙ্গিত দিয়াছেন। "আর্যমঞ্জুশ্রী মূলকল্প" গ্রন্থে (অষ্টম শতক) পুণ্ড্রের ভাষাকে আসুরভাষা বলা হইয়াছে। মহাভারতে সমুদ্র তীরবর্তী অধিবাসী বঙ্গদের ম্লেচ্ছ এবং ভাগবত পুরাণে সুহ্মদের "পাপ" কোম বলা হইয়াছে। "বোধায়ন ধর্মসূত্রে" মধ্যদেশ বা আর্যাবর্ত হইতে বঙ্গদেশে গিয়া ফিরিয়া আসিলে প্রায়শ্চিত্ত বিধানের কথা

আছে। এই দুই দেশ "অশিষ্ট" ভূমির অন্তর্গত। অবশ্য মনে রাখা প্রয়োজন আর্য সংস্কৃতি সম্পন্ন লোকেদের আর্য পূর্বজাতির ভাষা, সংস্কৃতি ও আচার ব্যবহার সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান ছিল না। এবং তাহাদের প্রতি শ্রদ্ধা বা ভক্তি একেবারেই ছিল না। ফলে তাহাদের ইহারা খুবই অবজ্ঞার চোখে দেখিতেন।[৪]

নবম-দশম শতাব্দী হইতে রাঢ়ের দুইটি সুস্পষ্ট বিভাগ দেখা যাইতেছে। উত্তর রাঢ় ও দক্ষিণ রাঢ় যাহা প্রাচীনকালের মোটামুটি বজ্জ বা ব্রহ্মভূমি ও সুহ্মভূমি। রাজেন্দ্র চোলের তিরুমলৈ লিপিতে (একাদশ শতাব্দী) উত্তীর লাঢ়ম (উত্তর রাঢ়) এবং তক্কন লাঢ়ম (দক্ষিণ রাঢ়) নাম পাওয়া যায়। অনুমান হয়, বর্তমান মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দি মহকুমা, সমগ্র বীরভূম জেলা ও বর্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমার উত্তরাংশ লইয়া উত্তর রাঢ়ের গঠিত ছিল। মোটামুটি অজয় নদী এই উত্তর রাঢ়ের দক্ষিণ সীমা ও দক্ষিণ রাঢ়ের উত্তর সীমা।

দক্ষিণ রাঢ় অঞ্চলের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় ৯৮১ খ্রীষ্টাব্দে বাক্‌পতি মুঞ্জের এক লিপিতে। ইহার দশ বছর পর শ্রীধর আচার্য লিখিত "ন্যায়কন্দলী" গ্রন্থে (৯৯১) ও ইহার উল্লেখ আছে। কৃষ্ণমিশ্রের "প্রবোধচন্দ্রোদয়" নাটকে (একাদশ/দ্বাদশ শতক) চোলদের লিপিতে (১০২৩/২৫), মধ্য প্রদেশের অমরেশ্বর মন্দিরের মান্ধাতা লিপিতে যাহা সম্ভবতঃ হলায়ুধ রচিত, ও কবিকঙ্কন মুকুন্দরামের "চণ্ডীমঙ্গলে" দক্ষিণ রাঢ়ের উল্লেখ আছে।

এই সমস্ত তথ্যানুসারে বর্তমান হাওড়ার ভুরসুট, হুগলী জেলার নবগ্রাম ও বর্ধমান জেলার দামুন্যা দক্ষিণ রাঢ়ের অন্তর্গত ছিল। দামুন্যা দামোদর নদের পশ্চিম তীরে অবস্থিত। এই বর্ণনা হইতে মনে হয় অজয় ও দামোদর নদের মধ্যবর্তী বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়িয়া প্রাচীন রাঢ় অবস্থিত ছিল। ইহার দক্ষিণ সীমান্ত দামোদর অতিক্রম করিয়া আরামবাগ মহকুমার অভ্যন্তর পর্যন্ত প্রসারিত ছিল। "দিগ্বিজয় প্রকাশে" লিপিবদ্ধ প্রাচীন ঐতিহ্য অনুসারে রাঢ়ভূমির উত্তরে দামোদর পর্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল বলা হইয়াছে। দক্ষিণ রাঢ়ের নিকটবর্তী একই রাজবংশের অধীন অপর একটি অঞ্চলের কথা বলা হইয়াছে। সম্ভবতঃ তাহা আরামবাগ মহকুমার মান্দারণ অঞ্চল।[৫]

কোন কোন প্রাচীন গ্রন্থে গঙ্গার উত্তর ভাগ রাঢ় দেশের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু সাধারণতঃ রাঢ় দেশ গঙ্গার দক্ষিণ ও পশ্চিমভাগে সীমাবদ্ধ ছিল। রাঢ়ের অপর নাম সুহ্ম। রাঢ়ের দক্ষিণে বর্তমান মেদিনীপুর জেলার তাম্রলিপ্ত ও দন্তভুক্ত দুইটি দেশ ছিল। ইহারা কখনও বঙ্গে আবার কখনও বা রাঢ়ের অন্তর্গত বলিয়া গণ্য হইত।[৬]

রাঢ় জনপদের দুইটি বিভাগের মধ্যে সুহ্ম বিভাগ প্রসিদ্ধ এবং সম্ভবতঃ প্রাচীনতর। সুহ্মের উল্লেখ আছে কর্ণ ও ভীমের দিগ্বিজয় প্রসঙ্গে। কর্ণ সুহ্ম, পুণ্ড্র ও বঙ্গজনদের পরাজিত করিয়াছিলেন। ভীমের দিগ্বিজয় প্রসঙ্গে তাঁহার পুণ্ড্র, বঙ্গ, তাম্রলিপ্ত প্রভৃতি সুহ্ম জনপদ রাজাদের পরাজয়ের কথা আছে। "দশকুমার চরিতে" তাম্রলিপ্তকে সুহ্মের অন্তর্গত বলা হইয়াছে। কালিদাস রঘুর দিগ্বিজয় প্রসঙ্গে যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহা হইতে মনে হয় রঘু গঙ্গা ভাগীরথীর পশ্চিম তীর দিয়া দক্ষিণ সাগরের দিকে অগ্রসর হইয়াছিলেন। ইহারই দক্ষিণ অংশের ভূ-ভাগ সুহ্ম নামে পরিচিত। ধোয়ীর "পবনদূত" কাব্যে গঙ্গার তীরবর্তী সুহ্মের উল্লেখ আছে এবং এই দিকে গঙ্গা-যমুনা সঙ্গমে ত্রিবেণী অতিক্রম করিয়া লক্ষ্মণসেনের রাজধানী যাইবার পথের ইঙ্গিত আছে ইহা হইতে অনুমান হয় গঙ্গা-ভাগীরথীর পশ্চিম তীরস্থ দক্ষিণ ভূভাগ (বর্তমান বর্ধমানের দক্ষিণ অংশ এবং হুগলী জেলার বহু অংশ এবং হাওড়া জেলার কিছু অংশ) প্রাচীন সুহ্ম। ইহাই পরবর্তীকালের দক্ষিণ রাঢ়। মহাভারতের টীকাকারের মতে সুহ্ম এবং রাঢ় এক এবং সমার্থক, হয়ত তখন সুহ্মের প্রভাব রাঢ় দেশ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। যেমন "দশকুমার রচিত" লেখকের মতে সেই সময় এই প্রভাব তাম্রলিপ্ত পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। কিন্তু সাধারণত রাঢ়ভূমির দক্ষিণতম অংশই সুহ্মভূমি নামে পরিচিত। বৌদ্ধ পালি গ্রন্থেও সুহ্মদের উল্লেখ আছে। কিন্তু তাহার অবস্থিতির কোন ইঙ্গিত নাই।[৭]

বঙ্গ

প্রাচীন বৈদিক সাহিত্যে বঙ্গদেশের কোন উল্লেখ নাই। পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ) আর্য অধ্যুসিত অঞ্চলের বাহিরে বলিয়া বঙ্গদেশের অধিবাসীদিগকে দস্যু নামে অভিহিত করা হইয়াছে। কেহ কেহ বাঙ্গালী জাতির উল্লেখ "ঐতরেয় আরণ্যক" গ্রন্থে আছে মনে করেন। এই গ্রন্থে একটি শব্দের শেষে বঙ্গ-মগধ কথাটির উল্লেখ আছে। কিন্তু এইসব তথ্যের উপর নির্ভর করিয়া কোন কিছু নিশ্চিন্ত ধারণা পাওয়া খুবই কঠিন।

বঙ্গদেশের নিশ্চিত উল্লেখ সর্বপ্রথম পাওয়া যায় প্রাচীন মহাকাব্য ও ধর্মসূত্রগুলিতে। "বোধায়ন ধর্মসূত্রে" আর্যদের পরিচিত ভূখণ্ডকে জাতিগত ও সংস্কৃতিগত দিক হইতে তিনটি ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে পবিত্রতম বিভাগ আর্যবর্ত, তাহার পরে মধ্যাঞ্চল এবং ইহার সর্বশেষ প্রান্ত অবস্থিত জাতিদের উল্লেখ করিতে গিয়া উত্তরবঙ্গে পুণ্ড্রদের এবং মধ্য ও পূর্ববঙ্গে

বাঙ্গালীদের উল্লেখ করা হইয়াছে। তাহাতে স্পষ্টভাবে এই কথা বলা হইয়াছে যে এই সর্বশেষ বিভাগের অধিবাসীরা বৈদিক সংস্কৃতির একেবারেই বাহিরে অবস্থিত। ইহাদের মধ্যে কোন আর্য ব্যক্তি অল্পদিনের জন্যও বসবাস করিয়া ফিরিয়া আসিলে তাহাদের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইত।

মহাভারতের যুগে অবশ্য বাঙ্গালীদের আর অপবিত্র বা অস্পৃশ্য বলিয়া গণ্য করা হইত না। রামায়ণে একদল জনগোষ্ঠীর তালিকা দেওয়া হইয়াছে যাহারা অযোধ্যার অভিজাতদের সহিত সম্পর্কস্থাপন করিয়াছিলেন। সীতাকে অনুসন্ধান করিবার জন্য পূর্বদিকে যে দলটি পাঠান হইয়াছিল তাহাদিগকে পুণ্ড্র বা মান্দার দেশ পরিভ্রমণ করিতে বলা হইয়াছিল। ইহা সম্ভবতঃ পশ্চিমবঙ্গের মান্দারন।

মহাভারতে ভীম যে সমস্ত দেশ পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন তাহার মধ্যে বঙ্গদেশের উল্লেখ আছে। মুঙ্গের ও অন্যান্য অঞ্চলের রাজাদের পরাজিত করিয়া তিনি বঙ্গদেশের রাজাকে আক্রমণ করেন এবং এখানে তাম্রলিপ্তের কৈবর্ত রাজাকে পরাজিত করেন ও পরে সুহ্মরাজাকে পরাস্ত করিয়া আসামের দিকে অগ্রসর হন। এই অভিযান কাহিনীতে দক্ষিণবঙ্গের সমুদ্র উপকূলবর্তী অনেক রাজার নাম পাওয়া যায়। এই অঞ্চলের লোকদের মহাভারতে "ম্লেচ্ছ" বলা হইয়াছে।

মহাভারতের বনপর্বে গঙ্গা যেখানে সমুদ্রে মিশিয়াছে তাহাকে পবিত্রস্থান বলিয়াছে।

জৈন লেখকগণ "আচরঙ্গসূত্র" গ্রন্থে রাঢ় দেশকে পথহীন জনপদ বলিয়াছেন। ইহার একটি উপাঙ্গে অবশ্য রাঢ় ও বঙ্গের অধিবাসীদের "আর্য" বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।[৮]

চন্দ্ররাজাদের মেহেরৌলি লিপিতে এবং ভাটপি চালুক্য রাজাদের প্রাচীনতম একটি নথিতে এবং কালিদাসের রঘুবংশে বঙ্গদেশের উল্লেখ পাওয়া যায়। বঙ্গদেশের পশ্চিম সীমান্ত সম্ভবত হুগলী জেলা অতিক্রম করিয়া কপিশা বা কাসাই নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। জৈন শাস্ত্রগ্রন্থে তাম্রলিপ্তকে বঙ্গ জনগোষ্ঠীর একটি শহর বলা হইয়াছে। অন্যান্য প্রাচীন সাহিত্যে কিন্তু তাম্রলিপ্তকে একটি স্বতন্ত্র জনপদ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।[৯]

বৃহৎ সংহিতায় এবং কিছু কিছু পালি বৌদ্ধ গ্রন্থে বঙ্গ, উপবঙ্গ, বঙ্গান্ত প্রভৃতি দেশের উল্লেখ আছে, কিন্তু তাহাদের কোন পরিচয় নাই। মনে হয় এই সব অঞ্চল বঙ্গ বা দক্ষিণবঙ্গের মত বৃহত্তর বঙ্গদেশের এক একটি অংশ ছিল কিন্তু তাহাদের সঠিক অবস্থান জানা যায় নাই। গুপ্ত আমলে বঙ্গের দুইটি বিভাগ ছিল মনে হয়। পাল ও সেন আমলে বঙ্গ পুণ্ড্রবর্ধন ভুক্তির অন্তর্গত বলিয়া বারবার বলা

হইয়াছে। কেশব সেন ও বিশ্বরূপ সেনের আমলে বঙ্গের অন্তত দুইটি বিভাগের নাম পাওয়া যায়। একটি বিক্রমপুর এবং অপরটি নাব্যমণ্ডল। ইহাতে দক্ষিণ পশ্চিমবঙ্গের কতকটা অঞ্চল অন্তর্ভুক্ত ছিল তাহা সঠিকভাবে নির্ণয় করা কষ্টসাধ্য

তাম্রলিপ্ত

প্রাচীন জনপদগুলির মধ্যে অন্যতম বিখ্যাত হইল তাম্রলিপ্ত মহাভারতে যাহার উল্লেখের কথা আগেই বলা হইয়াছে। এই জনপদের রাজনৈতিক অবস্থান পরবর্তীকালে নানাভাবে পরিবর্তিত হইয়াছে। জৈন প্রজ্ঞাপন যখন লিখিত হয় তখন তাম্রলিপ্তকে বঙ্গের অংশ বলা হইয়াছে অথচ "দশকুমার চরিতে" ইহাকে সুহ্মরাজ্যের অংশ বলিয়া উল্লেখ আছে। মহাভারতে আবার এই দুই জনপদকে আলাদা হিসাবে উল্লিখিত হইয়াছে। মনে হয় দশকুমার চরিতের বিবরণই অধিকতর গ্রহণযোগ্য।[১০]

ফা-হিয়েন, হিউয়েন-সাঙ, ইৎসিঙ প্রভৃতি চীনদেশীয় পরিব্রাজকগণও তাম্রলিপ্ত সম্পর্কে অনেক বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন। ষষ্ঠশতকে লিখিত বরাহমিহিরের বৃহৎ-সংহিতা গ্রন্থে তাম্রলিপ্তকে প্রাচীন বঙ্গদেশের অন্যান্য জনপদ অপেক্ষা একেবারে স্বতন্ত্র বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। ইহাতে মনে হয় তাম্রলিপ্ত জনপদটি নিজস্ব[১১] বৈশিষ্ট্যে প্রাচীনকালের লেখকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারিয়াছিল।

বিভিন্ন লিপি ও রচনাবলীর সাহায্যে প্রাচীন বঙ্গদেশের শাসনতান্ত্রিক বিভাগগুলির সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা করা সম্ভব। গুপ্তযুগে এই বিভাগগুলিকে ভুক্তি বলা হইত। গুপ্তযুগে বঙ্গদেশ মোটামুটি তিনটি প্রধান শাসনতান্ত্রিক বিভাগের উল্লেখ পাওয়া যায়। যথা পুণ্ড্রবর্ধন, বর্ধমান ও অন্যটি অজ্ঞাতনামা। এই বর্ধমানভুক্তির অন্তর্গত ছিল দক্ষিণ রাঢ় অঞ্চল। এই বিভাগের দক্ষিণ প্রান্ত দশম শতাব্দীতে সুবর্ণরেখার নিম্নাঞ্চল পর্যন্ত প্রসারিত ছিল। দক্ষিণ রাঢ়কে সরকারী নথিপত্রে সবসময় বর্ধমানভুক্তির অন্তর্গত বলিয়া স্পষ্টভাবে উল্লিখিত নাই। বরং এই বর্ধমানভুক্তির অন্তর্গত "দণ্ডভুক্তিমণ্ডল" নামে একটি অঞ্চলের উল্লেখ আছে। এই দণ্ডভুক্তি মণ্ডলের উল্লেখ "ইর্দা" লিপি, চোল লিপি এবং সন্ধ্যাকর নন্দীর "রামচরিত মানসে" উল্লিখিত আছে। পণ্ডিতগণ দণ্ডভুক্তিকে মেদিনীপুর জেলার দক্ষিণ-পশ্চিম ও পূর্বদক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত উড়িষ্যাও বঙ্গদেশের মধ্যেকার চলাচলের অঞ্চল বলিয়া সনাক্ত করিয়াছেন। এই দণ্ডভুক্তির নাম হইতে সুবর্ণরেখার অদূরে বর্তমান দাঁতনের নাম হইয়াছে বলিয়া তাঁহারা অনুমান করেন।

দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গের ভৌগোলিক অবস্থান সম্পর্কে বিভিন্ন সূত্রে যে তথ্য

পাওয়া যায় তাহা হইতে মোটামুটি একটি চিত্র অঙ্কন করা যাইতে পারে।

অঙ্গ, বঙ্গ ও কলিঙ্গ এই তিনটি জনপদ বিভাগ যখন হইতে স্বীকৃত তখন হইতে উড়িষ্যার গঞ্জাম পর্যন্ত অঞ্চল কলিঙ্গের অন্তর্ভুক্ত ছিল। বর্তমান মেদিনাপুর জেলার পশ্চিমাঞ্চল এই উড়িষ্যার (কলিঙ্গের) অন্তর্গত ছিল।

বর্তমান মেদিনীপুরের পূর্বাঞ্চল সুহ্ম বা তাম্রলিপ্তের অংশবিশেষ ছিল। অর্থাৎ প্রাচীনকাল হইতে উড়িষ্যার সহিত মেদিনীপুরের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত নিকট। খ্রীষ্টপূর্ব যুগে কলিঙ্গ ও তাম্রলিপ্ত উভয়েই বৌদ্ধ প্রভাবিত ছিল।

উড়িষ্যার সহিত দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গের[১২] এই যোগাযোগ মধ্য ও আধুনিক যুগেও কম বেশী পরিমাণে বজায় ছিল। কেহ কেহ মনে করেন বর্তমান মেদিনীপুর জেলার অধিকাংশ সুহ্ম রাজ্যের অন্তর্গত ছিল এবং প্রাচীন তাম্রলিপ্ত নগরী তাহার রাজধানী ছিল। কেহ বা এই দুই নামে দুইটি পৃথক রাজ্যের কথাও বলিয়াছেন। পরিশেষে বলা যায় দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গের (সুহ্ম ও তাম্রলিপ্ত রাজ্যের) উত্তর-পশ্চিমে পুণ্ড্র রাজ্য, পূর্বে বঙ্গ রাজ্য, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর ও দক্ষিণ-পশ্চিমে কলিঙ্গ রাজ্য ছিল।[১৩] অর্থাৎ বিভিন্ন সময়ে ইহার ভৌগোলিক সীমা উত্তর-পশ্চিমে দামোদর-অজয়ের তীর ধরিয়া বর্ধমান বাকুড়া-বীরভূম সীমান্ত, দক্ষিণ পশ্চিমে উড়িষ্যা, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর ও পূর্বে ২৪ পরগণা ও হুগলী হইয়াবঙ্গ রাজ্য পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। আগেই বলা হইয়াছে এই আনুমানিক সীমারেখা ছিল নানা প্রাকৃতিক ও রাজনৈতিক কারণে সর্বদা পরিবর্তনশীল।

সূত্র নির্দেশ

১। R. C. Majumdar, History of Bengal, Vol. I, p. 2-4 (1963) Dacca University

২। রমেশচন্দ্র মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস (প্রাচীনযুগ), (১৩৭৬), পৃঃ ১-২

৩। নীহাররঞ্জন রায়, বাঙ্গালীর ইতিহাস (১৯৮০), পৃঃ ৮৫

৪। পূর্বে উল্লিখিত, পৃঃ ১৩৭/৮

৫। History of Bengal, op. cit , p. 20

৬। মজুমদার, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ: ৭/৮

৭। নীহাররঞ্জন, পূর্বে উল্লিখিত পৃঃ ১৫২/৩

৮। History of Bengal, op. cit. p. 7-10

৯। নীহাররঞ্জন রায়, পূর্বে উল্লিখিত পৃঃ ১৪২/৩

১০। ঐ পূর্বে উল্লিখিত, পৃঃ ১৪৩/৪

১১। History of Bengal, op. cit., p. 13/15

১২] দীনেশচন্দ্র সরকার, "বন্দর নগরী তাম্রলিপ্ত" (ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে তাম্রলিপ্ত), ১৯৩২, পৃঃ ১০

১৩। যোগেশচন্দ্র বসু, মেদিনীপুরের ইতিহাস (১৩৪৬), পৃঃ ৯/১০

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রাচীন ইতিহাস

খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতক হইতে খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতক। (খ্রীঃ পূঃ ৩২৬- খ্রীষ্টীয় ৩২০)

বঙ্গদেশের প্রাচীন ইতিহাস অনেকটাই রহস্যাবৃত। কারণ এ যুগের ইতিহাস রচনা করিবার মত যথেষ্ট পরিমান তথ্যাবলী নাই। খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে বঙ্গদেশের ইতিহাসের এই রহস্যঘেরা আবরণ কিছুটা উন্মোচিত হইতে থাকে। এই সময় সমগ্র বঙ্গদেশ এবং সম্ভবত তাহার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল সমূহ একটি শক্তিশালী রাষ্ট্রের অধীনে আসিয়াছিল। গ্রীক ও ল্যাটিন লেখকগণ, 'গঙ্গারিডি' (Gangaridai) নামে এক জনগোষ্ঠীর উল্লেখ করিয়াছেন। এই শব্দটির প্রতিশব্দ কি তাহা বলা মুশ্‌কিল। তবে প্রাচীন পণ্ডিতগণ এই শব্দটির অর্থ "গঙ্গা অববাহিকার জনগোষ্ঠী" সম্ভবত ইহাই বোঝাইতে চাহিয়াছেন। কার্টিয়াস (Curtius), প্লুটার্ক (Plutarch) এবং সলিনাস (Solinus) প্রভৃতি লেখকগণ এই জনগোষ্ঠীকে গঙ্গার পূর্বতীরবর্তী অঞ্চল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। গ্রীক লেখক ডায়াডোরাস (Diodorious) ও তাহার লেখা একটি অংশে 'গঙ্গারিডি' ও 'প্রাসিয়োই' (Praisioy) এই দুই জনগোষ্ঠীর রাজারা প্রায় চারশত হস্তীসহ গঙ্গার তীরে যুদ্ধের জন্য সমবেত হইয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ডায়াডোরাস তাহার লেখায় আর এক জায়গায় বলিয়াছেন, এই 'গঙ্গনদী' প্রায় ৩০ মাইল চওড়া এবং ইহা সমুদ্রে গিয়া মিশিয়াছে। ইহারই পূর্বপ্রান্তে 'গঙ্গারিডি' জনগোষ্ঠীর অবস্থান। তাহার এই বর্ণনা হইতে অনেক লেখক অনুমান করেন যে, এই জনগোষ্ঠী সম্ভবত গঙ্গার পশ্চিমতীরে বাস করিত। কিন্তু তিনি এ সম্পর্কে কোন কিছু স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেন নাই। তিনি অন্য আর এক জায়গায় বলিয়াছেন যে গঙ্গা সুদূর ভারতের পূর্বাঞ্চলকে ইন্দোচীন হইতে পৃথক করিয়াছে। ডায়াডোরাসের বিভিন্ন উক্তি হইতে মনে হয় যে সিসিলির এই বিখ্যাত লেখক 'গঙ্গারিডি' দুইটি অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। ব্যাপক অর্থে তিনি এই জনগোষ্ঠীকে সম্ভবত বিপাশা হইতে গঙ্গা পর্যন্ত বিস্তৃত প্রায় সমগ্র উত্তরভারতের বসবাসকারী, অন্য অর্থে ইহাদের পূর্বভারতের পূর্বপ্রান্তে সীমাবদ্ধ অঞ্চলের বসবাসকারী জনগোষ্ঠী মনে করিতেন।[১]

প্লিনি বলিয়াছেন যে গঙ্গাপ্রবাহের শেষ অংশ 'গঙ্গারিডি' জনগোষ্ঠীর বাসস্থানের মধ্যদিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। টলেমীও বলিয়াছেন গঙ্গার শেষ প্রান্তে 'গঙ্গারিডি' জনগোষ্ঠীর বাসস্থান। তিনি অবশ্য তাম্রলিপ্তকে আলাদা-ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন এবং 'গঙ্গারিডির' সহিত পাটলীপুত্র, তাম্রলিপ্ত প্রভৃতির সহিত সংযোগ আছে এইরূপে বলিয়াছেন। গ্রীক এবং ল্যাটিন ঐতিহাসিক ও লেখকগণ 'গঙ্গরিডি' জনগোষ্ঠীকে গঙ্গার মোহনা অঞ্চলের অধিবাসী বলিয়া বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। ডায়াডোরাস মনে হয় ঠিক এই নির্দিষ্ট অর্থে এই শব্দটি ব্যবহার করেন নাই। তিনি তাহার লেখার বিভিন্ন জায়গায় 'প্রাসিয়োই' ও 'গঙ্গারিডির' রাজাকে 'গঙ্গারিডির' রাজা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। 'স্ট্রাবো' (Strabo), আর্টিমিডোরাস (Artimirdoros) প্রভৃতি লেখকদের লেখাতে উত্তরভারতের 'গঙ্গে' নামক একটি শহরের উল্লেখ আছে। সম্ভবত এই কারণেই নানা অসুবিধার সৃষ্টি হইয়াছে।

'গঙ্গারিডির' সীমানা সঠিক কি ছিল তাহা এবং প্রাসিয়োই যাহাদের রাজধানী ছিল পাটলীপুত্র তাহাদের সহিত ইহার কি সম্পর্ক ছিল তাহা সঠিক নির্ণয় করা খুবই কষ্টসাধ্য। টলেমীর বিবরণ অনুসারে মনে হয় পাটলীপুত্রকে কেন্দ্র করিয়া যে রাজ্যটি গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহা সুদূর গঙ্গা পর্যন্ত প্রসারিত ছিল। সম্ভবতঃ তাম্রলিপ্ত ইহার অন্তর্গত ছিল। মনে হয় এই রাজ্যসীমার বাহিরে 'গঙ্গারিডি'র অবস্থিতি ছিল। আলেকজাণ্ডারের সময় 'প্রাসিয়োই' ও 'গঙ্গারিডি'র মধ্যে রাজনৈতিক সম্পর্ক কি ছিল তাহা নির্ণয় করা খুবই কষ্টসাধ্য। কার্টিয়াস বলিয়াছেন এই দুই অঞ্চল এ্যাগ্রামিস (Agramnes) নামক এক রাজার অধীনে ছিল, অবশ্য পরক্ষণে তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহাতে মনে হয় রাজা ছিলেন দুইজন। ডায়াডোরাসও ইহাদের এক রাজার অধীন বলিয়াছেন। কিন্তু প্লুটার্ক-এর বর্ণনা হইতে মনে হয় ইহাতে রাজা ছিলেন দুইজন।

এই সমস্ত পরস্পরবিরোধী বর্ণনা হইতে একটি বিষয় সম্পর্কে নির্দিষ্টভাবে অনুমান করা বোধ হয় সম্ভব যে আলেকজাণ্ডারের সময়কালে 'গঙ্গারিডি' অঞ্চলে একটি শক্তিশালী জাতি ছিল। তাহাদের রাজা এক বা একাধিক যাহাই হোক না কেন তাহারা বিপদের দিনে অন্তত বিদেশী শক্তির মোকাবিলা করিবার জন্য মিলিতভাবে চেষ্টা করিতেন মনে হয়। বিপাশা নদীর তীরে উপস্থিত হইয়া আলেকজাণ্ডার গঙ্গার দিকে অগ্রসর হইবার কালে এই জনগোষ্ঠীর শক্তি ও ক্ষমতার কথা শ্রবণ করিয়া পূর্বদিকে অগ্রসর হইবার বাসনা পরিত্যাগ করেন এবং তিনি ইহার পর স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করেন।[২]

গ্রীক, ল্যাটিন লেখকদের 'গঙ্গারিডি' ও 'প্রাসিয়োই' জনপদ দুইটির ভৌগোলিক অঞ্চল সম্পর্কে কোন সুস্পষ্ট ধারণা ছিল না। সেজন্য মনে হয় তাম্রলিপ্ত 'গঙ্গারিডি' রাষ্ট্রের অন্তর্গত হওয়া হয়ত অসম্ভব নয়।

গ্রীক, ল্যাটিন লেখকদের বর্ণিত এ্যাগ্রানিস (উগ্রসেনের পুত্র) ভারতীয় ঐতিহ্যের যাহার পিতা ছিলেন মহাপদ্মনন্দ ওরফে উগ্রসেন। তিনি বিভিন্ন পুরাণ গ্রন্থে 'সর্বক্ষত্রান্তক' এবং 'একরাট' রূপে বর্ণিত। মহাপদ্মনন্দ কাশী, মিথিলা, ইক্ষাকু, কুরু, পাঞ্চাল ও কলিঙ্গদের পরাজিত করিয়া এক বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। প্রাচ্য ও গঙ্গাদেশের জনপদ রাষ্ট্র দুইটি (মতান্তরে সমবেত-ভাবে একটি) মহাপদ্ম ও ধননন্দের সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল এবং ইহার অন্তর্গত ছিল বন্দরনগরী তাম্রলিপ্ত। এইরূপ মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে। মহাপদ্ম ও ধননন্দের শাসনকাল সাধারণত ৩৬৪ হইতে ৩২৪ খ্রীঃ পূর্বাব্দের মধ্যে মনে করা হয়।[৩]

যোগেশচন্দ্র বসু মহাশয় অবশ্য তাহার পুস্তকে মেগাস্থিনিসের বিবরণ উদ্ধৃত করিয়া প্রায় মহাভারতীয় কাল হইতে চন্দ্রগুপ্তের সময় পর্যন্ত তাম্রলিপ্তকে একটি স্বাধীন রাজ্য ছিল বলিয়া অনুমান করিয়াছেন।[৪]

ভারতবর্ষ হইতে আলেকজাণ্ডারের প্রত্যাবর্তনের পর উত্তর ভারতে যে রাজনৈতিক বিপর্যয় সৃষ্টি হইয়াছিল তাহারই সুযোগে ইতিহাস প্রসিদ্ধ চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য মগধের শেষ নন্দবংশের রাজাকে পরাজিত করিয়া একটি নূতন রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। তাহার রাজত্বকাল আনুমানিক ৩২৪-৩০০ খ্রীঃ পূর্ব পর্যন্ত। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য প্রথম সর্বভারতীয় একটি সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। তাহার এই সাম্রাজ্য পূর্বে বঙ্গদেশ হইতে পশ্চিমে গুজরাট, উত্তর-পশ্চিমে, আফগানিস্থান হইতে দক্ষিণে মহীশূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পুণ্ড্রবর্ধন বা উত্তরবঙ্গ অশোকের সময়ে মৌর্য সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল সে বিষয়ে সুস্পষ্ট প্রমাণ 'মহাস্থানগড়' লিপিতে পাওয়া যায়। কিন্তু দক্ষিণ পশ্চিমবঙ্গ অথবা তাম্রলিপ্ত এই সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল কিনা তাহার কোন স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় না।

মনে হয় চন্দ্রগুপ্ত ও তাহার পুত্র বিন্দুসারের রাজত্বকালে কলিঙ্গ ও তাম্রলিপ্ত মৌর্যসাম্রাজ্যের অন্তর্গত হয় নাই। কিন্তু বিন্দুসারের পুত্র অশোকের কলিঙ্গ বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণ পশ্চিমবঙ্গ ও তৎসহ তাম্রলিপ্ত মৌর্য সাম্রাজ্যের অন্তর্গত হইয়াছিল এইরূপ মনে করার সঙ্গত কারণ আছে। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েনসাঙ বর্ণিত তাম্রলিপ্তের অশোক নির্মিত বৌদ্ধস্তূপের অস্তিত্ব এ বিষয়ে সু-নির্দিষ্ট প্রমাণ। পরবর্তীকালে এই অঞ্চলে

অশোকের একটি শিলাস্তম্ভের ভগ্নাবশেষও পাওয়া গিয়াছে। ইহা হইতে এই প্রমাণ আরো জোরদার হইয়াছে।

সিংহলের বৌদ্ধশাস্ত্র গ্রন্থে অশোকের ব্যক্তিগত উপস্থিতিতে মহাপবিত্র বোধিবৃক্ষের চারাসহ তাহার পুত্র কন্যাকে সিংহলে প্রেরণ করিবার যে কাহিনী আছে ভারতীয় কোন সাহিত্যে এখনও তাহা পাওয়া যায় নাই। তবে এই কাহিনী হইতে একথা সহজে অনুমান করা যায় যে দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গের এই অঞ্চলটি বিশেষত তাম্রলিপ্ত তখন সম্ভবত মৌর্য সাম্রাজ্যের একটি অংশ ছিল।

একই ধরণের আর একটি কাহিনী সিংহলে দীর্ঘদিন প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়। এই কাহিনীতে বঙ্গদেশের রাজা সিংহবাহুর জ্যেষ্ঠ পুত্র বিজয় সিংহ খ্রীঃ পূঃ ৪৭৭ অব্দে মতান্তরে ৫০৩ অব্দে সঙ্গীসহ জাহাজযোগে তাম্রলিপ্ত হইতে সিংহলের পথে যাত্রা করেন এবং সেখানকার রাজাকে পরাজিত করিয়া সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন। এই কাহিনীর ঐতিহাসিক সত্যতা কতটা তাহা নির্ণয় করা সম্ভব নয়। মনে হয় বহুদিনের পুরাতন ঐতিহ্যকে স্মরণ করিয়াই ইহা রচিত হইয়াছিল। আধুনিক যুগের কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত তাহার 'আমরা বাঙালী' কবিতায় ইহার উল্লেখ করিয়াছেন।

অশোকের মৃত্যুর পরেও বোধহয় তাম্রলিপ্ত মৌর্য সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। উড়িষ্যার উদয়গিরি হস্তীগুম্ফা লিপিতে কলিঙ্গের অধিপতি খারবেল মগধ ও উত্তরাপথ অধিকার করিয়াছিলেন বলিয়া দাবি করা হইয়াছে। ইহা হইতে কেহ কেহ অনুমান করিয়াছেন যে তাম্রলিপ্ত কলিঙ্গাধিপতি খারবেলের অধিকার-ভুক্ত হইয়াছিল। মৌর্যদের পর পর্যায়ক্রমে শুঙ্গ ও কুশানগণ ভারতবর্ষে সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাদের অধিকার সীমা পূর্বদিকে বঙ্গদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল না বলিয়া মনে হয়।

অশোক কর্তৃক পরাজিত হইবার পর তাম্রলিপ্তের সিংহাসনে যাহারা আসীন হইয়াছিলেন মনে হয় তাহারা সকলেই ছিলেন সামন্ত বা অর্ধস্বাধীন রাজা। মৌর্য পরবর্তী গুপ্তযুগে ও সম্ভবতঃ এই ধারাই চলিয়াছিল। সে জন্য মনে হয় এই সময় কোন আঞ্চলিক স্বাধীন রাজার নামাঙ্কিত মুদ্রা এখানে পাওয়া যায় নাই।

উত্তর ভারতে মৌর্যদের পরবর্তী শুঙ্গ বংশীয় রাজাদের অধীনে তাম্রলিপ্ত আসিয়াছিল কিনা সে সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা সম্ভব নয়। তবে যে হেতু মগধ শুঙ্গ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং রাজ্য হিসাবে তাম্রলিপ্তের স্বতন্ত্র অস্তিত্বের কোন কথা কোন সূত্র হইতে জানা যায় না, সেই হেতু অনুমান করা

যাইতে পারে যে মগধসহ মৌর্য সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশ পুষ্যমিত্র ও পরবর্তী শুঙ্গরাজাদের শাসনাধীন ছিল (আনুমানিক ১৮৭-৭৫ খ্রীঃ পূ)।[৫]

আলেকজাণ্ডারের পরবর্তীকালে অর্থাৎ খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় ও খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দী পর্যন্ত দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাস খুব স্পষ্ট নয়। কিন্তু শুঙ্গশৈলীতে নির্মিত পঞ্চচূড় যক্ষিণীর পোড়ামাটির মূর্তি প্রভৃতি অনুসন্ধানের ফলে তাম্রলিপ্ত অঞ্চলে পাওয়া গিয়াছে। এই নিদর্শনগুলির আবিষ্কার তাম্রলিপ্ত অঞ্চলে শুঙ্গ-শাসনের অস্তিত্ব সম্পর্কিত অনুমানকে অনেকটা নির্ভরযোগ্য করিয়া তোলে। শুঙ্গরাজত্বের অবসানে অর্থাৎ আনুমানিক খ্রীঃ পূ ৭৫ অব্দ পরবর্তী ৩৫০ পৌনে ৪০০ বৎসর তাম্রলিপ্তের রাজনৈতিক ইতিহাস একেবারেই অজ্ঞাত। যদিও এই সময় সীমার মধ্যে সমৃদ্ধশালী বন্দর নগরী হিসাবে তাম্রলিপ্তের প্রসিদ্ধির খবর একাধিক জায়গায় পাওয়া যায়।

খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর প্রথম দিকে গ্রীক লেখক টলেমী ও অজ্ঞাতনামা অন্য একজনের বিবরণ হইতে জানা যায় যে 'গঙ্গে' বঙ্গভূমিতে একটি শক্তিশালী রাজ্য গড়িয়া উঠিয়াছিল। ইহার রাজধানী ছিল গঙ্গার তীরবর্তী সমৃদ্ধ বাণিজ্যনগরী 'গঙ্গে'। টলেমী ইহাকে তাম্রলিপ্ত হইতে অনেক দক্ষিণপূর্বে অবস্থিত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু ইহার যে সঠিক কোথায় অবস্থিতি ছিল সে সম্পর্কে তাহার বর্ণনা হইতে কিছু উপলব্ধি করা যায় না। পেরিপ্লাস আবার এই অঞ্চলে স্বর্ণ খনির অস্তিত্বের কথা বলিয়াছেন। ইহার ফলে এই অঞ্চল সম্পর্কে আরো কৌতূহলের উদ্রেক হইয়াছে। এই 'গঙ্গে' সম্পর্কে আরো বলা হইয়াছে বাংলার সূক্ষ্ম মস্‌লিন কাপড় এখান হইতে সুদূর পশ্চিম দেশে রপ্তানি করা হইত।

এই সমস্ত ছোটখাট সংবাদ ছাড়া খ্রীষ্টজন্মের পূর্বের ও পরের ৩০০ বৎসরে (মোট ৬০০ বৎসরে) বাংলার ইতিহাস গভীর অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন। বিদেশী ঐতিহাসিকগণ যে ঐশ্বর্যে মুগ্ধ হইয়াছিলেন এবং যাহাদের শৌর্যবীর্যের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা মহাকবি ভার্জিল করিয়াছেন তাহাদের সম্পর্কে এ দেশের পুরাণ, বা সাহিত্যে কোন উল্লেখ নাই, ইহা খুবই আশ্চর্যের বিষয়।[৬]

গুপ্তযুগ

ভারতে গুপ্ত সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার সময়কালে বাংলাদেশে চতুর্থ শতাব্দীতে প্রতিষ্ঠিত ছোট ছোট স্বাধীন রাজ্যের অস্তিত্বের অবসান ঘটে। সমতটবাদে সমগ্র বঙ্গদেশ সমুদ্রগুপ্তের আমলে গুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্তর্গত হইয়াছিল ইহা

প্রায় নিশ্চিতভাবে বলা যায়। তবে বঙ্গদেশ গুপ্ত সাম্রাজ্যের এই অন্তর্ভুক্তি সমুদ্রগুপ্তের আমলে ঘটিয়াছিল অথবা তাহার পূর্বে ঘটিয়াছিল তাহা সঠিক বলা শক্ত। দিল্লীতে কুতুবমিনারের নিকট মেহেরৌলির যে লৌহস্তম্ভটি আছে তাহাতে 'চন্দ্র' নামে একজন রাজার বিজয় কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে। বলা হইয়াছে যে তিনি বঙ্গদেশ জয় করিতে গেলে সেখানে সমবেতভাবে প্রবল বাধার সম্মুখীন হইয়াছিলেন। আর কোন বিস্তারিত বিবরণ না থাকায় এই রাজা 'চন্দ্র' কে ছিলেন তাহা লইয়া ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ আছে। কেহ কেহ তাহাকে সম্রাট প্রথম চন্দ্রগুপ্ত আবার কেহ কেহ তাহাকে সম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বলিয়া মনে করেন। তিনি যদি প্রথম চন্দ্রগুপ্ত হন তাহা হইলেই সমুদ্রগুপ্তের পূর্বে বঙ্গদেশ গুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। যদি তিনি দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত হন তাহা হইলে বুঝিতে হইবে সমুদ্রগুপ্তের পরবর্তী সময়ে বঙ্গদেশ গুপ্তদের অধীনতা ছিন্ন করিয়াছিল এবং সমুদ্রগুপ্তের পুত্রকে সমবেত রাজাদের যুদ্ধে পরাজিত করিয়া বঙ্গদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পুনরায় অধিকার প্রতিষ্ঠা করিতে হইয়াছিল।

তবে একথা মনে রাখা প্রয়োজন যে এই লৌহস্তম্ভে উল্লিখিত রাজা 'চন্দ্র' প্রথম চন্দ্রগুপ্ত বা দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত একথা নিশ্চিতভাবে বলার স্বপক্ষে কোন প্রমাণ নাই। এমনও হইতে পারে এই 'চন্দ্র' সম্ভবত সম্পূর্ণ ভিন্ন রাজা ছিলেন, যাহার সঠিক পরিচয় পাওয়া যায় নাই। লৌহস্তম্ভের লিপিতে এই ধরণের অনিশ্চয়তা থাকিলেও একটি বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যায় তাহা হইল এই যে বঙ্গদেশ এই সময়ে অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল এবং তাহারা বিদেশী 'চন্দ্র' নামে কোন পরাক্রমশালী রাজার আক্রমণ প্রতিহত করিবার জন্য সমবেতভাবে চেষ্টা করিয়াছিলেন। মনে হয় তাহার এই আক্রমণে বঙ্গদেশের সামরিক শক্তি বিশেষভাবে দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল।[৭]

গুপ্ত সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের প্রয়াগ প্রশস্তিতে বঙ্গদেশের মধ্যে একমাত্র সমতটের উল্লেখ আছে। প্রশস্তিকার হরিষেণ ইহাকে করদ ও প্রত্যন্ত রাজ্য হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন। সমতট বা দক্ষিণ পূর্ববঙ্গ সমুদ্রগুপ্তের প্রত্যক্ষ শাসনাধীন না হইলেও অনুমান করা যাইতে পারে বঙ্গদেশের বাকি বৃহৎ অঞ্চল সমুদ্রগুপ্তের সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। এই বাকি অঞ্চলের অন্যতম অংশ হইল পার্শ্ববর্তী এলাকাসহ তাম্রলিপ্ত জনপদটি। সপ্তম শতাব্দীর চৈনিক পরিব্রাজক ইৎসিঙ-এর বিবরণ হইতে জানা যায় সমুদ্রগুপ্তের প্রপিতামহ মহারাজ শ্রীগুপ্ত (খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতকের শেষদিক) প্রথম বঙ্গদেশের বরেন্দ্রভূমিতে অধিকার প্রতিষ্ঠা

করেন। তিনি এবং তাহার বংশধরেরা তাম্রলিপ্তে আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন কিনা সে সম্পর্কে কোন তথ্য পাওয়া যায় নাই। তবে সমুদ্রগুপ্তের তাম্রলিপ্তের উপর আধিপত্য স্থাপনের স্বপক্ষে অন্ততঃ দুইটি প্রাসঙ্গিক অনুমান যোগ্য তথ্য উল্লেখ করা যায়।

সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ প্রশস্তিতে পরাজিত রাজাদের তালিকায় উল্লিখিত 'চন্দ্রবর্মাকে' অনেক ঐতিহাসিকই বাঁকুড়া জেলার শুশুনিয়া শিলালিপির লেখক রাজা চন্দ্রবর্মা বলিয়া মনে করেন। চন্দ্রবর্মা শুশুনিয়া পাহাড় হইতে ২৫ মাইল দূরবর্তী দামোদরের তীরে পুস্করনা অঞ্চলের অধিপতি ছিলেন। সম্ভবতঃ তিনি সমুদ্রগুপ্তের বঙ্গদেশে আগমনের ঠিক পূর্বেই দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলের অনেকটা অংশ জুড়িয়া রাজ্যবিস্তার করিয়াছিলেন। তাহার পরাজয়ের মধ্যদিয়া সমুদ্রগুপ্তের আধিপত্য দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গে প্রসারিত হইয়াছিল একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায়। কারণ শুশুনিয়া অঞ্চল জয় করিতে গিয়া দিগ্বিজয়ী পরাক্রান্ত সমুদ্রগুপ্ত প্রতিবেশী তাম্রলিপ্ত অঞ্চল অধিকার না করিয়া ফিরিয়া যাইবেন ইহা খুবই অস্বাভাবিক।

দিল্লীর মেহেরৌলি লৌহস্তম্ভে বঙ্গদেশের শাসকরা চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যবিস্তারে বাধা দিয়া শেষ পর্যন্ত পরাজিত হইয়াছিলেন বলিয়া বলা হইয়াছে। এই পরাজিত জনপদ রাষ্ট্র প্রধানদের মধ্যে তাম্রলিপ্তের শাসকও ছিলেন এইরূপে অনুমান সম্ভবত অসঙ্গত নয়।

চন্দ্রগুপ্তের পুত্র প্রথম কুমারগুপ্তের[৮] সময় (আনুমানিক ৪১৬-৪৪৬ খ্রীষ্টাব্দ) হইতে ষষ্ঠ শতকের মধ্য বঙ্গদেশ গুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল এবং তাহার শাসনকেন্দ্র ছিল পুণ্ড্রবর্ধন বা উত্তরবঙ্গ। এই সময়ে তাম্রলিপ্ত অথবা দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গ গুপ্তদের অধিকার হইতে মুক্ত ছিল এইরূপে কোন খবর কোন সূত্র হইতে পাওয়া যায় নাই। কাজেই অনুমান করা যাইতে পারে বঙ্গদেশের অন্যান্য অঞ্চলের সঙ্গে তাম্রলিপ্তসহ দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গও গুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্তর্গতই ছিল।

গুপ্ত আমলে প্রাচীন বঙ্গদেশের অধিকাংশ গুপ্ত সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়া পড়িয়াছিল এবং গুপ্তরাষ্ট্রযন্ত্রের প্রাদেশিক রূপ এই অঞ্চলে পুরোপুরি প্রবর্তিত হইয়াছিল। শাসন ব্যাপারে সামন্ত, মহাসামন্ত এবং ভুক্তি বিভাগ প্রভৃতি এই সময় হইতে প্রচলিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে।[৯]

গুপ্ত পরবর্তী যুগ

খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের প্রথম হইতে বারে বারে বিভিন্ন জাতির আক্রমণে (বিশেষভাবে হূনদের) গুপ্ত সাম্রাজ্যের ভিত্তি ধীরে ধীরে দুর্বল হইয়া পড়ে। কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থার দুর্বলতার সুযোগে বিভিন্ন প্রাদেশিক শাসন কর্তাগণ ও স্বাধীনতালাভের আকাঙ্খায় বার বার কেন্দ্রীয় শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াছিল। একদিকে বহিঃশত্রুর আক্রমণ, অন্যদিকে স্থানীয় রাজাদের স্বাধীনতা স্পৃহা প্রধানত এই দুইটি কারণে শেষ পর্যন্ত গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন ঘটিয়াছিল।

এই সময়ে যশোধর্মন নামে এক ব্যক্তি আর্যাবর্তে তাঁহার প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। স্বভাবতই অনুমান করা যায় তিনি একজন দুর্ধর্ষ বীর ছিলেন। তাহার একটি (মান্দাশোর লিপি) জয়স্তম্ভে তিনি দাবি করিয়াছেন যে তাহার সাম্রাজ্য পূর্বে ব্রহ্মপুত্র নদ হইতে পশ্চিমে আরব সাগর পর্যন্ত এবং উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে গঞ্জাম জেলার মহেন্দ্রগিরি পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তাহার প্রশস্তিকারের এই উক্তি সত্য বলিয়া গ্রহণ করা হইলে বাংলাদেশও তাহার অধীন ছিল একথা স্বীকার করিতে হয়।

তাহার বিজয়ের এই কীর্তি কাহিনী কতটা ঐতিহাসিক সত্য তাহা বলা খুবই মুশ্‌কিল। তবে একথা অনুমান করা যায় যে তাহার রাজত্বকাল বেশীদিন স্থায়ী হয় নাই। কারণ ষষ্ঠ শতকের মধ্যভাগে তাহার সাম্রাজ্যের কোন চিহ্নই দেখিতে পাওয়া যায় না। স্বল্পস্থায়ী রাজত্ব হইলে ও হূনদের আক্রমণে হীনবল গুপ্ত সাম্রাজ্য যশোবর্মার এই দুঃসাহসিক অভিযানের ফলে সম্পূর্ণভাবে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল।[১০]

গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন ও যশোধর্মার দীর্ঘস্থায়ী রাজ্য স্থাপনে ব্যর্থতার ফলে উত্তরভারতের রাজনীতিতে যে অস্থিরতা সৃষ্টি হইয়াছিল তাহার সুযোগ গ্রহণ করিয়া ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় কতকগুলি স্বাধীন রাজ্য গড়িয়া উঠিয়াছিল। এই সময়ে উত্তর ভারতে থানেশ্বরে পুষ্যভূতি রাজবংশ এবং কোশল অথবা অযোধ্যার মৌখরি রাজবংশ খুবই উল্লেখযোগ্য। রাজনৈতিক অস্থিরতার এই সুযোগ বাংলাদেশও গ্রহণ করিয়াছিল। তাহারাও বিদেশী শাসনকে অপসারিত করিয়া দুইটি স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল। একটি বঙ্গ এবং অপরটি গৌড়। স্বাধীন বঙ্গরাজ্য সম্ভবতঃ পূর্ব-দক্ষিণ ও পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণাঞ্চল লইয়া গঠিত ছিল এই রাজ্যের প্রধান দুইটি প্রদেশের মধ্যে একটি হইল বর্ধমানভুক্তি। এই প্রদেশের অন্তর্গত বঙ্গদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চল।

এই সময় (ষষ্ঠ শতক) সম্ভবত রাজনৈতিক অস্থিরতার সুযোগে দক্ষিণ ও পূর্ববঙ্গ শেষ গুপ্ত সম্রাটদের অধীনতা ছিন্ন করিয়া একটি পরাক্রান্ত স্বাধীন রাজ্যে পরিণত হয়। বর্তমান বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলার কোটালী পাড়াগ্রামে এবং বর্ধমান জেলায় একটি তাম্রলিপি পাওয়া গিয়াছে। ইহাতে গোপচন্দ্র, ধর্মাদিত্য, সমাচারদেব এই তিনজন রাজার নাম পাওয়া গিয়াছে। তাহারা সকলেই মহারাজাধিরাজ উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই উপাধি হইতে মনে হয় তাহারা সকলেই পরাক্রমশালী স্বাধীন নরপতি ছিলেন। সমগ্র দক্ষিণপূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের অন্তত অনেক অংশ এই স্বাধীন বঙ্গের অন্তর্ভুক্ত ছিল বলিয়া মনে হয়। সমাচারদেবের স্বর্ণমুদ্রা এবং নালন্দার ধ্বংসাবশেষের মধ্যে তাহার নামাঙ্কিত মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহাদের নামাঙ্কিত এ যুগের আরো কতকগুলি স্বর্ণমুদ্রা বঙ্গদেশের বিভিন্নস্থানে আবিষ্কৃত হইয়াছে।

এই তিনজন রাজা একই বংশের ছিলেন কিনা তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা কঠিন। তবে তাহাদের মধ্যে গোপচন্দ্র সর্বপ্রাচীন ছিলেন বলিয়া মনে হয়। কারণ "মল্লসারুল" তাম্রশাসনে উল্লিখিত গোপচন্দ্রের সামন্ত রাজা হিসাবে মহারাজা বিজয়সেনের নাম পাওয়া যায়। মনে হয় গুপ্তরাজ বংশের পরিবার-ভুক্ত বন্যগুপ্তের (যিনি কুমিল্লা অঞ্চলে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতেন) অপর এক তাম্রশাসনে মহাসামন্ত বিজয়সেন বলিয়া যাহাকে উল্লেখ করা হইয়াছে তিনি এবং গোপচন্দ্রের তাম্রশাসনে উল্লিখিত বিজয়সেন এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি ছিলেন। অনুমান করা হয় বন্যগুপ্তের আমলে বিজয়সেন তাহার প্রভুর পশ্চিমবঙ্গের সাম্রাজ্যের অংশ শাসন করিতেন এবং গুপ্তদের পতনের পর গোপ-চন্দ্র যখন ঐ অঞ্চলের অধিপতি হন, তখন বিজয়সেন তাহার অধীনে কর্মগ্রহণ করিয়া পূর্বের ন্যায় ঐ অঞ্চল শাসন করিতে থাকেন। রাজ্যের এই অংশেরই অন্তর্গত ছিল তাম্রলিপ্ত অঞ্চল।[১১]

এইরূপ অনুমান যথার্থ হইলে বলা যায় যে গুপ্তবংশীয় মহারাজা বন্যগুপ্তের শাসনের পরই অর্থাৎ সম্ভবত ষষ্ঠ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে গোপচন্দ্র বঙ্গদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। তিনি যে একজন পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন সম্রাট-সূচক পদবী গ্রহণে তাহা সূচিত করে। তাহার বালেশ্বর জেলার অন্তর্গত প্রাপ্ত তাম্রশাসনে একখানি গ্রাম দান করিবার উল্লেখ আছে। তাহাতে ওড়িশ্যার অন্তত উত্তরাংশ তাহার রাজ্যের অন্তর্গত ছিল প্রমাণিত হয়।[১২]

উপরোক্ত লিপিতে তাম্রলিপ্ত অঞ্চলও যে গোপচন্দ্রের সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল তাহার স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তাম্রলিপ্ত অঞ্চলকে জয় না করিয়া

গোপচন্দ্র দক্ষিণে বালেশ্বর জয় করিতে গিয়াছিলেন একথা মনে করিবার কোন কারণ নাই। আর এই ধরণের অনুমান ভৌগোলিকভাবে অস্বাভাবিকও মনে হয়।

গোপচন্দ্রের পরবর্তী দুইজন রাজা হইলেন ধর্মাদিত্য এবং সমাচারদেব। তাহারা মোটামুটিভাবে রাজ্যের সংহতি রাখিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। এই তিন নরপতির পারস্পরিক সম্পর্ক কি ছিল সে বিষয়ে কোন ইঙ্গিত ইহাদের লিপিতে নাই। তবে বর্ধমান ও তাম্রলিপ্তসহ দক্ষিণ পশ্চিমবঙ্গ সমাচারদেবের আমলে বা তাহার পূর্বেই বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল মনে হয়।

গোপচন্দ্র, ধর্মাদিত্য এবং সমাচারদেব সম্ভবত ১৮, ৩ এবং ১৪ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাহাদের রাজত্বকাল আনুমানিক ৫২৫ হইতে ৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে মনে করা হয়।[১৩]

গোপচন্দ্র প্রমুখ রাজারা মূলতঃ ছিলেন পূর্ববঙ্গের শাসক (বর্তমান বাংলাদেশ)। তাহাদের শাসনকেন্দ্রও ছিল পূর্ববঙ্গে। পশ্চিমবঙ্গ ও ওড়িষ্যার উত্তরাঞ্চল তাহাদের শাসনাধীনে ছিল বলিয়া মনে হয়। এই অঞ্চলের শাসনকার্য সম্ভবত তাহাদের অধীনস্থ সামন্তদের মাধ্যমে নির্বাহ করিতেন। তাহাদের আমলের যে সকল লিপি এখনও পর্যন্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাতে এই রাজাদের প্রাদেশিক শাসন সম্পর্কে বিস্তৃত বর্ণনা আছে। এইসব বর্ণনা হইতে ইহা অনুমান করার সঙ্গত কারণ আছে যে তাহাদের সু-শাসনের ফলে এই অঞ্চলে একটি স্থায়ী শক্তিশালী এবং সমৃদ্ধশালী রাজ্য গড়িয়া উঠিয়াছিল এবং এখানকার অধিবাসীরা সুখে ও শান্তিতে নিরুদ্বিগ্ন জীবনযাপন করিত। কখন এবং কিভাবে এই সমৃদ্ধশালী স্বাধীন রাজ্যের অবসান ঘটিয়াছিল পরিষ্কারভাবে তাহার কোন নির্ভরযোগ্য তথ্য জানা যায় না।

গুপ্তদের বাংলাদেশে আধিপত্যের শেষ পর্যায় খুব একটা শান্তিপূর্ণ ছিল না। মাঝেমাঝে এখানে নানাপ্রকার বিক্ষোভ প্রকাশিত হইত। ষষ্ঠ শতকের মধ্যভাগে বঙ্গদেশের গৌড়রাজ্য গুপ্তসাম্রাজ্যের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক অঞ্চল বলিয়া মনে করা হইত। আনুমানিক ৫৫৪ খ্রীষ্টাব্দের মৌখরি বংশীয় রাজা ঈশানবর্মার একটি লিপিতে (ইড়হালিপি) জানা যায় তিনি (ঈশানবর্মা) গৌড়ের অধিপতিকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া 'সমুদ্রাশ্রিত' করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। এই ঈশানচন্দ্র সম্ভবত গোপচন্দ্রের রাজত্বকালে বঙ্গদেশ আক্রমণ করিয়াছিলেন এবং 'সমুদ্র' ও 'অব্ধ' উল্লেখ হইতে মনে হয়

সমুদ্রের নিকটবর্তী তাম্রলিপ্ত বা তাহার কাছাকাছি অঞ্চলে গৌড়বাসীর সহিত ঈশানবর্মার যুদ্ধ হইয়াছিল।

খুব সম্ভবত গোপচন্দ্রকে এই সময়ে ঈশানবর্মার নিকট সাময়িকভাবে পরাজয় স্বীকার করিতে হয়। ঈশানবর্মার সহিত পরবর্তী গুপ্তরাজাদের দীর্ঘকাল যুদ্ধ বিগ্রহ চলিয়াছিল এবং মনে হয় পরবর্তী গুপ্তরাজাদের সময় গোপচন্দ্র তাহার স্বাধীনতা পুনরায় প্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম হইয়াছিল। দীর্ঘস্থায়ী এই যুদ্ধের ফলে বাংলাদেশের রাজনৈতিক শক্তি বেশ খানিকটা হ্রাস পাইয়াছিল।[১৪]

মৌখরিদের প্রধান শত্রু পরবর্তী গুপ্তবংশীয় রাজাদের অন্যতম মহাসেনগুপ্ত ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষদিকে মৌখরিদের প্রাধান্য খর্ব করিয়া তাম্রলিপ্ত সহ পশ্চিম বঙ্গের অধিকাংশের অধিপতি হন (এই সময় গৌড় নাম চালু ছিল)। এই শতাব্দীর শেষদিকে দক্ষিণ ভারতের চালুক্য বংশীয় রাজা প্রথম কীর্তিবর্মা (আনুমানিক ৫৯৭-৫৯৮ খ্রীষ্টাব্দ) তাহার মহাকূট স্তম্ভলিপিতে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ সহ মগধ জনপদ জয় করিয়াছিলেন বলিয়া দাবি করিয়াছিলেন। তাহার এই দাবি যদি সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে হয় তাহা হইলে বলিতে হয় কীর্তিবর্মা সম্ভবত সমাচারদেব অথবা তাহার পরবর্তী কোন রাজার সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। সেক্ষেত্রে বর্ধমানসহ পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল হইতে সমাচারদেবের আধিপত্য বিলুপ্ত হইয়াছিল অনুমান করিতে হয়।

কীর্তিবর্মার সাফল্যের পরিমাণ ও স্থায়ীত্ব কতটা ছিল সে সম্পর্কে নিশ্চিত ভাবে কিছু বলা যায় না। তবে একথা অনুমান করা যাইতে পারে যে তাহার আক্রমণের ফলে পরবর্তী গুপ্ত রাজাদের রাজনৈতিক ক্ষমতা অধিকাংশই বিধ্বস্ত হইয়াছিল এবং তাহার ফলে বর্ধমানসহ পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল হইতে স্বাধীন রাজাদের আধিপত্য নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। রাজনৈতিক এই শূন্যতা প্রাচীন বাংলার অন্যতম প্রসিদ্ধ নরপতি গৌড়রাজ শশাঙ্কের রাজনৈতিক অভ্যুত্থানের পথকে সুগম করিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই।[১৫]

সূত্র নির্দেশ

১। History of Bengal, pp. 41-42

২। History of Bengal, op. cit., pp. 43/44

৩। কল্যাণকুমার দাসগুপ্ত, ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে তাম্রলিপ্ত, "রাজনৈতিক ইতিহাসে প্রাচীন তাম্রলিপ্ত", পৃঃ ১১১

৪। যোগেশচন্দ্র বসু, মেদিনীপুরের ইতিহাস, পৃঃ ৭৭-৭৮

৫। ঐ দাসগুপ্ত পূর্বে উল্লিখিত, পৃঃ ১১২
ঐ বসু ,, পৃঃ ৮০-৮১

৬। রমেশচন্দ্র মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস, পৃঃ ২১

৭। History of Bengal, op. cit., pp. 47-48

৮। ঐ দাসগুপ্ত, পূর্বে উল্লিখিত, পৃঃ ১১৩-১১৪

৯। নীহাররঞ্জন রায়, বাঙালীর ইতিহাস, পৃঃ ৪১৩-৪১৫

১০। History of Bengal, op. cit., pp. 50-51

১১। পূর্বে উল্লিখিত, পৃঃ ১১৪

১২। মজুমদার, পূর্বে উল্লিখিত, পৃঃ ২৪-২৫

১৩। দাসগুপ্ত, পূর্বে উল্লিখিত, পৃঃ ১১৪-১১৫ ; History of Bengal, op. cit., p. 54

১৪। দাসগুপ্ত, পূর্বে উল্লিখিত, পৃঃ ১১৬

১৫। পূর্বে উল্লিখিত, পৃঃ ১১৬

তৃতীয় অধ্যায়

গৌড়েশ্বর শশাঙ্কের শাসন

বাঙ্গালী রাজাদের মধ্যে শশাঙ্কই সর্বপ্রথম সার্বভৌম নরপতি ছিলেন। তিনি বঙ্গদেশের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়া আছেন। তাহার পূর্বে যে তিনজন রাজার কথা বলা হইয়াছে অবিসংবাদিতরূপে শশাঙ্কই তাহাদের মধ্যে অধিক পরাক্রমশালী ছিলেন। এই দেশের রাজাদের মধ্যে তিনিই প্রথম যাহার রাজ্যের প্রসার বঙ্গদেশের ভৌগোলিক সীমাকেও অতিক্রম করিয়া বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল।

তাহার বাল্যজীবন, বংশ পরিচয় ইত্যাদি সঠিকভাবে জানা যায় না। তিনি কিভাবে গৌড়ের সিংহাসনে বসিয়াছিলেন সে সম্পর্কে সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না। কেহ কেহ মনে করেন শশাঙ্কের অপর নাম নরেন্দ্র গুপ্ত এবং তিনি গুপ্ত রাজবংশে জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু এই মতটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলিয়া মনে হয়। প্রাচীন 'রোটাস্‌গড়' পর্বতগাত্রে 'শ্রীমহাসামন্ত শশাঙ্ক' এই নামটি খোদিত আছে। যদি এই শশাঙ্ক ও গৌড়রাজ শশাঙ্ক একই ব্যক্তি হন তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে শশাঙ্ক প্রথমে একজন মহাসামন্ত মাত্র ছিলেন।[১]

তবে তাহার প্রভু কে ছিলেন তাহা সঠিকভাবে বলা মুশকিল। কেহ কেহ অনুমান করেন তিনি মৌখরি রাজ্যের অধীনস্থ সামন্ত রাজা ছিলেন। মনে হয় এই অনুমান নির্ভরযোগ্য নয়। অনুমান করা হয় তাহার প্রভু ছিলেন গুপ্তদের কোন একজন শেষ রাজা। ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষদিকে মহাসেনগুপ্ত মগধ ও গৌড়ের অধিপতি ছিলেন। সুতরাং শশাঙ্ক এই মহাসেনগুপ্তের অধীনে মহাসামন্ত ছিলেন এই অনুমান সঙ্গত বলিয়া মনে হয়।

ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষ দশকে বঙ্গদেশের যে রাজনৈতিক অস্থিরতা চলিতেছিল তাহার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিয়া শশাঙ্ক বঙ্গদেশে একটি স্বাধীন রাজ্য গঠন করেন। এই রাজ্যের নাম ছিল গৌড়। ইহার রাজধানী ছিল মুর্শিদাবাদ জেলার অদূরে বহরমপুরের রাঙামাটি নামক একটি জায়গা, যাহার প্রাচীন নাম ছিল কর্ণসুবর্ণ। ৬০৬ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বেই তাহা স্বাধীন রাজ্যে পরিণত হইয়াছিল ইহা মোটামুটি নিশ্চিতভাবে জানা যায়।

এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে তাহার গৌড়রাজ্যে উত্তর পশ্চিমবঙ্গ অন্তর্ভুক্ত ছিল। দক্ষিণ পূর্ববঙ্গ অন্তর্ভুক্ত ছিল কিনা সে সম্পর্কে এতটা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। তবে মনে হয় দক্ষিণে মেদিনীপুর জেলার দণ্ডভুক্তি (দাঁতন) এবং উৎকল ও গঞ্জাম জেলার মধ্যে অবস্থিত কঙ্গোদ ইহার অন্তর্গত ছিল। ইহার প্রমাণ পাওয়া যায় কতকগুলি লিপিতে। মেদিনীপুর জেলায় আবিষ্কৃত তিনটি লিপি এ বিষয়ে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। মেদিনীপুরের তাম্রশাসন শশাঙ্কের অধীনস্থ 'দণ্ডভুক্তি' ও উৎকলের প্রদেশপাল সোমদত্ত কর্তৃক প্রকাশিত (৬১৯ খ্রীঃ)। যাহার সর্বশেষটি এগরা হইতে আবিষ্কৃত। উৎকল লেখাবলীতে দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গ ও উত্তর উড়িষ্যায় তাহার প্রাধান্য বিস্তৃত হইয়াছিল তাহা প্রমাণিত হয়। বিভিন্ন ঐতিহাসিক তথ্য হইতে মনে হয় (বিশেষতঃ তাম্রলিপি হইতে) সপ্তম শতকের গোড়ার দিকে শশাঙ্ক নিজের সাম্রাজ্য মেদিনীপুরের দিকে প্রসারিত করেন। এই অঞ্চলটি তখন দণ্ডভুক্তি নামে পরিচিত ছিল। শশাঙ্ক শুভকীর্তি নামক এক ব্যক্তিকে দণ্ডভুক্তির প্রদেশপাল হিসাবে নিয়োগ করেন। তখন তাহার রাজকীয় উপাধি হয় মহাপ্রতিহার। শশাঙ্কের রাজত্বের অষ্টম বর্ষে এই প্রদেশ পাল দণ্ডভুক্তির অন্তর্গত কুন্তরাপ্রাড্রাক নামক গ্রামে দাম্যস্বামী নামক এক ব্রাহ্মণকে কিছু জমি দান করিতেছেন এইরূপ একটি কাহিনীর উল্লেখ একটি তাম্রশাসনে পাওয়া গিয়াছে। এই তাম্রশাসনে (মেদিনীপুর তাম্রশাসন) শশাঙ্ককে একজন শক্তিশালী রাজা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছে।

ইহারই সমসাময়িক কাল হইতে মনে হয় শশাঙ্ক উৎকল, কঙ্গোদ ও কলিঙ্গ প্রভৃতি অঞ্চল জয় করেন এবং এইসব অঞ্চলকে দণ্ডভুক্তি মণ্ডলের শাসনাধীনে আনয়ন করেন। শুভকীর্তির পর দণ্ডভুক্তি ও উৎকল দেশে প্রদেশ-পাল নিযুক্ত হন সম্ভবত সোমদত্ত। এই সময় তাহার উপাধি হয় মহা-প্রতিহারের পরিবর্তে সামন্তমহারাজ। তিনি শশাঙ্কের রাজত্বের ১৯তম বর্ষে একটি তাম্রলিপি প্রকাশ করেন (মেদিনীপুরের তাম্রশাসন)। যাহাতে তিনি তাহার প্রভু শশাঙ্ককে একজন পরাক্রমশালী নরপতি হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন এবং যাহার রাজত্বের চারিদিকে সমুদ্রবেষ্টিত বলিয়াছেন। এই তাম্রশাসনের মাধ্যমে তিনি ভট্টেশ্বর নামক ব্রাহ্মণকে ভূমিদান করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ আছে। এইভাবে আনুমানিক ৬২০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে শশাঙ্কের রাজত্ব দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গ সহ প্রায় সমগ্র উড়িষ্যার উপকূল পর্যন্ত বিস্তৃত দেখিতে পাওয়া যায়।

গঞ্জাম লেখ হইতে দক্ষিণ উড়িষ্যায়ও তিনি ক্ষমতা বিস্তার করিয়াছিলেন তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। অর্থাৎ এই সমস্ত তথ্যের ভিত্তিতে শশাঙ্কের জীবদ্দশায় (মৃত্যু ৬৩৭-৩৮ খ্রীঃ) উত্তরবঙ্গ এবং তাম্রলিপ্তসহ দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গ ও উড়িষ্যার বিস্তীর্ণ অঞ্চল তাহার রাজ্যের অন্তর্গত ছিল ইহা প্রায় নিশ্চিতভাবে বলা যায়।[২]

শৈলোদ্ভব রাজারা শশাঙ্কের অধীনতা স্বীকার করিয়াছিলেন। মাধবরাজ দ্বিতীয় আনুমানিক ৬১৫ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। আনুমানিক ৬২০ খ্রীষ্টাব্দে তাহার গঞ্জাম তাম্রশাসনে তিনি নিজেকে শশাঙ্কের মহাসামন্ত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। মনে হয় যখন শশাঙ্ক দণ্ডভুক্তি, উৎকল ও কঙ্গোদের অধিপতি ছিলেন সেই সময় শৈলোদ্ভব রাজও তাহার মহাসামন্তরূপে পরিগণিত হইয়াছিলেন। তবে উৎকলের উপর শশাঙ্কের অধিকার দীর্ঘস্থায়ী হয় নাই।[৩]

হিউয়েন সাঙ ৬৩৭ ৩৮ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গদেশ পরিভ্রমণ করিতে আসিয়া এই দেশটিকে পাঁচটি রাজনৈতিক বিভাগে বিভক্ত দেখিতে পান। এই পাঁচটি হইল পুণ্ড্রবর্ধন, কর্ণস্থবর্ণ, তাম্রলিপ্ত, সমতট, ও ক-জঙ্গল। আশ্চর্যের বিষয় তিনি এই সমস্ত বিভাগের অধিপতিদের কাহারও নাম উল্লেখ করেন নাই। ইহাদের মধ্যে সমতট বা দক্ষিণ পূর্ববঙ্গ ছাড়া বাকি চারিটি জনপদই ইতিপূর্বে শশাঙ্কের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। স্থতরাং মনে হয় শশাঙ্কের মৃত্যুর ঠিক পরে এবং হিউয়েন সাঙ-এর আগমনের পূর্বে এই পাঁচটি অঞ্চলই স্বাধীন হইয়া যায়। অর্থাৎ তখন তাহারা কোন রাজার নিয়ন্ত্রণে ছিল না। হিউয়েন সাঙ-এর বিবরণ হইতে আরও অনুমান করা যায় যে ৬৪২-৪৩ খ্রীঃ মধ্যে কঙ্গোদ (উড়িষ্যার দক্ষিণাঞ্চল, যাহা একসময়ে শশাঙ্কের রাজ্যের অন্তর্গত ছিল), ক-জঙ্গল (রাজমহল পাহাড়ের নিকট অবস্থিত) সহ মগধ হর্ষবর্ধনের করায়ত্ব হইয়াছিল। আরও অনুমান করা যায় যে, তাম্রলিপ্ত দণ্ডভুক্তি প্রভৃতি অঞ্চলগুলিও হর্ষবর্ধনের শাসনাধীনে চলিয়া গিয়াছিল। অর্থাৎ ৬৪৬-৪৭ খ্রীষ্টাব্দে হর্ষবর্ধনের মৃত্যু পর্যন্ত তিনি তাম্রলিপ্ত অঞ্চলের অধিপতি ছিলেন।[৪]

শশাঙ্কের রাজত্বের সীমানা যাহাই হোক না কেন মগধ তাহার রাজ্যের মধ্যে প্রথম হইতে অন্তর্ভুক্ত ছিল এ বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নাই। মগধ অধিকারে থাকার জন্য তাহার পক্ষে পরবর্তীকালে উত্তর ভারতে আগ্রাসী বৈদেশিক নীতি অনুসরণ করা সম্ভব হইয়াছিল এ বিষয়েও সন্দেহ নাই। দক্ষিণ উড়িষ্যার চিল্কা হ্রদ পর্যন্ত তাহার রাজ্যসীমা বিস্তৃত ছিল এ বিষয়ে স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। ৬১৯ খ্রীঃ চিহ্নিত একটি লিপিতে চিল্কার নিকটবর্তী

রাজ্য কঙ্গোদের শৈলোদ্ভব বংশীয় একজন রাজা (শ্রীমাধবরাজ দ্বিতীয়) নিজেকে শশাঙ্কের অধীনস্থ সামন্ত রাজা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এই রাজ্য চিল্কা হইতে দক্ষিণে গঞ্জাম পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই রাজ্য পর্যন্ত অধিকার করিতে গিয়া শশাঙ্ককে মধ্যবর্তী অঞ্চলসমূহকে নিশ্চয়ই জয় করিতে হইয়াছিল এইরূপ অনুমান করা সঙ্গত। কিন্তু এই সমস্ত অঞ্চল বিজয় সম্পর্কে বিস্তারিত কোন তথ্য জানা যায় নাই।[৫]

শশাঙ্কের উত্তর ভারত অভিযান সম্পর্কে দুইজন সমসাময়িক বিখ্যাত ব্যক্তির বিবরণ পাওয়া যায়। একজন হর্ষচরিত রচয়িতা বানভট্ট, অপর জন হিউয়েন সাঙ। হর্ষবর্ধনের উত্তর ভারতের বৈদেশিক নীতির মূল উদ্দেশ্য ছিল মনে হয় মৌখরি রাজবংশের আক্রমণ হইতে নিজের অধিকারকে অক্ষুণ্ণ রাখা। এই মৌখরি রাজগণ গত তিন পুরুষ ধরিয়া মগধ ও গৌড়ের অধিকার লাভের জন্য পরবর্তী গুপ্তরাজাদের সঙ্গে সংগ্রাম চালাইয়াছিলেন। তাহারা উত্তর ভারতের থানেশ্বরের শাসকদের সঙ্গে বৈবাহিক মিত্রতার সাহায্যে নিজেদের ক্ষমতাকে প্রভূত বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। মৌখরিরাজ গ্রহবর্ম থানেশ্বরের রাজকন্যা রাজ্যশ্রীকে বিবাহ করায় তাহার শক্তি খুবই বৃদ্ধি পাইয়াছিল। এই অবস্থায় পরবর্তী গুপ্তদের পক্ষে তাহাদের বিরুদ্ধে বিশেষ কিছু করিবার ছিল না। এই রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে শশাঙ্কের পক্ষে উত্তর ভারতে প্রভাব বিস্তার করা খুবই কঠিন কাজ ছিল। সেজন্য তিনি বিচক্ষণ রাজনীতিবিদের ন্যায় মালবের রাজা দেবগুপ্তের সঙ্গে এক মিত্রতা বন্ধনে আবদ্ধ হইলেন। মালবের রাজারা ছিলেন মৌখরি রাজাদের চিরকালের শত্রু। মনে হয় এই মিত্রতা বন্ধনের সময় শশাঙ্ক তাহার অধিকার কাশী পর্যন্ত বিস্তৃত করিয়াছিলেন। মালবের রাজা দেবগুপ্ত গ্রহবর্মাকে নিহত করিয়া কনৌজের রাজকন্যা রাজ্যশ্রীকে বন্দী করিলেন। এই সংবাদে নব অধিষ্ঠিত থানেশ্বর রাজ রাজ্যবর্ধন দেবগুপ্তের বিরুদ্ধে স্ব-সৈন্যে অভিযান করিলেন। এই যুদ্ধের ঘটনা প্রবাহ কিভাবে ঘটিয়াছিল তাহা বলা মুশ্‌কিল। তবে রাজ্যবর্ধন মালবরাজ দেববর্মনকে পরাজিত করিয়াছিলেন কিন্তু কনৌজে তাহার ভগিনীকে মুক্ত করিবার পূর্বেই তিনি শশাঙ্ক কর্তৃক নিহত হইয়াছিলেন।[৬]

বানভট্ট এবং হিউয়েন সাঙ উভয়েই শশাঙ্ক কর্তৃক রাজ্যবর্ধন যে অন্যায়-ভাবে এবং বিশ্বাসঘাতকতার দ্বারা নিহত হইয়াছেন তাহা বলিয়াছেন। কিন্তু তাহারা ঘটনার যে বিবরণ দিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ আলাদা। বানভট্ট লিখিয়াছেন যে মিথ্যা আশ্বাসে বিশ্বাস করিয়া রাজ্যবর্ধন শশাঙ্কের গৃহে গমন

করিলে তিনি নিহত হন। রাজ্যবর্ধন কেন নিরস্ত্র ও সঙ্গিহীন অবস্থায় শত্রু শিবিরে গিয়াছিলেন সে বিষয়ে বানভট্ট একেবারে নীরব। কিন্তু হর্ষচরিতের টীকাকার শঙ্কর এই ঘটনার প্রায় এক হাজার বছর পরে বানভট্টের এই কাহিনী প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে শশাঙ্ক তাহার কন্যার সহিত বিবাহের প্রলোভন দেখাইয়া রাজ্যবর্ধনকে তাহার গৃহে আনয়ন করেন এবং সেখানে তাঁহাকে হত্যা করেন। তিনি আরও বলিয়াছেন যে রাজ্যবর্ধন ও তাহার অনুচরগণ যখন শশাঙ্কের গৃহে আসিয়া আহারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন তখন তাহাদিগকে হত্যা করা হয়। যে ঘটনা বানভট্ট উল্লেখ করেন নাই তাঁহার টীকাকার এক হাজার বৎসর পরে তাহার সন্ধান কিভাবে পাইলেন তাহা বলা খুবই শক্ত। উপরন্তু বানভট্ট কথিত নিরস্ত্র একাকী রাজ্যবর্ধনের মৃত্যুর কাহিনীর সহিত ইহার কোন সামঞ্জস্য নাই।[৭]

হিউয়েন সাঙ তাহার বিবরণে বলিয়াছেন শশাঙ্ক তাহার মন্ত্রীদের বারে বারে বলিতেন যে সীমান্তবর্তী রাজ্যে রাজ্যবর্ধনের ন্যায় ধার্মিক রাজা থাকিলে তাহাতে নিজ রাজ্যের কল্যাণ সর্বদা ব্যাহত হয়। এই বক্তব্য শুনিয়া শশাঙ্কের মন্ত্রীগণ রাজ্যবর্ধনকে একটি সভায় আহ্বান করিয়া আনিয়া সেখানে তাহাকে হত্যা করে। হিউয়েন সাঙ-এর এই বক্তব্য কোন মতেই বিশ্বাসযোগ্য নয়। কারণ রাজ্যবর্ধন সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই যুদ্ধ যাত্রা করিয়াছিলেন। কাজেই তিনি ধার্মিক কি অধার্মিক ইহা বিচার করিবার অথবা এ বিষয়ে বার বার মন্ত্রীদের বলিবার সুযোগ বা সম্ভাবনা শশাঙ্কের ছিল না। হর্ষবর্ধনের শিলালিপিতে উল্লেখ করা হইয়াছে যে রাজ্যবর্ধন সত্যানুরোধে শত্রুভবনে গিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। এই লিপিতে রাজ্যবর্ধনের প্রতি শশাঙ্কের বিশ্বাসঘাতকতার কোন ইঙ্গিতই নাই। বানভট্ট, হিউয়েন সাঙ ও হর্ষবর্ধনের শিলালিপি এই তিনটি সমসাময়িক বিবরণে একই ঘটনার পরস্পর বিরোধী বিবরণ দেখিয়া তাহাদের সত্যতা সম্পর্কে খুবই সন্দেহের উদ্রেক করে। হিউয়েন সাঙ তাহার বিবরণে অন্যস্থানে লিখিয়াছেন রাজ্যবর্ধনের মৃত্যুর জন্য তাহার মন্ত্রীরাই দায়ী। রাজ্যবর্ধন বৌদ্ধ ছিলেন। সুতরাং তাহার মন্ত্রীদের কেহ কেহ তাহার হত্যা সাধনে সহায়ক হইয়াছিলেন ইহা অনুমান করা অসঙ্গত নয়। উপরন্তু বানভট্ট ও হিউয়েন সাঙ উভয়েই শশাঙ্কের পরম বিদ্বেষী ছিলেন। কাজেই তাহাদের পরস্পর বিরোধী অস্বাভাবিক ও অস্পষ্ট ইঙ্গিতে এবং অসম্পূর্ণ কাহিনীর উপর নির্ভর করিয়া শশাঙ্ককে বিশ্বাসঘাতক বর্ণনা করা কোনমতেই যুক্তিসঙ্গত নয়।[৮]

রাজ্যবর্ধনের হত্যার সংবাদ শুনিয়া নূতন রাজা হর্ষবর্ধন প্রতিশোধ লইবার জন্য অগ্রসর হইলেন। কিন্তু পথে তিনি তাহার ভগিনী রাজ্যশ্রীকে উদ্ধারের জন্য বিন্ধ্যপর্বতের দিকে অগ্রসর হইলেন এবং সেনাপতি ভণ্ডিকে (Bhandi) সৈন্যসহ গৌড়ের দিকে অগ্রসর হইতে নির্দেশ দিলেন। ভণ্ডি সৈন্যসহ গৌড়ের দিকে অগ্রসর হইলেন এবং হর্ষবর্ধন কিছুদিনের মধ্যে ভগিনীর উদ্ধার কার্য সমাপ্ত করিয়া গঙ্গাতীরে আসিয়া তাহাদের সহিত মিলিত হইলেন। বানভট্টের কাহিনী এইখানেই শেষ। হর্ষবর্ধনের বিপুল সৈন্যবাহিনীর সহিত শশাঙ্কের যুদ্ধের কি ফলাফল হইয়াছিল এবং কামরূপরাজ ভাস্কর বর্মার সহিত হর্ষবর্ধনের বন্ধুত্বের ফলই বা কি হইয়াছিল সে সম্পর্কে বানভট্টের কাহিনীতে কোন উল্লেখ নাই। আশ্চর্যের বিষয় এবিষয়ে হিউয়েন সাঙ-এর বিবরণেও কিছু পাওয়া যায় না।[৯]

হিউয়েন সাঙ তাহার বিবরণে বলিয়াছেন হর্ষবর্ধন দীর্ঘ ছয় বৎসর যুদ্ধ করিয়া সমগ্র ভারতবর্ষ জয় করিয়াছিলেন। তাহার এই উক্তি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। কারণ হর্ষবর্ধন দাক্ষিণাত্যের চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশীর নিকট পরাজিত হইয়াছিলেন। আর্যাবর্তে মেদিনীপুর তাম্রশাসন অনুসারে শশাঙ্ক ৬১৯ খ্রীঃ পর্যন্ত যে একজন শক্তিশালী রাজা ছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই। হিউয়েন সাঙ-এর বর্ণনায় জানা যায় শশাঙ্কের মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত (৬৩৭ খ্রীঃ) মগধের অধিপতি ছিলেন। তিনি আরো লিখিয়াছেন ৬৩৭ খ্রীঃ কিছু পূর্বে শশাঙ্ক গয়ায় বোধিবৃক্ষ ছেদন করেন এবং নিকটবর্তী একটি মন্দির হইতে একটি বুদ্ধমূর্তি সরাইয়া দেন। ইহারই ফলে শশাঙ্কের সর্বাঙ্গে ক্ষত হয় এবং তাহাতেই অনতিকাল পরে তাহার মৃত্যু হয়।

অর্থাৎ হর্ষবর্ধন শশাঙ্ককে শাস্তিদেবার কঠোর প্রতিজ্ঞা সত্বেও যুদ্ধে তাহার বিশেষ কিছু ক্ষতি করিতে পরিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। শশাঙ্কের সহিত তাহার আদৌ যুদ্ধ হইয়াছিলে কিনা সে সম্পর্কে কোন নিশ্চিন্ত প্রমাণ পাওয়া যায় না। বহু পরবর্তীকালে লিখিত একটি বৌদ্ধ গ্রন্থে (আর্যমঞ্জুশ্রী-মূলকল্প) শশাঙ্কের সহিত হর্ষের যুদ্ধের একটি আভাস পাওয়া যায়। এই গ্রন্থ সাংকেতিক ভাষায় রচিত। এখানে রাজাদের নামের আদ্যক্ষর শুধু ব্যবহৃত হইয়াছে। এই গ্রন্থে উল্লিখিত রাজা "সোম" সম্ভবত শশাঙ্ক এবং তাহার শত্রু 'হ' ও 'র' কারান্ত রাজারা সম্ভবত হর্ষবর্ধন ও রাজ্যবর্ধন। এই অনুমান সত্য হইলে এই গ্রন্থে যে বিবরণ পাওয়া যায় তাহাতে মনে হয় হর্ষবর্ধন বহু সৈন্যসহ শশাঙ্কের বিরুদ্ধে অভিযান করেন এবং দুর্বৃত্ত শশাঙ্ককে পরাজিত করেন। কিন্তু এই

'বর্বর' দেশে যথোপযুক্ত সম্মান না পাইয়া তিনি প্রত্যাবর্তন করেন। এই উক্তি কতটা সত্য তাহা বলা শক্ত। ইহা সত্য হইলেও দেখা যায় হর্ষবর্ধন শশাঙ্কের রাজ্য আক্রমণ করিয়া বিশেষ সাফল্য লাভ না করিতে পারিয়া ফিরিয়া যান। এই লেখকের মতে শশাঙ্কের রাজত্বকাল মাত্র ১৭ বৎসর। ইহাও সত্য নহে। শশাঙ্ক নিশ্চিতভাবে ৬০৬ খ্রীষ্টাব্দ পূর্বে সিংহাসনে বসিয়াছিলেন এবং হিউয়েন সাঙ-এর বিবরণ অনুসারে ৬৩৭ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে তাহার মৃত্যু হয়।

সম্ভবত শশাঙ্ক এই দীর্ঘকাল গৌড়, মগধ, দণ্ডভুক্তি, উৎকল ও কঙ্গোদের অধিপতি ছিলেন। তিনি শিবের উপাসক ছিলেন। হিউয়েন সাঙ শশাঙ্কের বৌদ্ধ বিদ্বেষ সম্পর্কে অনেক কাহিনী লিখিয়াছেন। কিন্তু এগুলিও বিশ্বাস করা কঠিন। তাহার বর্ণনাতেই শশাঙ্কের রাজধানী কর্ণসুবর্ণে বৌদ্ধধর্মের বিপুল প্রসার ও প্রতিপত্তি লক্ষ্য করা যায়।[১০]

বাংলার ইতিহাসে শশাঙ্ক এক বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া আছেন। তিনিই প্রথম আর্যাবর্তে বাঙ্গালী সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেন। তাহার এই স্বপ্ন আংশিকভাবে সফলও হয়। প্রতিদ্বন্দ্বী প্রবল মৌখরি রাজশক্তি তাহার কূটনীতি ও বাহুবলে ধ্বংস হয়। সমগ্র উত্তরাপথের অধীশ্বর প্রবল শক্তিশালী হর্ষবর্ধনের সকল চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া তিনি বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার বিস্তীর্ণ অঞ্চলের উপর আধিপত্য বজায় রাখিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। বানভট্টের মত চরিতকার অথবা হিউয়েন সাঙ-এর মত বন্ধু থাকিলে তাহার খ্যাতিও হর্ষবর্ধনের মত চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িত। কিন্তু ভাগ্যবিড়ম্বনায় তিনি স্বদেশে অজ্ঞাত ও অখ্যাত। শত্রুর কলঙ্ক কালিমায় তিনি জগতে পরিচিত। উত্তর ভারতের আধিপত্য লইয়া পরবর্তীকালে পালরাজাদের সহিত গৌড় ও কনৌজের যে সুদীর্ঘ সংগ্রাম হইয়াছিল তাহার সূচনা হয় তাহার রাজত্বকালে। অর্থাৎ তিনিই সর্বপ্রথম বঙ্গদেশকে ও বাঙ্গালীকে উত্তরভারতের রাষ্ট্রীয় রঙ্গমঞ্চে রাজনীতির প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ করাইয়াছিলেন।

শশাঙ্ক পরবর্তী ও প্রাক পালযুগ

শশাঙ্কের মৃত্যুর ঠিক পরে বঙ্গদেশে এক ঘোরতর রাজনৈতিক বিপর্যয় উপস্থিত হয়। বিশাল গৌড় সাম্রাজ্য শাসনের তাঁহার যে স্বপ্ন ছিল তাহা শুধু ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল তাহা নয়, তাঁহার মৃত্যুর কয়েক বৎসরের মধ্যে রাজধানী কর্ণসুবর্ণসহ তাহার রাজ্যের অধিকাংশ অঞ্চল কামরূপরাজ ভাস্করবর্মা অধিকার

করিয়া নেন। এই ধরনের এক রাজনৈতিক বিপর্যয় কি ভাবে ঘটিয়াছিল তাহার বিস্তৃত বিবরণ জানা যায় না। শুধু ছোটখাট ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত কয়েকটি ঘটনার দ্বারা এই সময়কার ইতিহাস মোটামুটি আন্দাজ করা যায়।

শশাঙ্কের মৃত্যুর ঠিক পরে (আ-মা-৬৩৮ খ্রীঃ) হিউয়েন সাঙ বঙ্গদেশ পরিভ্রমণ করিতে আসেন। তিনি বঙ্গদেশের চারিটি রাজ্যের উল্লেখ করিয়াছেন। বঙ্গদেশের সীমান্তে রাজমহলের নিকটবর্তী—ক-জঙ্গল রাজ্য বাদে মূল বঙ্গদেশের যে চারিটি রাজ্যের কথা তিনি বলিয়াছেন তাহা হইল, পুণ্ড্রবর্ধন, কর্ণসুবর্ণ, সমতট ও তাম্রলিপ্ত। ইহাদের মধ্যে প্রথম দুইটি নিঃসন্দেহে শশাঙ্কের রাজ্যের উত্তর ও পশ্চিম অঞ্চল (বর্তমান বর্ধমান, বীরভূম, নদীয়া ও মুর্শিদাবাদ জেলা)। হিউয়েন সাঙ অবশ্য এই রাজ্যগুলির রাজধানী উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু তাহাদের রাজনৈতিক অবস্থা কি ছিল অথবা সেখানে কে রাজা ছিলেন সে বিষয়ে কিছু উল্লেখ করেন নাই। কোন কোন ঐতিহাসিক মনে করেন তাহার এই নীরবতা সম্ভবত এই রাজ্যগুলি যে হর্ষবর্ধনের সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল ইহারই ইঙ্গিত বহন করিতেছে। কিন্তু ঘটনার যে পরিণতি পরবর্তীকালে লক্ষ্য করা যায় তাহার দ্বারা এইরূপ অনুমান করার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে মনে হয় না।[১১]

হিউয়েন সাঙ-এর বিবরণ হইতে একথা স্পষ্ট মনে হয় যে শশাঙ্কের মৃত্যুতে তাহার রাজ্যের উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চল বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়া স্বতন্ত্র রাজ্য গড়িয়া উঠিয়াছিল। সম্ভবত এই অবস্থাতেই এই রাজ্যগুলি কামরূপ রাজ ভাস্করবর্মা অধিকার করিয়াছিলেন। তিনি শশাঙ্কের রাজধানী কর্ণসুবর্ণ হইতে কিছু কিছু দানপত্র বিতরণ করিয়াছিলেন তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। ইহাতে মনে হয় তিনি শশাঙ্কের রাজধানীও জয় করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

হিউয়েন সাঙ-এর বর্ণনা হইতে আরো জানা যায় যে আনুমানিক ৬৪২ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ ভাস্করবর্মা বিপুল সৈন্যবাহিনীসহ রাজমহলের নিকট হর্ষবর্ধনের সহিত যুদ্ধের জন্য অগ্রসর হইয়াছিলেন। এই ঘটনা হইতে একথা মনে করা যায় যে শশাঙ্কের পূর্ববর্তী সাম্রাজ্যের উপর কামরূপরাজ ভাস্করবর্মার আধিপত্য সুদৃঢ়ভাবে স্থাপিত হইয়াছিল। হিউয়েন সাঙ-এর বর্ণনা হইতে আরো একটি আশ্চর্য ঘটনা লক্ষ্য করা যায়, হর্ষবর্ধন যখন রাজমহলের নিকট ক-জঙ্গলে ভাস্করবর্মার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিলেন তাহার পূর্বেই তিনি শশাঙ্কের পূর্বতন অধীনস্থ রাজ্য কঙ্গোদের শৈলোদ্ভব রাজাদের করায়ত্ত করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছিলেন।[১২]

হিউয়েন সাঙ-এর এই বর্ণনা হইতে অনুমান করা যায় যে শশাঙ্কের বিশাল সাম্রাজ্যের এক অংশ ভাস্করবর্মা এবং অন্য অংশ (আ-মা-৬৩৮-৬৪২ খ্রীঃ মধ্যে) হর্ষবর্ধন জয় করিয়াছিলেন। শশাঙ্কের রাজ্যের অন্তর্গত মগধ অঞ্চলটি বাদে পুণ্ড্রবর্ধন অন্য একজন শাসকের অধীনে চলিয়া গিয়াছিল। কিন্তু তাহার এই অধিকার স্বল্পস্থায়ী হইয়াছিল। কারণ ৬৪১ খ্রীঃ কাছাকাছি সময়ে এই অঞ্চলটি হর্ষবর্ধন অধিকার করিয়া লন। খুব সম্ভবত এই ঘটনার পূর্বে হর্ষবর্ধন শশাঙ্কের রাজ্য ক-জঙ্গলও অধিকার করিয়া লন।

এইভাবে শশাঙ্কের মৃত্যুর অল্পসময়ের মধ্যে যে রাজনৈতিক বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি হইয়ছিল সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করিয়া তাহার দুই প্রবল পরাক্রমশালী শত্রু হর্ষবর্ধন ও ভাস্করবর্মা তাঁহার রাজ্য ভাগাভাগি করিয়া অধিকার করিয়া লন। অর্থাৎ শশাঙ্কের স্বাধীন গৌড়রাজ্য তাহারা ধ্বংস করেন। এই বিবরণ অনুসারে মগধসহ তাম্রলিপ্ত, দণ্ডভুক্তি, কঙ্গোদ প্রভৃতি অঞ্চলের অধীশ্বর হন হর্ষবর্ধন। মনে হয় হর্ষবর্ধনের মৃত্যু পর্যন্ত তাহার এই অধিকার সম্পূর্ণ অক্ষত ছিল। শশাঙ্কের মৃত্যুর পরবর্তীকালে গৌড়সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক এই বিশৃঙ্খলার আভাস বৌদ্ধগ্রন্থ 'আর্যমঞ্জুশ্রী-মূল-কল্প'-এ পাওয়া যায়।[১৩]

৬৪৬-৪৭ খ্রীঃ হর্ষবর্ধনের মৃত্যু হয়। ইহার পরে তাহার সাম্রাজ্য বিভিন্ন দিক হইতে আক্রান্ত হইতে থাকে এবং এক বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি হয়। হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পর পূর্ব ভারতে রাষ্ট্রীয় বিশৃঙ্খলার সুযোগে চীন, তিব্বত ও কামরূপ রাজাদের এই দিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছিল এবং তিব্বত রাজ স্ট্রং-সন গ্যাম্পো (Strong-Tsn-Gampo, 600-650) কামরূপ ও পূর্বভারতের অনেকটা অঞ্চল অধিকার করিয়া লন। ইনি আসাম, নেপাল এবং ভারতবর্ষের বহু স্থান অধিকার করিয়াছিলেন বলিয়া দাবি করেন। তাহার এই ভারত অভিযানের কোন নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায় না। কিন্তু তিনি নিজে ভারতের প্রায় অর্ধেকের উপর আধিপত্য স্থাপন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন বলিয়া দাবি করিয়াছেন। তাহার এই দাবির মধ্যে অনেক অতিরঞ্জন আছে। তবে মনে হয় তাহার বিজয়ের ঘটনা অনেকটা সত্য। কারণ নিশ্চিতভাবে জানা যায় যে ভাস্করবর্মার মৃত্যুর এক দুই বৎসরের মধ্যে তাহার রাজ্য একজন ম্লেচ্ছ রাজা কর্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল। এই ম্লেচ্ছ রাজা তিব্বতের অধিপতি গাম্পো হওয়া বিচিত্র নয়। তাহার পৌত্র কি-লি-প-পু (Ki-Li-Pa-Pu, 650-670) তিব্বতের অধিপতি হন। তিনি দিগ্বিজয়ী বীর ছিলেন এবং

মধ্যভারত পর্যন্ত তাহার রাষ্ট্রীয় প্রভাব বিস্তৃত ছিল। এইসব বিজয়ের প্রভাব বঙ্গদেশেও লাগিয়াছিল সন্দেহ নাই। তিব্বত রাষ্ট্রের আক্রমণের ভীতি বহুদিন ভারতবর্ষে বিশেষতঃ কাশ্মীর, কামরূপ, নেপাল এবং বঙ্গদেশে সক্রিয় ছিল বলিয়া মনে হয়। সম্ভবত শুধু সপ্তম শতকে নহে সমগ্র অষ্টম ও নবম শতকের কিছু সময় জুড়িয়া তিব্বতী অভিযানে ভারত বিব্রত ও পর্যুদস্ত হইয়াছিল। এমন কি পাল রাজারাও প্রথম দিকে এই আক্রমণের দ্বারা বিব্রত হইয়াছিলেন।[১৪]

বঙ্গদেশে তিব্বতের অভিযান সম্পর্কে কোন নিশ্চিত প্রমাণ যদিও পাওয়া যায় না তথাপি মনে হয় বঙ্গদেশ তিব্বতী রাজাদের আধিপত্য খুব দীর্ঘস্থায়ী হয় নাই। ভারতীয় রাজাগণ সম্ভবত ৭০২ খ্রীঃ পূর্বে তিব্বতের অধীনতাপাশ ছিন্ন করিয়াছিল। তথাপি এই অল্পস্থায়ী সময়ের মধ্যে তিব্বতীয় অভিযান বঙ্গদেশের রাজনীতিতে খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।

হর্ষের মৃত্যুর পর তাহার মগধ অঞ্চলের সাম্রাজ্যের উপর পরবর্তী গুপ্ত রাজাগণ আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। হর্ষের মৃত্যুর কিছুকাল পরে (অষ্টম শতকের কিছুকাল পরে) আদিত্য সেন এবং তাহার পরবর্তী তিন জন শাসক সম্ভবত এই অঞ্চল শাসন করিয়াছিলেন। তাহারা প্রত্যেকে সম্রাট উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহাতে মনে হয় তাহারা মোটামুটি শক্তিশালী শাসক ছিলেন। কেহ কেহ মনে করেন ইহাদের সাম্রাজ্যের মধ্যে বঙ্গদেশের একটা বৃহত্তর অংশ অন্তর্ভুক্ত ছিল। যদিও এ-সম্পর্কে কোন নির্ভরযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায় নাই।

অষ্টম শতকের প্রথমভাগে সম্ভবত ৭২৫-৭৩৫ খ্রীঃ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কনৌজরাজ যশোবর্মণ উত্তর ভারত জয় করিয়া হর্ষবর্ধনের মত গৌড়রাজকে পরাজিত করিয়াছিলেন। তিনি মগধ ও গৌড়রাজ্য জয় করিয়া গৌড়-রাজকে নিহত করেন এবং সমুদ্রতীরের দিকে অগ্রসর হইয়া বঙ্গদেশ নিজ করায়ত্ব করেন। তাহার এই বিজয়কাহিনী কনৌজরাজ সভাকবি বাক্-পতিরাজ গৌড় বহো (গৌড় বধ) নামক প্রাকৃত ভাষায় রচিত একটি কাব্যে বর্ণনা করিয়াছেন। এই কাব্যে বর্ণিত কাহিনী কতটা ঐতিহাসিক সত্যের উপরে নির্ভরশীল তাহা নির্ণয় করা খুব শক্ত। যদি এই কাহিনী সত্য হয় তাহা হইলে সেকালের গৌড় বঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলের সঙ্গে তাম্রলিপ্ত প্রভৃতি দক্ষিণ পশ্চিমবঙ্গের বিস্তীর্ণ অঞ্চল কনৌজরাজ যশোবর্মার প্রভুত্ব মানিয়া লইয়াছিল একথা স্বীকার করিতে হয়। যশোবর্মন অবশ্য তাহার দিগ্বিজয়ের ফল বেশীদিন

ভোগ করিতে পারেন নাই। কারণ দ্বাদশ শতকের কাশ্মীরের ঐতিহাসিক কলহনের বিবরণ হইতে জানা যায় যে কনৌজের যশোবর্মন (৭৩৫-৩৬ খ্রীঃ) কিছু পরে কাশ্মীররাজ ললিতাদিত্যের হাতে শোচনীয়ভাবে পরাজিত ও নিহত হন এবং তাহার ভারতীয় রাজ্য তাম্রলিপ্তসহ গৌড়দেশ প্রভৃতি ললিতাদিত্যের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। এই সব ইতিহাসে কনৌজরাজ যশোবর্মন অথবা কাশ্মীর রাজ ললিতাদিত্যের নিকট তাম্রলিপ্তসহ দক্ষিণ পশ্চিমবঙ্গের কোন রাজা বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন সে সম্পর্কে কোন খবর পাওয়া যায় না। আপাতদৃষ্টিতে তাহারা কোন বিখ্যাত বা শক্তিশালী রাজা ছিলেন না এই বিষয়ে নিশ্চিত কারণ সেই রকম হইলে বাক্‌পতিরাজ অথবা কলহন নিশ্চই তাহা উল্লেখ করিতেন। অনুমান করা অসঙ্গত নহে যে শশাঙ্কের মৃত্যুর পরে সমগ্র গৌড় রাষ্ট্রীয় বিশৃঙ্খলায় বিপর্যস্ত হইয়াছিল। সেই সময় গৌড়বঙ্গের শাসনাধীন বিভিন্ন অঞ্চল বিভিন্ন সামন্ত রাজাদের অধীনে কার্যত শাসিত হইতেছিল। কেন্দ্রের প্রতি তাহাদের আনুগত্য ছিল সম্ভবত মৌখিক এবং নামেমাত্র। এই সর্বাঙ্গীন দুর্যোগের সম্পূর্ণ সুযোগ বহিঃবঙ্গ হইতে যশোবর্মন ও ললিতাদিত্যের মত রাজারা পূর্ণ সদ্ব্যবহার করিতে বঙ্গদেশে আসিয়াছিলেন এবং সম্ভবত সেই প্রচেষ্টায় তাহারা সফলকাম হইয়াছিলেন। অষ্টম শতকের মধ্যভাগে প্রসিদ্ধ পাল রাজবংশের উত্থান পর্যন্ত শশাঙ্কের মৃত্যুর প্রায় একশতাধিক বৎসর গৌড়বঙ্গের রাজনৈতিক ভাগ্যাকাশ দুর্যোগ সমাচ্ছন্ন ছিল। এই প্রসঙ্গে তিব্বতী ঐতিহাসিক লামা তারানাথের তাৎপর্যপূর্ণ উক্তি বিশেষ স্মরণীয়। তিনি বলিয়াছেন, এই সময় গৌড়বঙ্গের আর কোন রাজার অস্তিত্ব নাই, রাষ্ট্র ছিন্নবিচ্ছিন্ন ব্রাহ্মণ নাগরিক, ক্ষত্রিয় বণিক সকলেই যেন নিজ নিজ বাড়িতে রাজা হইয়া বসিয়াছেন। কিন্তু তাহাও কয়েকদিনের জন্য। আজ যিনি রাজা কাল তিনি পথের ভিখারী। এই চরিত্রের অনুরূপ আভাস পাওয়া যায় প্রসিদ্ধ পাল রাজা ধর্মপালের (৭৭৫-৮১০ খ্রীঃ) খালিমপুর তাম্রশাসনে, ইহাতে গোপালকে রাজা করিবার পূর্বেকার অবস্থা বর্ণনা করিতে গিয়া, "মাৎস্যন্যায়" কথাটি ব্যবহার করা হইয়াছে। এই 'মাৎস্যন্যায়' এমন একটি অবস্থা যেখানে বড়মাছ ছোট মাছগুলিকে আত্মসাৎ করে। অর্থাৎ এককথায় 'জোর যার মুল্লুক তার' এই অবস্থায়ই সৃষ্টি হইয়াছিল। স্বাভাবিক কারণে মনে হয় তাম্রলিপ্ত জনপদটি ও এই সময় 'মাৎস্যন্যায়ের' কবলে পড়িয়াছিল। কোন একজন শক্তিমান রাজার অধীনে তাম্রলিপ্তে এই সময় শান্তিশৃঙ্খলা বিরাজ করিতেছিল এমন কোন তথ্য কোন সূত্র হইতে পাওয়া যায় নাই।[১৫]

সূত্র নির্দেশ

১। রমেশচন্দ্র মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস, পৃঃ ২৭

২। History of Orissa, N. K. Sahu, P. K. Mishra, J. K. Sahu (1981), p. 94

৩। History of Orissa, ibid, pp. 106-107

৪। কল্যাণকুমার দাসগুপ্ত, ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে তাম্রলিপ্ত, "রাজনৈতিক ইতিহাসে প্রাচীন তাম্রলিপ্ত", পৃঃ ১১৭-১১৮

৫। History of Bengal, Vol. I, p. 60 ; History of Orissa, op. cit., p. 107

৬। History of Bengal, op. cit., p. 61-62

৭। মজুমদার, পূর্বে উল্লিখিত, পৃঃ ২৯

৮। তদেব, পৃঃ ২৯-৩০

৯। History of Bengal, op. cit., p. 68

১০। History of Bengal, ibid, p. 68-98 ; মজুমদার, পূর্বে উল্লিখিত, পৃঃ ৩০-৩৩

১১। History of Bengal, ibid, p. 77

১২। মজুমদার, পূর্বে উল্লিখিত, পৃঃ ৩৪

১৩। History of Bengal, op. cit., p. 78-79

১৪। নীহাররঞ্জন রায়, বাঙালীর ইতিহাস (প্রথম খণ্ড), পৃঃ ৪৯০-৪৯১

১৫। দাসগুপ্ত, পূর্বে উল্লিখিত, পৃঃ ১১৮-১২৯

চতুর্থ অধ্যায়

পাল যুগ

গোপালদেব (আনুমানিক ৭৫০-৭৭০ খ্রীঃ)

শশাঙ্কের মৃত্যুর পর প্রায় একশত বৎসরব্যাপী অনৈক্য, আত্মকলহ ও বহিঃশত্রুর পুনঃপুনঃ আক্রমণের ফলে বঙ্গদেশের রাজতন্ত্র ধ্বংস হইয়া গিয়াছিল। এই অরাজকতার কথা গোপালদেবের পুত্র ধর্মপালের খালিমপুর তাম্রশাসনে উল্লিখিত আছে। এই ঘটনার প্রায় এক হাজার বৎসর পরে বৌদ্ধলামা তারানাথ বঙ্গদেশে এই সময়কার অরাজকতার সম্পর্কে অনেক কথা লিখিয়াছেন। এই চরম দুঃখ-দুর্দশা ও রাজনৈতিক অস্থিরতা হইতে মুক্তিলাভের জন্য সে যুগে বাঙ্গালীজাতি যে রাজনৈতিক বিজ্ঞতা, দূরদর্শিতা ও আত্মত্যাগের পরিচয় দিয়াছিল ইতিহাসে তাহা চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। দেশের প্রধান নেতাগণ পরস্পর বিবাদ ও বিসংবাদ বিসর্জন দিয়া জাতির সঠিক স্বার্থের জন্য গোপাল নামক এক ব্যক্তিকে বঙ্গদেশের রাজপদে নিযুক্ত করিলেন এবং সকলে স্বেচ্ছায় তাহার প্রভূত্ব স্বীকার করিলেন। দেশের জনসাধারণও এই ব্যবস্থা অনুমোদন করিল। দেশের মঙ্গলের জন্য ব্যক্তিগত স্বার্থ বিসর্জন দিবার এই ধরণের সামাজিক বুদ্ধি ও রাষ্ট্রীয় চেতনার দৃষ্টান্ত শুধু বঙ্গদেশের ইতিহাসেই নয় সমগ্র ভারতবর্ষের ইতিহাসেও বিরল।[১]

গোপালদেবের সিংহাসন আরোহণের সঠিক তারিখ বলা কঠিন। সম্ভবতঃ তিনি অষ্টম শতকের মাঝামাঝি পাল বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। দ্বাদশ শতকের তৃতীয় পাদে গোবিন্দপালের পর এই বংশের বিলোপ ঘটে। সুদীর্ঘ চারিশত বৎসর ধরিয়া একটি বংশের রাজত্বে খুব কম দেশের ইতিহাসে দেখা যায়। গোপালদেবের বংশ পরিচয় বিশেষ কিছু জানা যায় নাই তবে তাহারা সকলে বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিলেন। মনে হয় গোপালদেব কোন রাজবংশে জন্মগ্রহণ করেন নাই। তাহার পিতামহ দয়িতবিষ্ণু ছিলেন সর্ববিদ্যাবিশারদ ও তাহার পিতা বপ্যট ছিলেন যুদ্ধ ব্যবসায়ী। এই সমস্ত তথ্যও পালরাজাদের তাম্রশাসনে পাওয়া যায়।[২]

সম্ভবতঃ গোপালদেবও পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া সুনিপুণ যোদ্ধা হিসাবে পরিচিত হইয়াছিলেন। কারণ দেশের এই সঙ্কটের সময় বঙ্গের নেতাগণ

বংশমর্যাদাহীন যুদ্ধে অনভিজ্ঞ কোন এক তরুণ ব্যক্তিকে রাজপদে নির্বাচিত করিয়াছিলেন ইহা সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। পরবর্তীকালে রাজাগণ নিজেদের ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দিতেন। গোপালদেব হয়ত সে যুগের একজন অন্যতম সামন্ত নায়ক ছিলেন।

গোপালদেবের রাজ্যের কেন্দ্রবিন্দু কি ছিল অথবা তাহার রাজ্যের সীমানা কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এ বিষয়ে সঠিক তথ্য পাওয়া যায় নাই। তবে পালরাজাদের রাজত্বের প্রথম দুইশত বৎসরের যতগুলি তাম্রলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহার প্রায় সবগুলিই মগধ হইতে প্রচলন (issue) করা হইয়াছিল। ইহাতে মনে হয় এই অঞ্চলটি সবসময়ই প্রায় পালরাজাদের অধিকারে ছিল। পরবর্তীকালে লিখিত 'রামচরিত' গ্রন্থের লেখক সন্ধ্যাকর নন্দী বরেন্দ্রভূমিকে পালরাজাদের "জনক-ভূ" অর্থাৎ পিতৃভূমি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন গোপালদেব সম্ভবতঃ বরেন্দ্রের অধিবাসী ছিলেন। তিনি সমগ্র বঙ্গদেশের অধিপতি ছিলেন কিনা এ বিষয়েও সঠিক কিছু বলা সম্ভব নয়। মুঙ্গেরে প্রাপ্ত দেবপালের একটি তাম্রশাসনে গোপালদেব সমুদ্র পর্যন্ত জয় করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লিখিত আছে। অবশ্য ইহার ব্যাখ্যা কিছু পাওয়া যায় নাই। কাজেই ইহা হইতে কোন কিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব নয়। তাহার পুত্র ধর্মপাল সুদূর পাঞ্জাব পর্যন্ত বিজয় অভিযান করিয়াছিলেন। এই ঘটনা হইতে অনুমান করা যায় যে তাহার পিতা গোপালদেবের স্বল্পকালীন রাজত্বের বঙ্গদেশকে একটি সংহত ও সমৃদ্ধ রাজ্যে পরিণত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। ইহাতে তাহার রাজোচিত গুণাবলীর যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় এবং বোঝা যায় বঙ্গদেশের নেতারা যোগ্য ব্যক্তির হাতেই দেশের শাসনভার তুলিয়া দিয়াছিলেন।[৩]

ধর্মপাল (আঃ ৭৭০-৮১০ খ্রীঃ)

গোপালের মৃত্যুর পর তাহার পুত্র ধর্মপাল সিংহাসনে আরোহন করেন। তিনি ছিলেন বীর, সাহসী ও রাজনীতিকুশল। প্রথম হইতে তিনি আর্যাবর্তে এক সাম্রাজ্য স্থাপনের কাজে মাতিয়া উঠিয়াছিলেন। তাহার প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন গুর্জরপ্রতীহার বংশীয় রাজা বৎসরাজ। দক্ষিণাপথের রাষ্ট্রকূট রাজধ্রুবও এই দ্বন্দ্বের সামিল হইয়াছিলেন। অর্ধশতাব্দী-পূর্বে যে দেশ পরপদানত এবং অরাজকতা ও অত্যাচারের লীলাভূমি ছিল, সেই দেশ সহসা শক্তিশালী হইয়া সমগ্র আর্যাবর্তে প্রভুত্ব বিস্তার করিবে ইহা প্রায় অলৌকিক কাহিনী বলিয়া

মনে হয়। এই সাম্রাজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনে এক নূতন প্রাণবন্যার সূচনা হয় যাহার বিকাশ দেখা যায় ধর্ম, শিল্প ও সাহিত্যের মধ্যে। চারিশত বর্ষব্যাপী পালরাজাদের রাজত্বকাল বাঙালী জাতির আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠার যুগ। ধর্মপালের রাজ্যকাল বাঙালীর জীবন প্রভাত।[৪]

অশোকের পূর্বস্মৃতি বিজড়িত পাটলীপুত্রে ধর্মপাল নিজের রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। তাহার একটি লিপিতে তিনি নিজেকে বঙ্গপতিরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। এই লিপিতে 'বঙ্গ' শব্দে যদি সমগ্র বঙ্গদেশকে বোঝায় তাহা হইলে মনে হয় পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য অঞ্চলের সহিত তাম্রলিপ্তও ধর্মপালের সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। পিতার ন্যায় ধর্মপাল বৌদ্ধ ছিলেন। কিন্তু তাহার অন্য ধর্মের প্রতি কোন বিদ্বেষ ছিল না। ধর্মপাল সম্রাটজনোচিত উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহার পিতার উপাধি ছিল মহারাজাধিরাজ। তিনি উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন 'পরমেশ্বর পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ'। তাহার সাম্রাজ্যের বিশালত্বের প্রতীক হইল এই নূতন উপাধি। পাল রাজাগণের প্রশস্তিতে ও অন্যান্য সূত্রে সমগ্র আর্যাবর্তের উপরে ধর্মপাল সার্বভৌম আধিপত্যলাভ করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ আছে। তবে একথা সত্য ধর্মপাল নিরুদ্বেগে এই বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকার ভোগ করিতে পারেন নাই। তথাপি তিনি যে রাজনৈতিক সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন তাহা এক কথায় অতুলনীয়।[৫]

দেবপাল (আঃ ৮১০-৮৫০ খ্রীঃ)

'পরমেশ্বর পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ' দেবপাল পিতার উপযুক্ত পুত্র ছিলেন। তিনি পিতার সাম্রাজ্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে সক্ষম হইয়া ছিলেন। তাহার রাজত্বের যে সমস্ত বিবরণ পাওয়া যায় তাহা হইতে মনে হয় তিনি তাহার দীর্ঘ ৪০ বৎসর ব্যাপী রাজত্বকালে বহু যুদ্ধ করিয়া শুধু পিতার সময়কার রাজ্যসীমা অক্ষুণ্ণ রাখেন নাই, উপরন্তু আরো নূতন নূতন রাজ্য জয় করিয়া ছিলেন। তাহার তাম্রশাসনে উল্লিখিত আছে যে তাহার বিজয় কাহিনী দক্ষিণে বিন্ধ্য ও পশ্চিমে কম্বোজ দেশ পর্যন্ত অর্থাৎ কাশ্মীরের সীমান্ত পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিল। ধর্মপালের মন্ত্রী দর্ভপানি (Dharva Pani) ও তাহার পৌত্র কেদার মিশ্র উভয়েই দেবপালের রাজত্বকালে প্রধানমন্ত্রীর পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। কেদার মিশ্রের পুত্র গুরব মিশ্রের এক লিপিতে উল্লিখিত হইয়াছে যে দর্ভপানির নীতি ও কৌশলে দেবপাল হিমালয় হইতে বিন্ধ্যপর্বত

এবং পূর্ব ও পশ্চিমের সমগ্র ভূভাগ হইতে কর আদায় করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। এই লিপিতে আরো উল্লিখিত হইয়াছে যে মন্ত্রী কেদার মিশ্রের কৌশলে গৌড়েশ্বর দেবপাল উৎকল রাজ্য ধ্বংস করিয়াছিলেন, হুনদের গর্ব খর্ব করিয়াছিলেন এবং দ্রাবিড় ও গুর্জরপ্রতীহারদের দর্পচূর্ণ করিয়া আসমুদ্র পৃথিবী ভোগ করিয়াছিলেন। ইহাতে আরো বলা হইয়াছে দেবপালের ভ্রাতা জয়পালের নেতৃত্বে সৈন্যরা অগ্রসর হইলে তাহা দেখিয়া যুদ্ধ না করিয়াই উৎকলের রাজা পলায়ন করিয়াছিলেন এবং প্রাগ্‌জোতিষের (আসাম) রাজাও যুদ্ধ না করিয়া বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন। উল্লিখিত দুইখানি লিপির দাবি অনুসারে দেবপালের রাজত্বের সবগৌরবই ওই মন্ত্রীদ্বয়ের প্রাপ্য। ইহা অনুসন্ধান সাপেক্ষ। যে রাজা ভারতবর্ষের এত বিস্তৃত অঞ্চলে অধিকার প্রসারিত করিয়াছিলেন তাহার সম্বন্ধে এই ধরণের উক্তির মধ্যে অতিরঞ্জন আছে বলাই বাহুল্য।

দেবপালের রাজত্বের বিবরণ হইতে বোঝা যায় তিনি উড়িষ্যা ও আসাম এই দুই সীমান্ত প্রদেশ জয় করেন। ইহার মধ্যে তাহার উৎকল বিজয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। উড়িষ্যার রাজাকে পরাজিত করিয়া দেবপাল সম্ভবত উড়িষ্যাকে পাল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছিলেন। বাদল স্তম্ভ লিপিতে বলা হইয়াছে উৎকলের রাজা বিনা যুদ্ধে রাজধানী পরিত্যাগ করিলে উৎকলবাসীদের হত্যা করা হয়। কিন্তু ইহা কতটা সত্য তাহা নির্ণয় করা কঠিন। উৎকল রাজার রাজধানী পরিত্যাগ ও পরবর্তীকালে সেই রাজ্য অধিকার করার এই ঘটনা পালরাজাদের ক্ষেত্রে "উৎকীলিতোৎকলকুল" এই শব্দ প্রয়োগের দ্বারা সমর্থন করে। উড়িষ্যার ভঞ্জ রাজবংশের লিপি হইতে জানা যায় যে রনভঞ্জের পর এই বংশীয় রাজাগণ প্রাচীন খিঞ্জলী রাজ্য ও রাজধানী ত্যাগ করিয়া উড়িষ্যার দক্ষিণ সীমান্তে গঞ্জাম জেলায় আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। রনভঞ্জ সম্ভবতঃ নবম শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। সুতরাং খুব সম্ভব এই বংশীয় রাজাকে পরাজিত করিয়াই দেবপাল উড়িষ্যা অধিকার করেন। খুব স্বাভাবিক কারণে মনে হয় দেবপাল তাহার পিতার ন্যায় উড়িষ্যার রাজ্য জয় করিবার পূর্বে তাম্রলিপ্ত অঞ্চলের উপরেও অধিকার ভোগ করিতেন।[৬]

মুঙ্গেরে প্রাপ্ত দেবপালের এক তাম্রশাসনে তাহার সম্রাজ্য উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে সেতুবন্ধ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল বলা হইয়াছে। ইহা অতিরঞ্জন এবং কবিকল্পনা মনে হয়। তবে কেহ কেহ মনে করেন যে ইহার মূলে সামান্য কিছু সত্য থাকিলেও থাকিতে পারে। দক্ষিণ ভারতে কয়েকটি লিপি হইতে মগধ, কলিঙ্গ,

চোল, পল্লব প্রভৃতি রাজ্য মিলিতভাবে পাণ্ড্যরাজের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল বলিয়া বলা হইয়াছে (পাণ্ড্যরাজ শ্রীমার শ্রীবল্লভের রাজত্বকাল আঃ ৮৫৬-৮৬২ খ্রীঃ)। ইহার ঠিক অব্যবহিত পূর্বে দেবপাল মগধের রাজা ছিলেন। সে জন্য মনে হয় তিনি উৎকল রাজ্য জয় করিবার পর এই অঞ্চলের অন্যান্য রাজ্যগুলির সহিত রাজনৈতিক সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। সে ক্ষেত্রে উপরে লিখিত মিলিত শক্তির সহিত দেবপাল পাণ্ড্যরাজ্যের সহিত কোন যুদ্ধে জয়লাভ করিতেও পারেন। দেবপালের রাজত্বকালে পাল সাম্রাজ্যের গৌরব চরম শিখরে উঠিয়াছিল। আরব দেশীয় বণিক ও পর্যটক সুলেমান দেবপালের রাজত্বকালে (৮৫১ খ্রীঃ) কয়েকবার ভারতবর্ষে যাতায়াত করিয়াছিলেন। ধর্মপালের খ্যাতি ভারতবর্ষের বাহিরেও এতদূর ছড়াইয়া পড়িয়াছিল যে যাভা, সুমাত্রা এবং মালয় উপদ্বীপের শৈলেন্দ্রবংশীয় রাজা বালপুত্রদেব তাহার নিকট এক রাষ্ট্রদূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই রাষ্ট্রদূত মারফৎ তিনি নালন্দা বিহারে যে মঠ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন তাহার ব্যায় নির্বাহের জন্য পাঁচটি গ্রামদানের প্রার্থনা জানাইয়া ছিলেন। দেবপাল তাহাকে পাঁচটি গ্রাম দান করেন। নালন্দা তখন সমগ্র এশিয়ার মধ্যে বৌদ্ধধর্মের প্রধান কেন্দ্র হইয়া উঠিয়াছিল এবং পালরাজাগণ ও বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষকরূপে ভারতের বাহিরে সর্বত্র বৌদ্ধদের নিকট সুপরিচিত ও সম্মানিত ছিলেন।[৭]

পাল সাম্রাজ্যের পতন

দেবপালের মৃত্যুর প্রায় তিনশত বৎসর পর্যন্ত পাল রাজবংশের ইতিহাস কবি বর্ণিত 'পতন অভ্যুদয় বন্ধুর পন্থায়' অগ্রসর হইয়াছিল। অর্থাৎ উত্থান পতনের মধ্য দিয়া আরো চারিশত বৎসর অতিবাহিত হইবার পর অবশেষে এই প্রসিদ্ধ রাজবংশ ইতিহাসের অমোঘ নিয়মে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

দেবপালের মৃত্যুর পর বিগ্রহপাল সিংহাসনে আরোহণ করেন (প্রথম বিগ্রহপাল আঃ ৮৫০-৫৪ খ্রীঃ) দেবপাল ও বিগ্রহপালের মধ্যে কি সম্পর্ক ছিল তাহা লইয়া পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। কাহারও কাহারও মতে বিগ্রহপাল দেবপালের পুত্র। কিন্তু অধিকাংশ পণ্ডিতগণ মনে করেন তিনি ধর্মপালের ভ্রাতা, বাকপালের পৌত্র ও জয়পালের পুত্র। তিনি শূরপাল নামেও পরিচিত ছিলেন। তাহার সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে তিনি দেবপালের নিকট হইতে যে বিশাল সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকার লাভ করিয়াছিলেন তাহা মোটামুটি অক্ষুন্ন রাখিয়াছিলেন এবং তিনি বহু শত্রুকে বিনষ্ট করিয়াছিলেন।

বৃদ্ধ কেদার মিশ্র এই রাজার আমলেও মন্ত্রী ছিলেন। বিগ্রহপাল মনে হয় শান্তিপ্রিয় ও সংসার বিরাগী লোক ছিলেন। সেজন্য অল্প কিছুদিন রাজত্ব করিবার পর তিনি পুত্র নারায়ণপালের হস্তে সিংহাসন অর্পণ করিয়া বানপ্রস্থ গ্রহণ করেন।

নারায়ণপালও (আঃ ৮৫৪-৯০৮ খ্রীঃ) পিতার ন্যায় শান্তিপ্রিয় ও উদ্যমহীন রাজা ছিলেন। তাহার সুদীর্ঘ ৫৪ বৎসর রাজত্বকালের মধ্যে একটি লিপি ভাগলপুরে আবিষ্কৃত হইয়াছে। কেদার মিশ্রের পুত্র গুরব মিশ্র তাহার মন্ত্রী ছিলেন। এই গুরব মিশ্রের কয়েকটি লিপিতে ধর্মপাল ও দেবপালের রাজত্বের উল্লেখ আছে। কিন্তু বিগ্রহপাল ও নারায়ণপাল সম্পর্কে সে রকম কোন উল্লেখ নাই। ধর্মপাল ও দেবপাল বাহুবলে যে বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন শান্তির নীতিদ্বারা তাহা রক্ষা করা সম্ভব ছিল না। সুতরাং তাহাদের প্রায় অর্ধশতাব্দীর অধিককালব্যাপী রাজত্বকালে বিশাল পাল সাম্রাজ্য খণ্ড বিখণ্ড হইয়া যায়। এমন কি বঙ্গ ও বিহারের কিছু কিছু অংশ বহিঃশত্রু কর্তৃক অধিকৃত হয়।

এই যুগের বঙ্গের বাহিরে দুই রাষ্ট্রশক্তির (রাষ্ট্রকূট ও প্রতীহার) ইতিহাস হইতে বঙ্গদেশের রাজাদের দুর্বলতার কথা অনুধাবন করা যায়। সম্ভবতঃ এই দুই রাষ্ট্রশক্তি ছিল পালদের চিরাচরিত শত্রু। রাষ্ট্রকূটদের একটি লিপি (শিরুর, Sirur) হইতে জানা যায় যে রাষ্ট্রকূট রাজ অমোঘবর্ষের নিকট (আঃ ৮১৪-৮৮০ খ্রীঃ) অঙ্গ, বঙ্গ ও মগধের শাসকেরা বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন। আঃ ৮৬০ খ্রীঃ অমোঘবর্ষ কৃষ্ণা ও গোদাবরীর বেদীদেশ জয় করেন। সম্ভবতঃ ইহার অনতিকাল পরে তিনি পালরাজ্য আক্রমণ করেন। তবে রাষ্ট্রকূট রাজা স্থায়ীভাবে দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গে পালরাজ্যের এই অঞ্চল অধিকার করিয়াছিলেন এরূপ মনে হয় না। বরং মনে হয় তাহারা সমুদ্রতীরবর্তী অঞ্চল জয় করিতে করিতে অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন, যাহা সম্ভবতঃ খুবই অল্পস্থায়ী হইয়াছিল। তথাপি এই পরাজয়ে পালরাজাগণের খ্যাতি ও প্রতিপত্তি অনেকটাই লাঘব হইয়াছিল একথা নিশ্চয়ই অনুমান করা যায়। রাষ্ট্রকূট রাজার আক্রমণের ও জয়ের এই সুযোগে উড়িষ্যার শুল্কি বংশীয় মহারাজাধিরাজ রণস্তম্ভ রাঢ়ের কিছু অংশ জয় করিয়াছিলেন। তবে মনে হয় এই জয়ও দীর্ঘস্থায়ী হয় নাই।

পাল রাজ্য এইভাবে যখন দক্ষিণ দিক হইতে আগত শত্রুর আক্রমণে ব্যতিব্যস্ত তখন প্রতীহার রাজ ভোজদেব ও উত্তর ভারতে পুনরায় আধিপত্য স্থাপনে উদ্যোগী হইয়াছিলেন। তবে যতদিন দেবপাল জীবিত ছিলেন ততদিন

তাহার এই প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ হয় নাই। কিন্তু নারায়ণ পালের ন্যায় দুর্বল রাজার পক্ষে ভোজরাজের গতিরোধ করা সম্ভবপর হয় নাই। তিনি কলচুরি ও গুহিলোট রাজাগণের সহায়তায় ভোজরাজ নারায়ণ পালকে গুরুতরভাবে পরাজিত করেন এবং পাল সাম্রাজ্যের ধ্বংসস্তূপের উপরে প্রতীহার রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করিলেন।

কাহালা (Kahla) লিপিতে উল্লিখিত আছে যে 'গুনামবোধিদেব' নামক একজন গোরক্ষপুরের কলচুরি রাজা (যিনি প্রতীহার রাজ ভোজদেবের নিকট হইতে কিছু রাজ্য পাইয়াছিলেন) গৌড়ের সার্বভৌমত্ব ছিনাইয়া লইয়া ছিলেন। এই ভোজদেব সম্ভবত সেই বিখ্যাত প্রতীহার রাজা যিনি পালদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে কলচুরি রাজের নিকট সাহায্য পাওয়ার জন্য তাহাকে যথেষ্ট পুরস্কৃত করিয়াছিলেন। মনে হয় ভোজরাজ বিখ্যাত কলচুরি রাজ প্রথম কোক্কাল্লার (Kokkalla I) নিকট হইতেও সাহায্য পাইয়াছিলেন। ইনি সম্ভবতঃ ৮৮০-৮৯০ খ্রীঃ মধ্যে রাজত্ব করিতেন। ভোজরাজাদের নিকট হইতে সাহায্য পাইয়া তিনিও সম্ভবতঃ বঙ্গদেশের কিছু অংশ আক্রমণ করিয়া ধনরত্ন লুণ্ঠন করেন। মনে হয় কলচুরি রাজ্যের আক্রমণের ফলেই ভোজরাজের পক্ষে বঙ্গদেশ অভিযান করা সহজতর হইয়াছিল। পাল রাজাদের বিরুদ্ধে অভিযানে ভোজরাজ গুহিলোটের রাজা দ্বিতীয় গোহিলাও সাহায্য করিয়া ছিলেন। অর্থাৎ ভোজরাজারা পালদের বিরুদ্ধে বিশেষভাবে প্রস্তুত হইয়াই যুদ্ধ করিতে আসিয়া ছিলেন। ফলে তাহাদের পক্ষে পাল শক্তিকে ধ্বংস করা বিশেষ কষ্টসাধ্য হয় নাই। এই ভোজরাজারা তাহাদের ক্ষমতা উত্তর ভারতে বহুদূর পর্যন্ত প্রসারিত করিয়াছিলেন।

ঠিক এই সময়ে চন্দ্র বংশীয় ত্রৈলোক্য চন্দ্র পূর্ব ও দক্ষিণবঙ্গে একটি স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়া ছিলেন। ভোজরাজের পুত্র মহেন্দ্রপাল পিতার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া পাল রাজাদের বিরুদ্ধে অভিযান করিয়া ছিলেন। তিনি সম্ভবতঃ উত্তরবঙ্গে স্বীয় প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। বাংলা এবং বিহারে তাহার যে সমস্ত লিপি পাওয়া গিয়াছে তাহাদের তারিখ ৮৮৭-৯০৪ খ্রীঃ মধ্যে। এইভাবে নবম শতাব্দীর শেষ ভাগে পাল রাজাদের দুর্বলতার সুযোগে বহিঃবঙ্গের রাজশক্তিগুলির (প্রতীহার, কলচুরি, চান্দেল্ল প্রভৃতি) পাল রাজ্য আক্রমণ করিয়া তাহাদের সাম্রাজ্যের বিস্তীর্ণ অঞ্চল অধিকার করিয়া লইয়াছিল।

নবম শতকের শেষদিকে পালদের এই শোচনীয় পরাজয়ের খুব সন্তোষজনক

ব্যাখ্যা পাওয়া খুবই কষ্টকর। একথা সত্যি যে ইহার জন্য পাল রাজাদের ব্যক্তিগত অক্ষমতা অনেক পরিমাণে দায়ী। তাহাদের দূরদর্শিতা এবং ব্যক্তিগত প্রতিভার অভাব নিশ্চয়ই ছিল। ইহা ছাড়া মনে হয় আরো কিছু কারণ গভীরে নিহিত ছিল। দেবপালের মৃত্যুর ঠিক পরবর্তীকালে বঙ্গদেশের দুই প্রতিবেশী রাজ্য আসাম ও উড়িষ্যা খুবই শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিল। উড়িষ্যার শৈলোদ্ভব রাজবংশীয় রাজারা পুনরায় শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিল। বিখ্যাত রাজা তৃতীয় সৈন্যভিতা (Sainyabhita III) ও মাধববর্মণ শ্রীনিবাস এই বংশের পূর্ণ গৌরব প্রতিষ্ঠা করেন। তাহার রাজত্বকাল আনুমানিক ৮৫০ খ্রীঃ। তিনি ও তাহার পরবর্তী রাজাগণ নিজেদের রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করিবার উদ্দেশ্যে অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। এই প্রতিবেশী রাজাদের এই ধরণের শক্তি সঞ্চয় পাল রাজাদের দুর্বলতার কারণও হইতে পারে। সুনির্দিষ্ট তথ্যের অভাবে এ সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু বলা খুবই কষ্টসাধ্য। তবে ইহা সম্ভবতঃ নিশ্চিত বলা চলে যে পালদের ভাগ্য বিপর্যয়ে এটি একটি প্রধান ঘটনা।[৮]

রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় কৃষ্ণও (আঃ ৮৮০-৯১৪ খ্রীঃ) পালরাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন। আভ্যন্তরীণ কলহ ও বিভিন্ন দিক হইতে বহিঃশত্রুর আক্রমণে পাল রাজাদের দূরবস্থা চরমে পৌঁছাইয়াছিল। এই চরম দুর্দিনে পাল রাজাগণ আর্যাবর্তে ও দাক্ষিণাত্যে দুই প্রবল রাজবংশের সহিত বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করিয়া নিজেদের শক্তি বৃদ্ধির চেষ্টা করিয়াছিলেন। বিগ্রহ পাল 'কলচুরি' অথবা 'হৈহয়' রাজবংশের কন্যা লজ্জাদেবীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। নারায়ণপালের পুত্র রাজ্যপাল রাষ্ট্রকূট রাজ সম্ভবত দ্বিতীয় কৃষ্ণের পুত্র জগতুঙ্গের কন্যা ভাগ্যদেবীকে বিবাহ করেন। এই সব বিবাহের ফলে রাজাদের কিছু সুবিধা হইয়াছিল কিনা জানা যায় না। কিন্তু নারায়ণপালের সুদীর্ঘ রাজত্বের শেষদিকে প্রতীহারদিগকে দূর করিয়া দিয়া পুনরায় বাংলা ও বিহারে নিজেদের প্রাধান্য স্থাপন করিতে তিনি সক্ষম হইয়াছিলেন।

নারায়ণপালের মৃত্যুর পর তাহার পুত্র রামপাল (আঃ ৯০৮-৯৪০ খ্রীঃ) ও তাহার পুত্র দ্বিতীয় গোপাল (আঃ ৯৪০-৯৬০ খ্রীঃ) রাজত্ব করেন। এই দুই রাজার কিছু কিছু তাম্রলিপি মগধ অঞ্চলে পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে মনে হয় তাহারা উত্তরবঙ্গের উপর পূর্ব আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করিতে পারিয়াছিলেন। প্রতীহারদের পরাজিত করিয়াই পালদের বিপদ সম্পূর্ণ শেষ হয় নাই। উত্তরভারতে অপর দুইটি রাষ্ট্রশক্তি কলচুরি ও চান্দেল্লগণ নিজেদের আধিপত্য

অর্জনে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। তাহাদের সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসী নীতির প্রভাব পাল রাজ্যের উপর পড়িয়াছিল।[৯]

চান্দেল্লদেব গৌরব যিনি স্থাপন করিয়াছিলেন সেই যশোবর্মন উত্তর ভারতে ক্রমাগত যুদ্ধ চালাইয়া নিজের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করিতেছিলেন। তাহার সভাকবির বর্ণনা অনুসারে তিনি নাকি হিমালয় হইতে মালব এবং কাশ্মীর হইতে বঙ্গদেশ পর্যন্ত রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। তাহার সভাকবির বর্ণনায় অতিরঞ্জন খানিকটা বাদদিলেও তিনি বিস্তীর্ণ অঞ্চলের উপর বিজয় অভিযান চালাইয়াছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই। যশোবর্মন ও তাহার পুত্র ধাঙ্গা (Dhanga) এই সভাকবির বর্ণনা অনুসারে রাঢ় ও অঙ্গরাজ্যের রাণীকে বন্দী করিয়াছিলেন। এই বর্ণনা আক্ষরিক অর্থে সত্য না হইলেও রাজ্যপালের উত্তরাধিকারীদের আমলে ইহাদের আক্রমণে (দ্বিতীয় গোপাল, দ্বিতীয় বিগ্রহ পাল) বঙ্গদেশ খুবই ব্যতিব্যস্ত হইয়াছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

এই সময়কার কলচুরি ইতিহাস হইতে জানা যায় যে তাহাদের দুই রাজা প্রথম যুবরাজ এবং তাহার পুত্র লক্ষ্মণরাজ বঙ্গদেশ আক্রমণ করিয়াছিলেন (ইহাদের রাজত্বকাল আঃ ১০৫০-১০৭০ খ্রীঃ)। যুবরাজ সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে তিনি গৌড়, কর্ণাট, কলিঙ্গ, কাশ্মীর প্রভৃতি অঞ্চলে বিজয় অভিযান করিয়াছিলেন। লক্ষ্মণরাজ প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে তিনি অতি কৌশলে বঙ্গরাজকে পরাজিত করিয়া বঙ্গদেশের দক্ষিণ ও পূর্বাঞ্চল অধিকার করিয়াছিলেন এবং পরবর্তীকালে রাজেন্দ্রচোলের মত উড়িষ্যা হইতে দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গের সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চলের দিকে অগ্রসর হইয়াছিলেন।

এই সমস্ত বিদেশী আক্রমণের ফলে পাল রাজাদের সামরিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা অনেকটা হ্রাস পাইয়াছিল। চান্দেল্ল ও কলচুরির বিভিন্ন লিপিতে অঙ্গ, রাঢ়, গৌড়, বঙ্গ প্রভৃতি পৃথক পৃথক রাজনৈতিক অঞ্চল বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। এই সমস্ত অঞ্চলগুলি প্রত্যেকটিই স্বাধীন অথবা অর্ধস্বাধীন রাজ্য হিসাবে গঠিত হইয়াছিল সে সম্পর্কে খানিকটা ক্ষীণ ঐতিহাসিক আভাস পাওয়া যায়। দ্বিতীয় বিগ্রহপালের পুত্র মহীপালের তাম্রশাসনে উল্লেখ আছে যে তিনি তাহার বিলুপ্ত পিতৃরাজ্য অধিকারীদের হাত হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন। সুতরাং ঐ সময়ে বা তাহার পূর্বে পাল রাজাদের রাজ্যের অনেকটা অংশই হাতছাড়া হইয়াছিল অনুমান করা যাইতে পারে। রাজনৈতিক দিক হইতে ইহাদের প্রকৃত পরিস্থিতি কি ছিল তাহা নির্ণয় করা কষ্টসাধ্য। পালদের

যে তথ্য পাওয়া যায় তাহাতে উল্লিখিত আছে বিগ্রহপালের রাজত্বের শেষ দিকে কিছুকালের জন্য বঙ্গদেশের কিছু অঞ্চল একজন জবরদখলকারী অধিকার করিয়া লইয়া ছিলেন। এই জবরদখলকারী কম্বোজের কোন প্রধান বলিয়া মনে করা হয়, যিনি এই সময়ে উত্তর ও পশ্চিমবঙ্গে শাসন করিতেন। পূর্বে এই কম্বোজের অধিবাসীদের উত্তর-পশ্চিম পার্বত্য অঞ্চলের লোক বলিয়া মনে করা হইত। বর্তমানে এক নূতন তাম্রলিপি প্রাপ্তির ফলে এই ধারণা সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইয়াছে। ইহাতে মনে হয় বানগড়, ইর্দা লিপির কম্বোজ এক ও অভিন্ন হওয়া বিচিত্র নয়। কম্বোজ রাজবংশের প্রতিষ্ঠা যে উপায়েই হোক দশম শতকের মধ্যভাগে তাহাদের অধীন উত্তর-পশ্চিমবঙ্গ একটি স্বাধীন অখণ্ডরাজ্যে পরিণত হইয়াছিল এবং কম্বোজবংশীয় রাজাগণ গৌড়পতি বলিয়া অভিহিত হইত সন্দেহ নাই।[১০]

প্রতীহার চান্দেল্ল, কলচুরি প্রভৃতি রাজবংশের লেখাবলির মিলিত সাক্ষ্য হইতে নবম ও দশম শতাব্দীর বঙ্গদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের যে চিত্র পাওয়া যায় তাহাতে স্পষ্ট বোঝা যায় যে এই সময় বঙ্গদেশের রাষ্ট্রীয় ঐক্য ও শান্তিশৃঙ্খলা বিপর্যস্ত হইয়াছিল এবং দেশটি শশাঙ্কের সময়ের মত বহুরাষ্ট্র ও জনপদে বিভক্ত হইয়াছিল এবং তাম্রলিপ্ত বা তমলুক ছিল ইহাদেরই অন্যতম। আলোচ্য লেখগুলি কোথাও তাম্রলিপ্তের স্বতন্ত্র উল্লেখ নাই।

অনুমান করা যায় যে সেই সময় তাম্রলিপ্ত গৌড় বা রাঢ়ের অন্তর্গত জনপদ-বিশেষ ছিল। তাম্রলিপ্ত বা তমলুকের সমকালীন ইতিহাস প্রসঙ্গে কিছু ইঙ্গিত প্রচ্ছন্ন অবস্থায় আছে এই লেখগুলিতে। চান্দেল্লরাজ যশোবর্মন ও তাহার পুত্র বঙ্গ রাঢ় দেশ অধিকার করিয়াছিলেন এবং তাহাদের প্রশস্তিকারদের কথা সত্য বলিয়া ধরিলে তাম্রলিপ্ত তাহাদের অধিকারে আসিয়াছিল একথা মনে করার সঙ্গত কারণ আছে। কলচুরি বংশীয় লক্ষণরাজ উড়িষ্যা জয় করিয়া সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চলের মধ্য দিয়া বঙ্গদেশে প্রবেশ করিয়াছিলেন। সুতরাং দশম শতাব্দীর ষষ্ঠ ও সপ্তম দশকে তাম্রলিপ্ত জনপদটি সাময়িকভাবে লক্ষণরাজের আনুগত্য স্বীকার করিয়াছিল বলিয়া মনে হয়।[১১]

উপরের আলোচনা হইতে ইহা সহজেই প্রতীয়মান হয় যে দ্বিতীয় গোপাল ও দ্বিতীয় বিগ্রহ পালের রাজত্বকালে পালরাজ্য তিনটি প্রধানভাগে বিভক্ত হইয়াছিল। পূর্ব-দক্ষিণবঙ্গ অর্থাৎ বঙ্গদেশের চন্দ্রবংশীয় রাজ্য, পশ্চিম-উত্তরবঙ্গে অর্থাৎ রাঢ় ও বরেন্দ্রে কম্বোজ বংশীয় রাজ্য এবং বিহার অর্থাৎ অঙ্গ ও মগধে পালরাজ্য। ইহা ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গে আরো দুইটি স্বাধীন রাজ্য ছিল, অর্থাৎ

পাল রাজাদের বিশাল বঙ্গদেশে এই সময়ে তেমন কোন প্রাধান্য ছিল না বলিয়াই মনে হয়। চান্দেল্ল, কলচুরি রাজ প্রশস্তিতে যে বঙ্গ, বঙ্গাল, গৌড়, রাঢ়, অঙ্গ প্রভৃতি রাজ্যের উল্লেখ আছে তাহা খুব সম্ভব এই স্বাধীন রাজ্যসমূহের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

মহীপালের নেতৃত্বে পাল সাম্রাজ্যের পুনরভ্যুত্থান
(৯৮৮-১০৩৮ খ্রীঃ)

দশম শতাব্দীর শেষভাগে যখন পাল রাজবংশ দুর্দশা ও অবনতির চরমসীমায় পৌছিয়াছিল তখন দ্বিতীয় বিগ্রহপালের পুত্র প্রথম মহীপাল সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাহার প্রায় অর্ধশতাব্দীব্যাপী রাজত্বকালে পাল রাজবংশের সৌভাগ্য রবি আবার উদিত হইয়াছিল। তিনি বঙ্গের বিলুপ্ত পালরাজ্য উদ্ধার ও বহিঃবঙ্গে পুনরায় পালসাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়া ইতিহাসে স্মরণীয় হইয়া আছেন। তাহার সময়কার বিভিন্ন লিপি, বিশেষভাবে বানগড় লিপি হইতে প্রমাণ পাওয়া যায় যে তিনি সিংহাসনে আরোহণ করিবার কিছুকাল পরে উত্তর ও পূর্ববঙ্গ জয় করেন।

কিন্তু সমগ্র বঙ্গদেশ জয় করিবার পূর্বে দক্ষিণভারতের পরাক্রান্ত চোলরাজ রাজেন্দ্রচোল মহীপালের রাজ্য আক্রমণ করেন। সেই সময় চোলরাজাদের ন্যায় পরাক্রমশালী রাজবংশ ভারতে আর ছিল না। উড়িষ্যা হইতে আরম্ভ করিয়া সেতুবন্ধ রামেশ্বর পর্যন্ত ভারতের পূর্ব উপকূলে প্রায় সমস্তটাই চোলরাজাদের অধীন ছিল এবং তাহাদের বিশাল নৌবাহিনী স্মমাত্রা ও মালয় উপদ্বীপের বহু রাজ্য জয় করিয়াছিল। এই বিশাল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর রাজা রাজেন্দ্রচোল শিবের উপাসক ছিলেন। তাঁহার রাজ্যকে পবিত্র করিবার উদ্দেশ্যে গঙ্গাজল আনয়ন করিবার জন্য তিনি এক বিরাট সৈন্যদল প্রেরণ করেন। তাহার সভাকবির বর্ণনা অনুসারে চোল রাজের সেনাপতি বঙ্গের সীমান্তে উপস্থিত হইয়া দণ্ডভুক্তির রাজা ধর্মপাল ও প্রসিদ্ধ দক্ষিণ রাঢ়ের অধিপতি নরশূরকে পরাজিত করিয়া এই দুই রাজ্য অধিকার করেন এবং পরে বঙ্গাল দেশ আক্রমণ করিয়া তাহার রাজা গোবিন্দচন্দ্রকে পরাজিত করেন। ইহার পর মহীপালের সহিত তাহাদের যুদ্ধ হয়। মহীপাল নাকি ভীত হইয়া রণস্থল পরিত্যাগ করেন এবং চোল সেনাপতি প্রচুর ধনরত্ন লুণ্ঠন করিয়া এবং উত্তর রাঢ় অধিকার করিয়া গঙ্গাতীরে উপস্থিত হন। চোল সভাকবি এই অভিযানের যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহাতে মনে হয় গঙ্গাজল সংগ্রহ করা ছাড়া তাহাদের আর কোন উদ্দেশ্য ছিল না।

এই অভিযান খুব সফল হয় নাই বলিয়াই চোল সভাকবি সম্ভবতঃ এই ব্যর্থতা ও পরাজয়ের গ্লানি ঢাকিবার জন্য গঙ্গাজলের কথা বলিয়াছিলেন (১০২১-১০২৩ খ্রীঃ)। রাজেন্দ্রচোল কিন্তু বঙ্গদেশ অভিযান স্মরণে 'গঙ্গাইকোণ্ডা' এই উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং 'গঙ্গাইকোণ্ডা চোলপুর' নামে একটি নূতন রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। তামিল ঐতিহাসিকগণ স্বীকার করিয়াছেন যে এই অভিযানে কোন স্থায়ী ফল হয় নাই। বিনা যুদ্ধে বঙ্গদেশের রাজা চোল সেনাপতিকে গঙ্গাজল আনিবার জন্য পথ ছাড়িয়া দিয়া ছিলেন ইহা বিশ্বাস করা কঠিন। অপর পক্ষে দিগ্বিজয়ী রাজেন্দ্রচোল (১০১৬-১০৪৪ খ্রীঃ) শুধু গঙ্গাজলের জন্যই সৈন্য প্রেরণ করিয়া ছিলেন বঙ্গদেশ জয় করা তাহার মোটেও উদ্দেশ্য ছিল না একথা বিশ্বাস করা কঠিন। রাজেন্দ্রচোলের অভিযানের প্রকৃত উদ্দেশ্য ও ফলাফল যাহাই হোক না কেন একথা সকলেই স্বীকার করেন যে চোল সৈন্যদের স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পর বঙ্গদেশে তাহাদের আর কোন চিহ্ন ছিল না। উত্তর রাঢ় মহীপালের অধীন ছিল। চোল আক্রমণের ফলে এই রাজনৈতিক অবস্থার কোন পরিবর্তন হইয়াছিল কিনা এবং মহীপাল দক্ষিণরাঢ় ও দক্ষিণবঙ্গ জয় করিয়া সমগ্র বঙ্গে তাহার আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করিতে পারিয়া ছিলেন কিনা সঠিক ভাবে বলা যায় না।[২২]

কম্বোজবংশের নৃপতি রাজ্যপালের দ্বিতীয় পুত্র নয়পালদেব তাহার রাজত্বের ত্রয়োদশবর্ষে বর্ধমান ভুক্তির অন্তর্গত দণ্ডভুক্তি মণ্ডলে জমিদান করিয়াছিলেন। এই সংবাদ উড়িষ্যার বালেশ্বর জেলার "ইর্দা" গ্রামে আবিষ্কৃত একটি তাম্রলিপি হইতে জানা যায়। এই রাজ্যপাল এবং নয়পাল প্রসিদ্ধ পালবংশের রাজা নয় বলিয়া মনে হয়। তাহা না হইলে লিপির রচয়িতা প্রসিদ্ধ বংশটির নাম বাদ দিয়া কম্বোজ বংশটির নাম উল্লেখ করিতেন না একাধিক পাল লিপি হইতে জানা যায় পাল রাজাদের আদিভূমি তাহাদের হস্তচ্যুত হইয়াছিল এবং প্রথম মহীপাল সেই সময় পিতৃরাজ্য পুনরুদ্ধার করিয়া ছিলেন। কাজেই এই অনুমান অসঙ্গত নহে যে আলোচ্য কম্বোজ বংশই পাল রাজাদের দুরবস্থার প্রধান কারণ এবং সম্ভবত দ্বিতীয় বিগ্রহপালের আমলে পাল রাজ্যের একাংশ তাহাদের হস্তচ্যুত হয়। মনে হয় তাম্রলিপ্তসহ সমগ্র দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গ অর্ধশতাব্দীরও বেশী সময় কম্বোজবংশীয় পাল নৃপতিদের অধিকার-ভুক্ত ছিল। রাজপাল, নারায়ণপাল ও নয়পাল এই তিনজনই ওই অঞ্চলে রাজত্ব করিয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ পালবংশীয় প্রথম মহীপাল যখন বঙ্গদেশ অভিযান করিতে ছিলেন সেই সময় দক্ষিণ ভারতে চোল সম্রাট রাজেন্দ্রচোল

গঙ্গাইকোণ্ডার তিরুমলৈ লিপি হইতে জানা যায় দণ্ডভুক্তি, দক্ষিণ রাঢ়, বঙ্গালদেশ ও উত্তর রাঢ় চোল সেনাপতির আনুগত্য স্বীকার করিয়াছিল এবং সেই সময় দণ্ডভুক্তি জনপদের (তাম্রলিপ্ত যাহার অন্তর্গত) রাজা ছিলেন ধর্মপাল। তিরুমলৈর লিপিতে এই নরপতিকে কম্বোজবংশীয় বলিয়া উল্লেখ করা হয় নাই। তাহা হইলেও তাহাকে এই বংশের বলিয়াই মনে হয়। কিভাবে দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গ হইতে কম্বোজের আধিপত্য চলিয়া গিয়াছিল সে কাহিনী একেবারেই জানা যায় না। তবে মহীপাল তাহার জীবদ্দশায় এই অঞ্চলটি অধিকার করিতে পারিয়াছিলেন কিনা সন্দেহ আছে। দক্ষিণরাঢ়ে মোটামুটিভাবে অজয় ও দামোদরের মধ্যবর্তী অঞ্চলে সে সময় শূর রাজবংশ রাজত্ব করিতেন। মনে হয় প্রতিবেশী শূর রাজাদের হাতে কম্বোজদের প্রাধান্য নষ্ট হইয়াছিল। তবে ইহার স্বপক্ষে কোন নির্দিষ্ট প্রমাণ নাই। মহীপালের রাজত্বকালে কলচুরি রাজ গাঙ্গেয়দেব তাহাকে পরাজিত করিয়া বারাণসী অধিকার করেন।[১৩]

মহীপালের রাজত্বকালে গজনীর সুলতান মামুদ বারবার ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছিলেন। এই আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার জন্য পাঞ্জাবের রাজারা যে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিয়া ছিলেন তাহাতে মহীপাল কোন সাহায্য প্রেরণ করেন নাই। এই জন্য কোন কোন ঐতিহাসিক তাহাকে দোষারোপ করিয়াছেন। মনে হয় এই সমালোচনা খুব যুক্তিসঙ্গত নয়। কারণ তিনি অভ্যন্তরীণ ও বহিঃশত্রুর আক্রমণের ফলে যে সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছিলেন তাহাতে তাহার পক্ষে বিশেষ কিছু করা সম্ভবপর ছিল না। অভ্যন্তরীণ ও বহিঃশত্রুর সহিত ক্রমাগত সংগ্রাম করা সত্বেও মহীপালকে দেবপালের পর শ্রেষ্ঠপাল সম্রাটরূপে স্থান দেওয়া যায়।

বহু আয়াসে ও অনেক বৎসর অবিরত সংগ্রামের পর মহীপাল শুধু পিতৃরাজ্য উদ্ধার করিয়াছিলেন তাহাই নহে বিলুপ্ত সাম্রাজ্যের বৃহৎ অংশ উদ্ধার করিয়া পালবংশের লুপ্ত গৌরব খানিকটা ফিরাইয়া আনিয়া ছিলেন। পুনঃরুদ্ধারের এই চেষ্টার মধ্যে বাঙালী আত্মগৌরব প্রতিষ্ঠার সুযোগ খুঁজিয়া পাইয়াছিল। সেইজন্য বাঙালীর লোক সংস্কৃতিতে মহীপাল আজও স্মরণীয় হইয়া আছেন।

পাল সাম্রাজ্যের ভাঙন

মহীপালের সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধারের চেষ্টা অনেকটা সার্থকতা লাভ করিয়াছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহা স্থায়ী হওয়া সম্ভব ছিল না। তাহার মৃত্যুর পরে পাল সাম্রাজ্য ধীরে ধীরে ভাঙ্গিয়া পড়িতে শুরু করিল।[১৪]

মহীপালের পুত্র নয়পাল সিংহাসনে আরোহণ করেন (১০৩৮-১০৫৫ খ্রীঃ) এবং অন্তত ১৫ বৎসর রাজত্ব করেন। তাহার রাজত্বের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইল কলচুরি রাজ গঙ্গাদেবের পুত্র কর্ণ অথবা লক্ষীকর্ণের সহিত যুদ্ধ। কর্ণ মগধ আক্রমণ করিয়া নয়পালকে পরাজিত করেন। তিনি সম্ভবতঃ পালদের রাজধানী অধিকার করেন নাই। তবে তিনি অনেক বৌদ্ধমঠ ও প্রতিষ্ঠান লুণ্ঠন করিয়া বহু মূল্যবান দ্রব্য লুণ্ঠন করিয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ আচার্য দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান (অতীশ) এই সময়ে মগধের নালন্দা বিহারে বাস করিতেন। তাহারই মধ্যস্থতায় শেষ পর্যন্ত দীর্ঘ যুদ্ধের অবসান হয়। কিন্তু এই শান্তি দীর্ঘস্থায়ী হয় নাই। নয়পালের পুত্র তৃতীয় বিগ্রহপালের (১০৫৫-১০৭০ খ্রীঃ) রাজত্বকালে কলচুরিরাজ পুনরায় বঙ্গদেশে অভিযান করেন। এই যুদ্ধে তিনি জয়লাভ করেন। বীরভূম জেলার এক শিলাস্তম্ভের উৎকীর্ণ লিপি অনুসারে তিনি পশ্চিমবঙ্গের অনেক অঞ্চল অধিকার করিয়াছিলেন। পরে অবশ্য তিনি তৃতীয় বিগ্রহপালের নিকট পরাজিত হন। তৃতীয় বিগ্রহপালের সহিত কলচুরি রাজ কর্ণের কন্যার (যৌবনশ্রী) বিবাহের মধ্য দিয়া উভয়পক্ষের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হয়।

এই সুদীর্ঘ যুদ্ধের ফলে পাল রাজশক্তি খুবই দুর্বল হইয়া পড়ে। ফলে বঙ্গদেশের নানা অঞ্চলে খণ্ড খণ্ড স্বাধীন রাজ্যের উদ্ভব হয়। মহামাণ্ডলিক ঈশ্বর ঘোষ চক্করিতে (সম্ভবত বর্ধমান জেলায়) রাজধানী স্থাপন করিয়া একটি স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। পূর্ববঙ্গের বিক্রমপুরের বর্মদেশীয় রাজাগণ ও কুমিল্লার পট্টিকেরায় আর একটি রাজ্য স্থাপিত হয়। পাল রাজাদের অভ্যন্তরীণ দুরবস্থার সময় কর্ণাটকের চালুক্য রাজগণ বঙ্গদেশ আক্রমণ করেন। চালুক্যরাজ সোমেশ্বরের পুত্র কুমার বিক্রমাদিত্য দিগ্বিজয়ে বাহির হইয়া গৌড় ও কামরূপ জয় করেন।

একাদশ শতকের মধ্যভাগে বঙ্গদেশে আর একটি বৈদেশিক অভিযান হইয়াছিল। ইহারই নায়ক ছিলেন উড়িষ্যার সোমবংশীয় রাজা মহাশিবগুপ্ত যযাতি। তাহার একটি দানপত্রে উল্লেখ আছে যে তিনি বহুদেশ জয় করিয়া গৌড় ও রাঢ় অঞ্চল অধিকার করিয়াছিলেন। এই দানপত্রে অনেক কাবিক্য উচ্ছ্বাস আছে। কাজেই ইহা হইতে তাহার অভিযানের প্রকৃতি সঠিকভাবে নির্ণয় করা কঠিন। তবে মনে হয় রাজেন্দ্রচোলের অভিযান ও পাল রাজাদের দুরবস্থার খবরে তিনি বঙ্গ অভিযানে উৎসাহিত হইয়াছিলেন। চোল অভিযানের ঠিক পরবর্তীকালে চালুক্যরাজের অভিযান হইয়াছিল। তাহার কিছুকাল

পরে উড়িষ্যারাজ্যের এই অভিযান। এই অভিযানের দৃষ্টান্ত অপর অভিযানকে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল ইহা মনে করিবার সঙ্গত কারণ আছে। উড়িষ্যার অপর একজন রাজা উদ্যোতকেশরী ও গৌড়ের সৈন্যদের পরাজিত করিয়াছিলেন বলিয়া দাবি করিয়াছিলেন। ইহাদের কাহারও সঠিক তারিখ জানা যায় নাই। তবে মনে হয় উভয় রাজাই একাদশ শতাব্দীতে রাজত্ব করিতেন। এই সমস্ত বৈদেশিক আক্রমণের যে সুদূরপ্রসারী ফল বঙ্গদেশের রাজনৈতিক জীবনে দেখা যায়, তাহা হইল চালুক্যদের আক্রমণের সময় সুদূর কর্ণাটক হইতে সেন নামক এক ক্ষত্রিয় পরিবার পশ্চিমবঙ্গের রাঢ় অঞ্চলে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।[১৫]

পশ্চিম ও দক্ষিণ দিক হইতে ক্রমাগত এই বৈদেশিক আক্রমণের ফলে পাল সাম্রাজ্যের ভিত্তি দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল। এই কারণে বিগ্রহপালের রাজত্বকালে পূর্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণ বঙ্গদেশ পালরাজ্যের হাতছাড়া হয়। একমাত্র মগধের পাল রাজশক্তি কোন মতে টিকিয়া থাকিলেও একাদশ শতকের মধ্যভাগে বিশাল পাল সাম্রাজ্য প্রায় ভাঙ্গিয়া পড়িল। মগধে তাহাদের রাজশক্তিও নামে মাত্র টিকিয়া রহিল।

পাল রাজাদের সাময়িক পুনরভ্যুত্থান

তৃতীয় বিগ্রহ পালের তিন পুত্র ছিল। দ্বিতীয় মহীপাল, দ্বিতীয় শূরপাল ও রামপাল। পিতার মৃত্যুর পর মহীপাল সিংহাসনে আরোহন করেন (১০৭০-১০৭৫ খ্রীঃ)। তিনি যখন রাজা হন তখন বঙ্গদেশের অভ্যন্তরীণ ও বহির্দেশীয় অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। নিজের পরিবারের মধ্যে নানা চক্রান্ত ও অধীনস্থ সামন্তরা অনেকে বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছিল। দুষ্ট লোকের কথায় বিশ্বাস করিয়া রাজা তাহার দুই ভ্রাতাকে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছেন সন্দেহে কারারুদ্ধ করেন। কিন্তু ইহাতে প্রাণ অথবা রাজত্ব কোনটাই রক্ষা পাইল না। শীঘ্রই বরেন্দ্রের সামন্ত রাজ প্রকাশ্যে রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিলেন। মহীপালের সৈন্য যথেষ্ট পরিমাণে ছিল না সত্য তথাপি তিনি মন্ত্রীদের কথা অগ্রাহ্য করিয়া বিদ্রোহ দমন করিতে নিজেই অগ্রসর হইলেন। বিদ্রোহী কৈবর্ত নায়ক দিব্য সমগ্র বরেন্দ্রভূমি অধিকার করিয়া লইলেন।

সমসাময়িককালে সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিত' কাব্যে এই বিদ্রোহ ও তাহার পরবর্তীকালের ঘটনা সবিস্তারে বর্ণিত আছে। বঙ্গের ইতিহাসে এই গ্রন্থ অমূল্য সম্পদ। কারণ প্রাচীন বঙ্গের আর কোন গ্রন্থে

রাজনৈতিক ঘটনার বিস্তৃত তথ্য পাওয়া যায় না। রামপালের পুত্র মদন পালের বিশেষ অনুগ্রহ ভাজন ছিলেন সন্ধ্যাকর নন্দী। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই কাব্যের প্রকৃত অর্থ গ্রহণ করা খুবই কষ্টসাধ্য। কারণ কাব্যখানি রচিত হইয়াছে দ্ব্যর্থবোধক ভাষায়। ইহার প্রতিটি শ্লোকের দুইটি অর্থ আছে। এক অর্থে কাব্যখানি রামায়ণের রামচন্দ্রের আখ্যান অন্য অর্থে পাল রাজাদের প্রধান রামপালের ইতিহাস। রামচরিত কাব্যে মহীপালকে নিষ্ঠুর ও দুর্নীতিপরায়ণ বলিয়া কটূক্তি করা হইয়াছে। মহীপালের প্রকৃতি, চরিত্র এবং রাষ্ট্রবুদ্ধি সম্বন্ধে এই কাব্যে নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া কঠিন, তবে তিনি যে দুর্বল ও রাষ্ট্রবুদ্ধিহীন ছিলেন ঘটনা বিয়োগান্ত পরিণতি অবশ্য তাহার প্রমাণ।

দিব্য সম্বন্ধে ও সন্ধ্যাকরের সাক্ষ্য কতখানি গ্রহণযোগ্য তাহা বলা শক্ত। রামচরিত পাঠে মনে হয় দিব্য ছিলেন একজন নায়ক এবং পাল রাজাদের একজন কর্মচারী। কি কারণে তিনি বিদ্রোহী হইয়াছিলেন এবং তাহার সঙ্গে অন্য কোন সামন্ত নায়ক যোগ দিয়াছিলেন কিনা রামচরিত গ্রন্থে তাহার কোন উল্লেখ নাই। লেখক তাহাকে 'দস্যু' ও 'উপাধি ব্রতী' (ছলাকলার অজুহাতে অন্যায় কৌশলে যে কার্যোদ্ধার করে) বলিয়াছেন। মনে হয় দিব্য পাল রাজাদের অন্যতম রাষ্ট্রনায়ক ছিলেন এবং তাহাদের দুর্বলতা ও ভ্রাতৃ বিরোধের সুযোগে তিনি বিদ্রোহী হইয়াছিলেন। তিনি প্রজাবিদ্রোহের নায়কত্ব করিয়াছিলেন, এমন কোন কথা রামচরিতে উল্লেখ নাই। কিছুদিন পর্যন্ত বঙ্গের এক শ্রেণীর লোক বিশ্বাস করিতেন যে দিব্য অত্যাচারী মহীপালকে হত্যা করিয়া দেশকে রক্ষা করিয়াছিলেন। এই জন্য উত্তরবঙ্গের নানাস্থানে প্রতিবৎসর 'দিব্যস্মৃতি' উৎসবের আয়োজন করা হয়। রামচরিত গ্রন্থে ইহারও কোন উল্লেখ নাই।

মহীপাল নিহত হইলে দিব্য বরেন্দ্রভূমিতে যে অধিকার লাভ করিয়াছিলেন তাহা তিনি নিরাপদে ভোগ করিতে পারেন নাই। পূর্ববঙ্গের বর্ম দেশীয় রাজা জাতবর্মা তাহাকে পরাজিত করেন। মহীপালের ভ্রাতা রামপাল তাহার সময় বরেন্দ্র উদ্ধার করিতে সফলকাম হন নাই। দিব্যের মৃত্যুর পর তাহার ভ্রাতা রুদোক এবং তৎপরে তাহার পুত্র ভীম বরেন্দ্রের সিংহাসনে আরোহন করেন। রামচরিতে ভীমের প্রশংসা পাওয়া যায় এবং ইহাতে তাহার শক্তি ও সমৃদ্ধির উল্লেখও পাওয়া যায়।

মহীপালের দুই কারারুদ্ধ ভ্রাতা তাহার মৃত্যুর পর কিভাবে উদ্ধার পাইয়াছিলেন রামচরিতে তাহার কোন উল্লেখ নাই। যেভাবেই হোক কারাগার হইতে মুক্ত হইবার পর এই দুই ভ্রাতা সম্ভবতঃ মগধে আশ্রয় গ্রহণ করেন, এবং শূরপাল

মগধের সিংহাসনে আরোহন করেন। তাহার রাজত্বকালের বিবরণ জানা যায় না। সম্ভবতঃ তিনি অল্পকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন এবং তাহার পর রামপাল মগধের রাজা হন।[১৬]

রামপাল (১০৭৭-১১২০ খ্রীঃ)

রামপাল রাজা হইয়া বরেন্দ্র উদ্ধারের চেষ্টা শুরু করিলেন। কিন্তু বিফল-মনোরথ হইয়া বহুদিন চুপচাপ ছিলেন। তাহার পর তিনি এক গুরুতর বিপদের সম্মুখীন হন। সেই সময় পুত্র ও অমাত্যদের সহিত পরামর্শ করিয়া বিপুল উদ্যমে কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। এই গুরুতর বিপদ যে কি রামচরিতের লেখক সে বিষয়ে কিছু উল্লেখ করেন নাই। সম্ভবতঃ দিব্যকর্তৃক আক্রমণের আশঙ্কা এই বিপদের কারণ ছিল। রামপাল শঙ্কিত হইয়া প্রতিবেশী রাজাদের এবং পালরাষ্ট্রের অতীত ও বর্তমান স্বাধীন ও স্বতন্ত্র সামন্তদের দ্বারে দ্বারে সাহায্য প্রার্থনা করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইয়াছিলেন। তাঁহার এই প্রচেষ্টা সফল হইয়াছিল। অর্থ ও সম্পত্তির প্রলোভনে অনেকে তাহাকে সাহায্য করিতে স্বীকৃত হইয়াছিল। বহুদিনের চেষ্টায় রামপাল এক বিপুল সৈন্য সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইলেন।

রামপালের প্রধান সহায়ক ছিলেন তাঁহার মাতুল রাষ্ট্রকুলতিলক মথন্। ইনি তাহার দুই পুত্র কাহ্নদেব ও সুবর্ণদেব এবং ভ্রাতুষ্পুত্র মহাপ্রতীহার শিবরাজ প্রভৃতিকে সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিলেন। অপর যে সব রাজা রামপালকে সৈন্য দ্বারা সাহায্য করিয়াছিলেন তাহাদের চৌদ্দজনের নাম রামচরিতে পাওয়া যায়। এই রাজাগণের তালিকা বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার বহু সামন্ত রাজা তাহাকে সাহায্য করিতে আগাইয়া আসিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে একজন হইলেন উল্লেখযোগ্য। তিনি হইলেন দণ্ডভুক্তির জয়সিং। রামচরিত মানসে উল্লেখ আছে যে রাজা জয়সিং উৎকলাধিপতি সোম বংশীয় কর্ণকেশরীকে পরাজিত করিয়াছিলেন। মনে হয় কৈবর্তরাজ ভীমের বিরুদ্ধে যুদ্ধের পূর্বে রামপাল উৎকল বিজয় করিয়াছিলেন। সেই সময় জয়সিং তাহাকে প্রয়োজনীয় সাহায্য দিয়াছিলেন। ইহা মনে করিবার কারণ হইল পূর্ববঙ্গ দেশীয় অনন্তবর্মা চোড়গঙ্গ (১০৭৬-১১৪৭ খ্রীঃ) যখন উত্তরদিকে উৎকল জয়ের জন্য অভিযান করিয়াছিলেন তাহাকে প্রতিহত করিবার জন্য রামপালের জয়সিংহকে একান্ত প্রয়োজন ছিল। অপরপক্ষে যে সমস্ত রাজার নাম পাওয়া যায় তাহার মধ্যে দেবগ্রামের রাজা বিক্রমরাজের নাম উল্লেখযোগ্য। এই অঞ্চলটি সম্ভবত মেদিনীপুরের দক্ষিণ-পশ্চিম বলিয়া মনে হয়। অপর একজন রাজা ছিলেন

অরণ্য প্রদেশস্থ মান্দারের অধিপতি লক্ষীশূর। এই অঞ্চলটি সম্ভবতঃ বর্তমানে হুগলী জেলার গড়মান্দারের পশ্চিমাংশ।

রামপাল সম্ভবতঃ দক্ষিণবঙ্গ হইতে বরেন্দ্র আক্রমণ করেন। এই আক্রমণের এবং যুদ্ধের বিস্তৃত বিবরণ রামচরিত গ্রন্থে পাওয়া যায়। এই যুদ্ধে রাজা ভীম পরাজিত হন। ফলে বহুদিন পরে রামপাল পিতৃভূমি বরেন্দ্র অধিকার করিতে সমর্থ হন। তিনি রামাবতী নামক নূতন স্থানে রাজধানী স্থাপন করিলেন। ইহা সম্ভবতঃ মালদহের নিকটবর্তী কোন স্থান ছিল। পিতৃভূমিতে স্বীয় অধিকার স্থাপিত হইলে রামপাল নিকটবর্তী রাজ্যসমূহ জয় করিয়া পাল সাম্রাজ্যের লুপ্ত গৌরব পুনরায় উদ্ধার করিতে যত্নবান হইলেন।

বিক্রমপুরের বর্মরাজ সম্ভবতঃ বিনাযুদ্ধে রামপালের বশ্যতা স্বীকার করেন। এইরূপে এক যুদ্ধের পর কামরূপও তাহার অধীনতা স্বীকার করিল। রামপাল এইবার পূর্ব সীমান্ত জয় করিয়া দক্ষিণদিকে অগ্রসর হইলেন। রাঢ়দেশের সামন্তবর্গ সকলেই রামপালের অধীনতা স্বীকার করিয়াছিলেন। তাহাদের সাহায্যে তিনি উড়িষ্যা জয় করিতে সক্ষম হইলেন এবং কলিঙ্গ পর্যন্ত নিজরাজ্য ভুক্ত করিয়াছিলেন। এই সময়ে উড়িষ্যার রাজনৈতিক অবস্থা বিশেষ শোচনীয় ছিল। দক্ষিণ হইতে গঙ্গ রাজগণ পুনঃপুনঃ আক্রমণ করিয়া উৎকল অধিকার করিয়া লইলেন। গঙ্গরাজগণ উৎকল অধিকার করিলে বঙ্গদেশের সমূহ বিপদ এই আশঙ্কায় রামপাল সম্ভবতঃ নিজের মনোনীত ব্যক্তিকে উৎকলের সিংহাসনে স্থাপন করিলেন। ঠিক একই কারণে অনন্তবর্মা চোড়গঙ্গ রাজ্যচ্যুত উৎকল রাজকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইলেন। ফলে এই দুই প্রতিদ্বন্দ্বী রাজার রক্ষকরূপে উৎকল অধিকার লইয়া রামপাল ও অনন্তবর্মার মধ্যে দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধের সূচনা হইয়াছিল।

একটি লিপি অনুসারে গঙ্গরাজ রাজা দেবেন্দ্রবর্মা একহাজার পঁচাত্তর খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে কোন সময় উড়িষ্যা অধিকার করেন। কিন্তু তাহার এই অধিকার কার্যকর হয় নাই ইহার প্রমাণ হইল তাহার পুত্র বিখ্যাত অনন্তবর্মা (১১৭৬-১১৪৭ খ্রীঃ) উৎকলের বিতাড়িত রাজাকে ১১১২ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে কোন সময়ে আশ্রয় দিয়াছিলেন। বিভিন্ন সময়ে তাম্রলিপি হইতে অনুমান করা যায় যে পূর্ব গঙ্গদেশীয় রাজাদের প্রভাব উৎকলে ১১৩৫ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে তেমন দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। তিনি সম্ভবতঃ উড়িষ্যার দুই-তৃতীয়াংশ অধিকার করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। এই ঘটনার কিছুকাল পরে তিনি সম্ভবতঃ তাহার রাজধানী কটকে স্থানান্তর করেন।

এইভাবে পূর্বগঙ্গ দেশীয় রাজাগণ যখন দক্ষিণ দিক হইতে উড়িষ্যার বিস্তীর্ণ অঞ্চলের উপর অধিকার বিস্তার করিতেছিলেন তখন এই দেশের উত্তরাঞ্চল নূতন এক আক্রমণের সম্মুখীন হয়। এই আক্রমণের সংবাদও রামচরিত মানসে দেখিতে পাওয়া যায়। এই আক্রমণের ফলে পূর্বে উল্লিখিত দণ্ডভুক্তির রাজা জয়সিংহের হাতে উৎকল রাজ কর্ণকেশরীর পরাজয় ঘটে, এই অবস্থায় উৎকল রাজনীতিতে রামপালের অনুপ্রবেশ ঘটিয়াছিল। দুই বৃহৎ শক্তির রাজনৈতিক দাবাখেলার ক্ষেত্র হিসাবে উৎকল পর্যবসিত হইয়াছিল। রামপালের প্রতিনিধি হিসাবে যিনি উৎকলের সিংহাসনে বসিয়া ছিলেন তিনি হইলেন সোমবাসী কেশরীরাজ। মনে হয় একই কেশরীরাজই ১০৭৫ খ্রীঃ রাজা দেবেন্দ্র কর্তৃক সিংহাসনচ্যুত হইয়াছিলেন এবং তাহার জায়গায় দেবেন্দ্রবর্মনের প্রতিনিধিকে সিংহাসনে বসান হইয়াছিল। দেবেন্দ্রবর্মনের সেই প্রতিনিধি অথবা তাহার কোন এক উত্তরাধিকারীকে পরাজিত করিয়া রামপাল কেশরীরাজকে পুনরায় সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। ১১১২ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি কোন এক সময়ে অনন্তবর্মা রামপালের প্রতিনিধিকে পুনরায় সিংহাসন হইতে অপসারিত করিয়া তাহার পিতা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত কোন একজনকে উৎকলের সিংহাসনে বসান।

১১৩৫ খ্রীষ্টাব্দে চিহ্নিত "শ্রীকূরমাম" লিপিতে বলা হইয়াছে যে অনন্তবর্মা চোড়গঙ্গ গঙ্গানদী পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চল অধিকার করিয়াছিলেন এবং তিনি সেই সময়ে পূর্ব, পশ্চিম ও উত্তরদিকে বিভিন্ন দেশ জয় করিয়া রাজধানীতে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। তিনি একদিকে গোদাবরী ও অন্যদিকে গঙ্গা এই উভয় নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। অনন্তবর্মা চোড়গঙ্গ নরসিংহ দ্বিতীয় ও নরসিংহ চতুর্থ বিভিন্ন লিপিতে অনন্তবর্মার রাজত্বের পরিধি দক্ষিণে গোদাবরী, উত্তরে মেদিনীপুর, পূর্বে বঙ্গোপসাগর ও পশ্চিমে পূর্বঘাট পর্বতমালা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল উল্লেখ আছে। কিন্তু পাটনা লিপিতে উল্লেখ আছে চোড়গঙ্গ মান্দার রাজধানী ধ্বংস করিয়াছিলেন এবং গঙ্গাতীরস্থ অঞ্চলে যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন। উড়িষ্যাকে কেন্দ্র করিয়া দুই বৃহত্তর শক্তির (পাল ও পূর্বগঙ্গর রাজাগণ) মধ্যে দীর্ঘকাল যুদ্ধ চলিয়াছিল। মনে হয় রামপালের মৃত্যুর পর গঙ্গরাজ উড়িষ্যা সম্পূর্ণ দখল করিয়া নিজেদের রাজ্যে সম্পূর্ণ অন্তর্গত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। রামচরিতে উল্লেখ আছে রামপাল "নিশাচরদের" ধ্বংস করিয়া কলিঙ্গ রাজ্য রক্ষা করিয়াছিলেন। মনে হয় তিনি 'নিশাচর' শব্দে চোড়গঙ্গদের বুঝাইয়াছেন। নিঃসন্দেহে রামপাল দক্ষিণ দিকে গঙ্গরাজদের রাজ্য বিস্তার ব্যাহত করিয়াছিলেন। দক্ষিণ ভারতের চোলরাজ

কুলুটুঙ্গা (১০৭০-১১১৮ খ্রীঃ) গঙ্গরাজ্য আক্রমণ করেন এবং একাদশ শতকের শেষ দিকে অথবা দ্বাদশ শতকের প্রথমদিকে চোলরা কলিঙ্গরাজ্যের উত্তরাংশে অনুপ্রবেশ করিতে সক্ষম হয়। কুলুটুঙ্গার এই অভিযানের বিবরণ বিস্তারিতভাবে তামিল গ্রন্থ 'কলিঙ্গটুপ্পারানিতে' (Kalinga Tupparani) লিপিবদ্ধ আছে। এই বিবরণ অনুসারে রাজা কুলুটুঙ্গার কোন এক সেনানায়ক কলিঙ্গ রাজকে ধ্বংস করিয়া গঙ্গরাজকে পরাজিত করেন এবং উড়িষ্যা রাজ্যের সীমান্ত পর্যন্ত অধিকার করিতে সক্ষম হন। এই ঘটনা সম্ভবতঃ ১০৯৬ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে কোন এক সময় ঘটিয়াছিল।

রামপাল চোলদের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিয়াছিলেন কিনা জানা যায় নাই। তামিল পুস্তকের লেখক অনেক রাজাদের নাম উল্লেখ করিয়াছেন যাহারা চোলরাজ কুলুটুঙ্গার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই তালিকায় বঙ্গ, বঙ্গাল ও মগধের উল্লেখ আছে। কুলুটুঙ্গা নিজেকে কাবেরী ও গঙ্গার মধ্যবর্তী অঞ্চলের অধিপতি বলিয়া দাবি করিতেন। এই সাধারণ দাবির মধ্যে কোন ঐতিহাসিক সত্য আছে কিনা তাহা বলা শক্ত। তবে মনে হয় রামপাল হয়ত চোলরাজার সহিত সদ্ভাব রক্ষার জন্য বিশেষত সীমান্তে শান্তি বজায় রাখার উদ্দেশ্যে তাহার প্রতি মৌখিক আনুগত্য প্রকাশ করিলেও করিতে পারেন। কারণ এই সময় চোলরাজারা একদিকে পূর্বগঙ্গ রাজাদের বিরুদ্ধে এবং অন্যদিকে চালুক্য রাজাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইয়া যাইতেছিলেন এবং যেহেতু রামপালের রাজ্য এই উভয় শক্তির দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছিল সেই হেতু রামপালের পক্ষে চোলদের সাহায্য প্রার্থনা অসম্ভব নয়।

এই সময়ে কর্ণাটকের লুব্ধ দৃষ্টি বঙ্গদেশের উপর পড়ে। কর্ণাটকের রাজা ছিলেন তখন চালুক্যরাজ বিক্রমাদিত্য। চালুক্যরাজ পূর্বে একবার বঙ্গদেশ আক্রমণ করিয়াছিলেন এবং এই সময়ে আবার তাহারা বঙ্গ জয়ের জন্য উৎসাহিত হইলেন। এই ঘটনা রামচরিত কাব্যে 'অধরিত কর্ণাটেক্ষনলীলায়' বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে। এই ঘটনা হইতে অনেকে অনুমান করেন যে কর্ণাটকের রাজারা বারবার বঙ্গদেশ জয় করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু রামপাল তাহাদিগকে প্রতিহত করিয়াছিলেন। চালুক্য রাজাদের একজন সামন্ত রাজা "আচা" (Acha) একাদশ শতকের শেষদিকে এবং দ্বাদশ শতকের প্রথমদিকে বঙ্গদেশ অভিযান করেন। কিন্তু ইহা অপেক্ষা আরও গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ঘটনা হইল পালরাজাদের সীমান্তে দুইটি কর্ণাট বংশের প্রতিষ্ঠা। ইহাদের একটি হইল পশ্চিমবঙ্গের সেনবংশ এবং আর একটি হইল মিথিলা বা উত্তর

বিহারে নান্যদেব কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত রাজবংশ। আপাতত রামপালের দ্বারা সেনরা প্রতিহত হইলেও পরবর্তীকালে ইহারা বঙ্গদেশের পালবংশ ধ্বংস করিয়াছিলেন। মিথিলার নান্যদেবের সঙ্গে রামপালের সংঘর্ষ হইলে তিনি গৌড়রাজাদের ক্ষমতা খর্ব করিয়াছেন বলিয়া দাবি করিয়াছেন। মনে হয় রামপালের রাজত্বকালে মিথিলার অধিকার পালরাজাদের হস্তচ্যুত হয়।

কাশীর কান্যকুব্জের অধিপতি পরাক্রান্ত গাহড়বাল রাজাদের সঙ্গেও পাল রাজাদের যুদ্ধ হইয়াছিল। এই বংশীয় গোবিন্দচন্দ্রের পুত্র মদনপালের সঙ্গে গৌড় সৈন্যদের সংগ্রামের খবর কয়েকটি লিপিতে পাওয়া যায়। এই যুদ্ধে মদনপাল জয়লাভ করিয়াছেন কিনা তাহা জানা যায় না। রামচরিতে উল্লেখ আছে যে বঙ্গদেশের রাজারা তাঁহাদের আক্রমণ সংহত করিয়াছিলেন।

রামপাল বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন মনে হয়। তিনি কীর্তিমান পুরুষ ছিলেন সন্দেহ নাই। নির্বাসনে জীবন আরম্ভ করিয়া বিদ্রোহীদের হাত হইতে পিতৃভূমি অধিকার,বঙ্গদেশের অধিকাংশ অঞ্চল পুনরুদ্ধার,উড়িষ্যা ও কামরূপে আধিপত্য বিস্তার এবং একাধিক বহিঃশত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া ও পালরাজত্ব ও রাষ্ট্রের সীমা এবং আধিপত্য মৃত্যু পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ রাখা তাহার অদম্য শৌর্য-বীর্যের ও দূরদর্শী রাষ্ট্রনীতি জ্ঞানের পরিচায়ক একথা স্বীকার করিতেই হইবে। তিনি বাহুবলে খণ্ড-বিখণ্ড বঙ্গদেশকে পুনরায় ঐক্যবদ্ধ ও সুদৃঢ় করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। বাঙালী আবার রাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখিল। রামপালের রাজত্বকালে পালবংশের কীর্তিশিখা নির্বাপিত হইবার পূর্বে শেষবারের মত উজ্জল হইয়া উঠিল। তাহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে পালরাজাদের গৌরবরবি অস্তমিত হইল।[১৭]

পাল সাম্রাজ্যের পতন

রামপালের মৃত্যুর পর তাহার পুত্র কুমারপাল (১১২০-১১৩০ খ্রীঃ) রাজা হন। রামচরিতে বলা হইয়াছে রামপালের দুই পুত্র বৃত্তপাল ও রাজ্যপাল বরেন্দ্রের বিদ্রোহ দমনে পিতাকে সাহায্য করিয়াছিলেন। রামপালের অপর এক পুত্র মদনপাল রাজা হইয়া ছিলেন। রামপালের এই চারি পুত্রের মধ্যে কে বড় ছিলেন এবং কোন অধিকারে কুমারপাল সিংহাসনে বসিয়াছিলেন সঠিক কিছু জানা যায় না।

কুমারপালের রাজত্বকালে দক্ষিণবঙ্গে বিদ্রোহ হইয়াছিল এবং তাহার প্রধান অমাত্য নৌযুদ্ধে বিদ্রোহীদের পরাজিত করিয়াছিলেন। ইহার কিছুদিন পরে পালরাজ্যের পূর্বদিকে সম্ভবতঃ বিদ্রোহ হইয়াছিল। পালরাজ্যের এই অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহের সময় সম্ভবতঃ পূর্ববঙ্গের বর্মরাজাগণ স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। এই সুযোগে গঙ্গরাজগণ পাল রাজ্য আক্রমণ করেন।

কুমারপালের পর তাহার পুত্র তৃতীয় গোপাল রাজা হন (১১৩০-১১৪৪ খ্রীঃ)। তাহার রাজত্বকালের ঘটনা বিশেষ কিছু জানা যায় নাই। তবে মনে হয় এই সময় সম্ভবতঃ ১১৩৫ খ্রীঃ পূর্বে অনন্তবর্মা চোড়গঙ্গ মেদিনীপুর ও হুগলী জেলার দিকে অগ্রসর হইয়া গঙ্গাতীরবর্তী মন্দার প্রদেশ পর্যন্ত জয় করেন। তিনি যে "মিধুনপুর" ও "আরম্য"দুর্গ অধিকার করেন তাহা সম্ভবতঃ আধুনিক মেদিনীপুর ও আরামবাগ। দাক্ষিণাত্যের চালুক্য রাজগণও পশ্চিমবঙ্গ আক্রমণ করেন। ইহার ফলে রাঢ় দেশের সেন রাজবংশ প্রবল হইয়া ওঠে। গাহড়বাল রাজগণ মগধ আক্রমণ করিয়া পাটনা অধিকার করে। রাজশাহী জেলার প্রাপ্ত একটি শিলালিপি হইতে কেহ কেহ অনুমান করেন যে কুমারপাল এই অঞ্চলে একটি যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করেন। তিনি সম্ভবতঃ খুব অল্পবয়সে রাজা হইয়াছিলেন।

তৃতীয় গোপালের মৃত্যুর পর মদনপাল সিংহাসনে আরোহন করেন। বিখ্যাত পাল রাজবংশের তিনিই সর্বশেষ রাজা (১১৪৪-১১৫৫ খ্রীঃ)। এই সময় অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ ও বহিঃশত্রুর আক্রমণে পাল রাজবংশ দ্রুতবেগে ধ্বংস হয়। মদনপাল যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও রাজ্য রক্ষা করিতে পারেন নাই। শত্রু রাজা (সম্ভবতঃ সেনরাজ বিজয় সেন) গৌড়দেশের একাংশ জয় করিয়া পালরাজধানী পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন। তাহার শিলালিপি হইতে জানা যায় তিনি গৌড়রাজাকে বিতাড়িত করিয়াছিলেন। এই পরাজিত গৌড়রাজ যে মদনপাল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তিনি অন্তত ১৮ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন এবং মৃত্যু পর্যন্ত গৌড় অথবা গৌড়ের একাংশ তাহার রাজ্যভুক্ত ছিল। তাহার রাজত্বের বিস্তারিত বিবরণ তেমন জানা যায় না। তবে মনে হয় তাহার মৃত্যুকালে দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গে তাহার কোন অধিকার ছিল না। এই সময় পাল রাজ্য শুধু মধ্য ও পূর্বমগধের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল।

এই সময় গোবিন্দপাল নামক একজন রাজা গয়ায় রাজত্ব করিতেন, ইহারও, 'পরমেশ্বর পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ' এবং গৌড়েশ্বর উপাধি ছিল। মনে হয় মদনপালের রাজত্বের শেষভাগে তিনি গয়ায় একটি স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। এই রাজত্ব অবশ্য দীর্ঘস্থায়ী হয় নাই। তিনি পালবংশীয় ছিলেন কিনা তাহাও নিশ্চিত করিয়া বলা যায় না। তাহার নাম, উপাধি বৌদ্ধধর্ম ও মদনপালের সময়কালে মগধের রাজত্বের কথা বিবেচনা করিলে তিনি পালবংশীয় রাজা বলিয়া অনুমান করা সঙ্গত। তাহার রাজ্য বিনষ্ট হইবার সঙ্গে সঙ্গে দেবপাল, মহীপাল ও রামপালের স্মৃতি বিজড়িত পালরাজ্যের শেষ চিহ্ন বিলুপ্ত হইয়া যায়।

চারিশত বৎসরের সযত্নে লালিত বাঙালীর গৌরব পাল সাম্রাজ্য এইভাবে

ধীরে ধীরে অবলুপ্ত হইয়া পড়িল। ধর্মপাল ও দেবপাল যে সাম্রাজ্য গড়িয়া তুলিয়া ছিলেন মহীপাল যাহাকে ধ্বংসের মুখ হইতে বাঁচাইয়াছিলেন, রামপাল যাহাকে শেষবারের মত আত্মপ্রত্যয় ও প্রতিষ্ঠা ফিরাইয়া দিয়াছিলেন তাহার শেষরক্ষা আর হইল না। ঘরে ও বাহিরে স্থানীয় আত্মসচেতন একান্ত ব্যক্তিগত রাষ্ট্রবুদ্ধি উৎকট হইয়া দেখা দিল। তাহাকে প্রতিহত করিবার শক্তি ও বুদ্ধি লইয়া আর কোন পাল রাজা সিংহাসনে আরোহণ করিলেন না।[১৮]

সূত্র নির্দেশ

১। রমেশচন্দ্র মুজমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস। (প্রথম খণ্ড) পৃঃ ৪০

২। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, বাঙ্গালার ইতিহাস (প্রথম খণ্ড), ১৯১৭, পৃঃ ১২৫-১২৬

৩। History of Bengal, Vol. 1, pp. 96-103

৪। মুজমদার, পূর্বে উল্লিখিত, পৃঃ ৪২-৪৫

৫। History of Bengal, op. cit., pp. 113-117

৬। মজুমদার, পূর্বে উল্লিখিত, পৃঃ ৪৮-৫০

৭। মজুমদার পূর্বে উল্লিখিত, পৃঃ ৫০-৫১

৮। History of Bengal, op. cit., pp. 125-130

৯। মজুমদার, পূর্বে উল্লিখিত, পৃঃ ৫৭

১০। মজুমদার, পূর্বে উল্লিখিত, পৃঃ ৬০-৬১

১১। কল্যাণকুমার দাসগুপ্ত, ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে তাম্রলিপ্ত, "রাজনৈতিক ইতিহাসে প্রাচীন তাম্রলিপ্ত", পৃঃ ১২১-১২২

১২। History of Bengal, op. cit., pp. 136-7
মজুমদার, পূর্বে উল্লিখিত, পৃঃ ২৬৮-৭০

১৩। দাসগুপ্ত, পূর্বে উল্লিখিত, পৃঃ ১২২-১২৮

১৪। নীহাররঞ্জন রায়, বাঙালীর ইতিহাস, (প্রঃ খ), পৃঃ ৫০৯-৫১২

১৫। History of Bengal, op. cit., pp. 144-148
মজুমদার, পূর্বে উল্লিখিত পৃঃ ৭২-৭৩

১৬। History of Bengal, op. cit., pp. 149-154
মজুমদার, পূর্বে উল্লিখিত পৃঃ ৭৬-৮২
রায় ,, ,, পৃঃ ৫১৩-৫১৮

১৭। History of Bengal, Ibid, pp. 155-166
মজুমদার, পূর্বে উল্লিখিত, পৃঃ ৭৬-৮২
রায় " " পৃঃ ৫১৫-৫১৮
বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বাঙ্গালার ইতিহাস', পৃঃ ২১৫-২৩৯
যোগেশচন্দ্র বসু, মেদিনীপুরের ইতিহাস, পৃঃ ৯০-৯১
Sahu, Mishra, Sahu, History of Orissa, pp. 198-202
An Advance History of India, pp. 158-160

১৮। History of Bengal, Ibid, pp. 167-172
মজুমদার, পূর্বে উল্লিখিত, পৃঃ ৮৩-৮২
রায় " " পৃঃ ৫১৯-৫২০

পঞ্চম অধ্যায়

সেন যুগ

পাল রাজাদের পরে যে রাজবংশ বঙ্গদেশ শাসন করেন তাহার নাম সেন রাজবংশ। তাহাদের পূর্বপুরুষ দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত কর্ণাটকের অধিবাসী ছিলেন। বর্তমান মহারাষ্ট্র ও হায়দ্রাবাদের দক্ষিণাঞ্চল ও মহীশূর রাজ্যের উত্তর ও পশ্চিমভাগ প্রাচীন কর্ণাটক দেশের অন্তর্গত ছিল। সেন রাজাদের দেওপাড়া লিপি ও অন্যান্য লিপি অনুসারে মনে হয় তাহারা চন্দ্রবংশীয় এবং ব্রহ্ম-ক্ষত্রিয় ছিলেন। বঙ্গদেশের প্রাচীন কুলজী-গ্রন্থে তাহাদিগকে বৈদ্যজাতীয় বলা হইয়াছে। সেন রাজারা কোন্ সময়ে বঙ্গদেশে প্রথম বসতি স্থাপন করেন সে সম্বন্ধে তাহাদের নিজস্ব লিপিতে যে দুইটি বিবরণ আছে তাহা আপাত-বিরোধী মনে হয়। বিজয়সেনের দেওপাড়া লিপিতে বলা হইয়াছে যে সামন্তসেন রামেশ্বর সেতুবন্ধ পর্যন্ত বহু যুদ্ধ করিয়া কর্ণাটকের শত্রুকে ধ্বংস করিয়া বৃদ্ধ বয়সে গঙ্গাতীরে পুণ্য জীবনযাপন করিবার জন্য নিভৃত আশ্রমে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। ইহা হইতে স্বাভাবিক কারণে মনে হয় সামন্তসেনই প্রথম কর্ণাটক হইতে বঙ্গদেশে আসিয়া গঙ্গাতীরে বসবাস আরম্ভ করেন। কিন্তু বল্লাল সেনের নৈহাটি তাম্রশাসনে বলা হইয়াছে যে চন্দ্রবংশ জাত অনেক রাজপুত্র রাঢ় অলঙ্কারস্বরূপ ছিলেন এবং তাহাদেরই বংশে সামন্তসেন জন্মগ্রহণ করেন। অর্থাৎ এই লিপিতে সামন্ত সেনের পূর্বপুরুষগণ বঙ্গদেশে আসিয়াছিলেন বলা হইয়াছে। এই দুই উক্তির মধ্যে সামঞ্জস্য সাধন করিতে হইলে বলিতে হয় যে কর্ণাটকের এক সেনবংশ বহুদিন যাবৎ রাঢ় দেশে বাস করিতে ছিলেন। কিন্তু তাহারা আদি মাতৃভূমি কর্ণাটক দেশের সহিত সম্পর্ক বজায় রাখিয়াছিলেন। এই বংশের সামন্তসেন যৌবনে কর্ণাটক দেশে বহুযুদ্ধে নিজের শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়াছিলেন এবং সম্ভবতঃ তাহার পুত্র হেমন্তসেন রাঢ় দেশে একটি স্বাধীন রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

কিভাবে সুদূর কর্ণাটক হইতে বিদেশী সেনগণ বঙ্গদেশে আসিয়া রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন তাহা এখনও সঠিকভাবে নির্ণয় করা সম্ভব হয় নাই। কেহ কেহ অনুমান করেন যে তাহারা পাল রাজাদের অধীন সৈন্যাধ্যক্ষ বা উচ্চ কোন রাজপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, পরে পাল রাজাগণের দুর্বলতার সুযোগে

তাহারা স্বাধীন রাজ্যগঠনে সক্ষম হন। এই অনুমানের স্বপক্ষে বলা যায় পাল রাজাগণের তাম্রশাসনে কর্মচারীদের নামের যে তালিকা আছে তাহার মধ্যে "গৌড়-মালব-খশ-হূণ-কুলিক-কর্ণাটক-লাট-চাট-ভাট" প্রভৃতি পদের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ পাল রাজবংশ হূণ ও খশ প্রভৃতির ন্যায় কর্ণাটকগণকেও সৈন্যদলে নিযুক্ত করিতেন এবং তাহাদের মধ্যেই সেন বংশীয় কোন নায়ক এক সুযোগে পশ্চিমবঙ্গে ক্ষুদ্র রাজ্যের অধিপতি হইয়াছিলেন। কেহ কেহ আবার অনুমান করেন যে কর্ণাটক দেশীয় কোন সেন রাজাদের পূর্বপুরুষ কোন আক্রমণকারী রাজার সহিত দাক্ষিণাত্য হইতে বঙ্গদেশে আসিয়াছিলেন। তাহাদেরই কেহ প্রথমে শাসনকর্তা পরে সামন্তরাজরূপে প্রতিষ্ঠিত হন। ক্রমে তাহারা পশ্চিমবঙ্গে একটি স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন। মধ্যযুগে বঙ্গদেশে এইভাবে আবেসিনীয়দের শাসন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং এইভাবে অষ্টাদশ শতাব্দীতে সিন্ধিয়া, হোল্‌কার, ভোঁস্‌লা, গায়কোয়াড় প্রভৃতি মারাঠা নায়কগণ আলাদা-আলাদা স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

কর্ণাটকের চালুক্যরাজগণ একাধিকবার বঙ্গদেশ আক্রমণ করেন। কর্ণাটকের যুবরাজ বিক্রমাদিত্য ১০৬৮ খ্রীষ্টাব্দে গৌড় ও কামরূপ জয় করিয়াছিলেন। ইহার পূর্বে ও পরে এই ধরণের আরো বিজয় অভিযানের কথা চালুক্যদের শিলা-লিপিতে পাওয়া যায়। একটি লিপি হইতে জানা যায় যে একাদশ শতাব্দীর শেষে এবং দ্বাদশ শতকের প্রথমে চালুক্যরাজ বিক্রমাদিত্যের 'আচ' নামক একজন সামন্ত রাজা বঙ্গ ও কলিঙ্গ জয় করিয়া স্বীয় প্রভুর আধিপত্য ঐ অঞ্চলে স্থাপন করিয়াছিলেন। ১১২১ ও ১২২৪ খ্রীষ্টাব্দে উৎকীর্ণ লিপিতে বিক্রমাদিত্য কর্তৃক অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গ-গৌড়-মগধ ও নেপাল জয়ের উল্লেখ আছে সুতরাং ইহা অসম্ভব নহে যে এই সমস্ত অভিযানের জন্য কর্ণাটকবংশীয় সেনগণ বঙ্গদেশে এবং নান্যদের মিথিলায় প্রভুত্ব স্থাপনের সুযোগ পাইয়াছিলেন।

কেহ কেহ আবার এই অনুমান করেন যে সেন রাজাদের পূর্বপুরুষগণ চোলরাজ রাজেন্দ্র চোলের সঙ্গে বঙ্গদেশে আসিয়াছিলেন। কিন্তু রাজেন্দ্র চোল কর্ণাটকের অধিবাসী ছিলেন না। কাজেই এই অনুমান খুব বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া মনে হয় না। এই প্রসঙ্গে চালুক্যরাজ তৃতীয় সোমেশ্বরের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে (১১২৭-১১৩৮ খ্রীঃ)। তিনি এই সময়ে অন্ধ্র, দ্রাবিড়, মগধ ও নেপালের রাজাদের পদানত করিয়াছিলেন বলিয়া দাবি করিয়াছেন। এমনকি তাহার পুত্র সোমও নেপাল, কলিঙ্গ জয় করিয়া গৌড়ের রাজাদের নিকট হইতে আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি আদায় করিয়াছেন বলিয়া দাবি করিয়াছেন। এই সমস্ত

রাজাদের সম্পর্কে যতটুকু জানা যায় তাহাতে তাহাদের একার পক্ষে এতদূর অভিযান করা সম্ভব ছিল বলিয়া মনে হয় না। সম্ভবতঃ এই অঞ্চলে কর্ণাটক প্রধানগণ তখনও সুদূরবর্তী এই রাজাদের প্রতি মৌখিক আনুগত্য প্রদর্শন করিতেন এবং সেই জন্য ইহাদের বিজয় অভিযানকে তাহারা নিজেদের বলিয়া গর্ব করিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে আরও একটি ঘটনার উল্লেখ প্রয়োজন। প্রায় একই সময়ে কনৌজকে রাজধানী করিয়া একটি শক্তিশালী রাজবংশ প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল যাহার নাম গাহড়বাল (Gahadavals), ইহারাও ছিলেন কর্ণাটক বংশীয়।

সেন রাজাগণ সে সময়ে যেভাবেই বঙ্গদেশে আসিয়া থাকুন না কেন সামন্ত সেনের পূর্বে তাহাদের কোন বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। তিনি বৃদ্ধ বয়সে গঙ্গাতীরে বসবাস করিয়াছিলেন বলা হইয়াছে। তবে তিনি কোন স্বাধীনরাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন মনে হয় না কারণ তাহার নামের পর অন্য কোন রাজকীয় পদবী ব্যবহার করা হয় নাই। অপরপক্ষে তাহার পৌত্র বিজয় সেনের লিপিতে তাহার পিতা হেমন্তসেন মহারাজাধিরাজ এবং মাতা যশোদেব মহারানী উপাধিতে ভূষিত হইয়াছেন (ব্যারাকপুর তাম্রশাসনে)। সুতরাং হেমন্ত সেনই এই বংশের প্রথম রাজা এইরূপ মনে করা সঙ্গত। তাহার সম্পর্কে আর কোন বিবরণ পাওয়া যায় নাই। যদিও তাহার পুত্রের শিলালিপিতে তাহাকে মহারাজাধিরাজ বলা হইয়াছে তথাপি মনে হয় তিনি পালরাজ রামপালের অধীনস্ত একজন সামন্ত রাজা ছিলেন।[১]

বিজয় সেন (৮৯৫-১১৫৮ খ্রীঃ)

হেমন্তসেনের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র বিজয়সেন সিংহাসনে আরোহন করেন। তিনি সম্ভবতঃ দীর্ঘ ষাট বৎসরেরও উপর রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাহার সময়কার একটি তাম্রশাসন ও একটি শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছিল। ইহাতে উল্লিখিত তাহার রাজত্বের কাল নির্ণয় সম্বন্ধে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। তিনি বিলাসদেবী নামক শূর রাজপরিবারের এক কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন বলা হইয়াছে। রামপালের রাজত্বকাল ছিল ১০৭৭-১১৩০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। যদি বিজয় সেন ১১৯৫ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করিয়া থাকেন তাহা হইলে তিনি রামপালের সমসাময়িক ছিলেন এবং মনে হয় তিনি তাহার রাজত্বের ২৫ বৎসর রামপালের অধীন একজন সামন্ত অধিপতি ছিলেন। যে সমস্ত সামন্ত রাজাগণ রামপালকে তাহার সিংহাসন উদ্ধারে সাহায্য করিয়াছিলেন তাহাদের

মধ্যে নিদ্রাবলীর বিজয়রাজ অন্যতম। অনেকে অনুমান করেন যে এই বিজয়-রাজই সেনরাজ বিজয়সেন।

রামপালের মৃত্যুর পর যখন পাল রাজ্যে গোলযোগ উপস্থিত হইল তখনই বিজয়সেন স্বীয়শক্তি বৃদ্ধি করিবার সুযোগ পাইলেন। কুমারপালের সামন্ত রাজাগণের মধ্যে অরন্য প্রদেশে সামন্তবর্গের নেতা অপর-মান্দারের অধিপতি লক্ষ্মীশূরের উল্লেখ আছে। রাজেন্দ্রচোলের লিপিতে রাঢ়ের অধিপতি রণশূরের উল্লেখ পাওয়া যায়। সুতরাং একাদশ শতকে সমগ্র দক্ষিণ রাঢ় অথবা তাহার অধিকাশ শূর বংশীয় রাজাদের অধীন ছিল। বিজয়সেনের প্রধানা মহিষী বিলাসদেবী সম্ভবতঃ এই বংশীয় কন্যা ছিলেন। সুতরাং তাহাকে বিবাহ করিয়া বিজয়সেন রাঢ় দেশে নিজ ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে শূরদের নিকট সাহায্য পাইয়াছিলেন এইরূপ অনুমান করার যথেষ্ট কারণ আছে। সম্ভবতঃ কর্ণাটক রাজের সামন্ত 'আচ' কর্তৃক বঙ্গদেশে প্রভুত্ব স্থাপনের ব্যাপারটি বিজয়সেন প্রত্যক্ষ করেন। তিনি সম্ভবতঃ রাঢ়ে নিজ আধিপত্য স্থাপন করিয়া অনন্তবর্মা চোড়গঙ্গের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়াছিলেন। কারণ তাহার পুত্র বল্লাল সেনের জীবনী অবলম্বনে রচিত 'বল্লাল চরিতে' বিজয়সেনকে 'চোড়গঙ্গ সখা' বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। যাহাই হোক একথা স্পষ্ট যে বিজয়সেন বঙ্গদেশের রাজ-নৈতিক দুর্ভাগ্যকে নিজ স্বার্থে খুব ভালভাবেই ব্যবহার করিয়াছিলেন। যে কোন উপায়েই হোক বিজয়সেন রামপালের মৃত্যুর অনতিকাল পরেই সমগ্র বঙ্গদেশে প্রভুত্ব স্থাপনে প্রয়াসী হইয়াছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তিনি বর্মরাজাকে পরাজিত করিয়া পূর্ব ও দক্ষিণ বঙ্গ অধিকার করেন। তাঁহার দেওপাড়া শিলা-লিপিতে উল্লেখ আছে যে, নান্যবীর, রাঘব ও বর্ধন নামক রাজাগণ তাহার সহিত যুদ্ধে পরাজিত হন এবং তাহার বিক্রমে পালরাজার জয় দূরীভূত হয়, কলিঙ্গরাজ পরাজিত হন এবং গৌড়রাজ দ্রুত পলায়নে বাধ্য হন। বীর, বর্ধন ও রাঘব এই তিনজন রাজা কোথায় রাজত্ব করিতেন তাহা সঠিকভাবে বলা সম্ভব নহে। তবে রাঘব রাজ ও কলিঙ্গরাজ সম্ভবতঃ অভিন্ন এবং মনে হয় তিনি অনন্তবর্মা চোড়গঙ্গর দ্বিতীয় পুত্র যাহার রাজত্বকাল সম্ভবতঃ ১১৫৬-১১৭০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে। মনে হয় বিজয়সেন তাহার রাজত্বের শেষদিকে ইহার বিরুদ্ধে অভিযান করেন। বিজয়সেন কর্তৃক পরাজিত গৌড় রাজ যে মদনপাল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

এইরূপে বহু যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া বিজয়সেন প্রায় সমগ্র বঙ্গদেশে এক অখণ্ড রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। দেওপাড়া লিপিতে উল্লিখিত হইয়াছে

যে পাশ্চাত্য শক্তি জয় করিবার জন্য বিজয় সেনের নৌবাহিনী গঙ্গা নদীর মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়াছিল। এই নৌ-রণসজ্জার উদ্দেশ্য ও ফলাফল কিছুই নিশ্চিত-ভাবে জানা যায় নাই। তবে পাশ্চাত্য শক্তির বিরুদ্ধে এই যুদ্ধযাত্রা যে বিশেষ সফল হইয়াছিল দেওপাড়া লিপি হইতে তাহা জানা যায় না। সম্ভবতঃ এই পাশ্চাত্য শক্তি ছিল মগধের পাল ও গাহড়বাল এই দুই রাজশক্তি।

বিজয়সেনের দীর্ঘ রাজত্বকাল বঙ্গদেশের ইতিহাসে এক স্মরণীয় ঘটনা। দীর্ঘ চার শতাব্দী রাজত্বের পর বঙ্গের পাল রাজশক্তি যখন অবক্ষয়ের পথে সেই সময় বঙ্গের রাজশক্তির একতা অভ্যন্তরীণ কলহ ও বহিঃশত্রুর আক্রমণে বিপর্যস্ত হইয়াছিল। ফলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামন্ত রাজাগণ নিজেদের স্বার্থের প্রেরণায় বৃহত্তর জাতীয় ঐক্যের আদর্শ ভুলিয়া গিয়াছিল। সেই অবস্থায় বিজয়সেন দীর্ঘদিন পরে বঙ্গদেশে একটি দৃঢ় রাজশক্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া দেশের সুখ ও শান্তি আনয়ন করিয়াছিলেন। তাহার প্রবল প্রভাবে বঙ্গদেশে এক নূতন গৌরবময় যুগের সূচনা হইয়াছিল। বিজয়সেন এইরূপ কঠোর শাসন প্রবর্তন না করিলে অরা-জকতা ও মাৎস্যন্যায়ের প্রাদুর্ভাব হইত। সাধারণ একজন সামন্তরাজের পদ হইতে নিজের বুদ্ধি, সাহস ও রণকৌশলে বিজয়সেন বঙ্গদেশের সার্বভৌম রাজার স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। ইহাই তাহার প্রধান কৃতিত্ব ও অসামান্য ব্যক্তিত্বের পরিচায়ক। তিনি "পরমেশ্বর পরমভট্টারক" ও "মহারাজাধিরাজ" উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহা ছাড়া তিনি 'অরিরাজ বৃষভশঙ্কর' এই গৌরবসূচক নামেও পরিচিত ছিলেন। তাহার এই দীর্ঘ গৌরবময় রাজত্বে শান্তি ও সমৃদ্ধি জনগণের মনে গভীর রেখাপাত করিয়াছিল। তাহার রাজত্বে যে নব যুগের সূত্রপাত হইয়াছিল কবি উমাপতি ধরের রচিত দেওপাড়া প্রশস্তিতে তাহার সাক্ষ্য বহন করিতেছে। এই প্রশস্তির মধ্যে এক নবজাগ্রত জাতি ও রাজশক্তির আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত হইয়াছে। প্রসিদ্ধ কবি শ্রীহট্ট রচিত 'বিজয় প্রশস্তি' ও 'গৌড়ার্বীশ-কুল প্রশস্তি' বিজয় সেনের উদ্দেশ্যে লিখিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়।[২]

রাঢ়ে শূরবংশের অধিকার প্রতিষ্ঠার পর হইতেই তাম্রলিপ্ত রাজ্যের স্বাতন্ত্র্য নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। তাম্রলিপ্ত তখন একটি ক্ষুদ্র রাজ্যে পরিণত হইয়া দক্ষিণ রাঢ়ের অন্তর্গত হয়। মেদিনীপুরের গেজিটিয়ার প্রণেতা 'ওম্যালি' সাহেব অনুমান করেন যে রাজেন্দ্র চোলের দিগ্বিজয়ের পূর্বেই তাম্রলিপ্ত রাজ্য দক্ষিণ রাঢ়ের সহিত যুক্ত হইয়াছিল। রাজেন্দ্র চোলের তিরুমলৈ শিলালিপিতে তাম্রলিপ্ত জয়ের কোন উল্লেখ নাই। দণ্ডভুক্তির পরেই দক্ষিণ রাঢ়ের নাম উল্লেখ

আছে। ইহাতে অনুমান করা হয় তাম্রলিপ্ত তখন দক্ষিণ রাঢ় রাজ্যের সহিত যুক্ত হইয়াছিল। রামচরিতে তাম্রলিপ্তের অধিপতির কোন নাম নাই। দক্ষিণ রাঢ়ের সেন রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হইলে তাম্রলিপ্তও তাহাদের অধিকারভুক্ত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। কলিঙ্গরাজ অনন্তবর্মা গঙ্গাতীরবর্তী ভূভাগের উপর হইতে কর সংগ্রহ করিয়াছিলেন বলিয়া বলা হইয়াছে। মনে হয় বিজয় সেন পাল-বংশীয় গৌড়েশ্বরের সহিত যখন যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন তখন অনন্তবর্মা উত্তর ও দক্ষিণ অঞ্চল অধিকার করেন। যুদ্ধের পরে বিজয় সেন কলিঙ্গাধিপতিকে পরাজিত করিয়া এই অঞ্চলগুলির উপর নিজ অধিকার পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেন।[৩]

বল্লাল সেন (১১৫৮-১১৭৯ খ্রীঃ)

আনুমানিক ১১৫৮ খ্রীষ্টাব্দে বিজয় সেনের মৃত্যুর পর তাহার পুত্র বল্লাল সেন সিংহাসনে আরোহন করেন। তাহার রাজত্বের একটিমাত্র লিপি পাওয়া গিয়াছে। ইহা ভাগলপুর জেলায় প্রাপ্ত একটি তাম্রশাসন। এই তাম্রশাসনে তাহার কোন বিজয় কাহিনী বর্ণিত হয় নাই। কেবল পরোক্ষভাবে তাহার রাজত্বের কাহিনী প্রশংসিত হইয়াছে। বল্লাল সেন রচিত 'দানসাগর' ও 'অদ্ভুত সাগর' নামে দুইখানি গ্রন্থ হইতে তাহার সম্বন্ধে কিছু বিবরণ পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া বল্লাল চরিত নামক দুইটি গ্রন্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে বল্লাল চরিতের প্রথম দুইখানি গ্রন্থের মধ্যে প্রথমখানি জাল। তিনি দ্বিতীয় গ্রন্থটিকে আসল বলিয়া মনে করেন। কিন্তু তাহার এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা কঠিন কারণ উভয় গ্রন্থাবলী কতকগুলি বংশাবলী ও জন-প্রবাদের সংকলন মাত্র। কাজেই কোনটিই অন্য প্রমাণ ছাড়া বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া গ্রহণ করা সঙ্গত নহে।

মগধের শেষ পালরাজা গোবিন্দপাল ১১৬২ খ্রীষ্টাব্দে রাজ্য হারাইয়া ছিলেন বলিয়া মনে হয়। এই সময়সীমা বল্লাল সেনের রাজত্বকালের মধ্যেই পড়ে বলিয়া অনেকে মনে করেন যে বল্লাল সেনই তাহাকে পরাজিত করিয়াছিলেন। 'অদ্ভুত-সাগর' গ্রন্থে বল্লাল সেনের সম্বন্ধে যে সকল কাহিনীর উল্লেখ আছে তাহাতেও বল্লাল সেনের গৌড়ের রাজাকে পরাজয়ের কথা বলা আছে। ইনিই 'গৌড়েশ্বর' মদনপাল বলিয়া মনে হয়। অথচ বল্লাল সেন কখনও মগধ অভিযান করিয়াছিলেন এমন কোন নির্ভরযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। বল্লাল চরিতে তাহার পিতার রাজত্বকালে তিনি মিথিলার বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ আছে। মিথিলা যে সেন রাজ্যের অন্তর্ভুক্তি ছল

এরূপ মনে করিবার সঙ্গত কারণ আছে। প্রথমতঃ নান্যদেবের মৃত্যুর পর মিথিলার কোন উল্লেখযোগ্য নেতার নাম ইতিহাসে পাওয়া যায় না। দ্বিতীয়তঃ প্রচলিত ও সু-প্রসিদ্ধ জনপ্রবাদ অনুসারে বল্লালসেন নিজ রাজ্যকে পাঁচভাগে ভাগ করেন এবং ইহার মধ্যে মিথিলা অন্যতম। তৃতীয়তঃ বল্লালসেনের পুত্র লক্ষণসেনের নামাঙ্কিত একটি সংবৎ (Era) এখনও মিথিলায় প্রচলিত আছে। সুতরাং বল্লাল সেন মিথিলা জয় করিয়াছিলেন এই প্রবাদ সত্য বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।

বল্লাল সেন নিজে প্রসিদ্ধ শাস্ত্রবিদ ছিলেন। 'বঙ্গীয় কুলজী' গ্রন্থে কৌলিন্য প্রথার উৎপত্তি প্রসঙ্গে বল্লাল সেনের নাম অবিচ্ছেদ্দভাবে যুক্ত আছে। বঙ্গদেশের লোক বিজয়সেনকে ভুলিয়া গিয়াছে কিন্তু বল্লালসেনের নাম ও স্মৃতি এখনও বিলুপ্ত হয় নাই।

বল্লালসেন যে পিতৃরাজ্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। মগধের কতকাংশ এবং সম্ভবতঃ মিথিলা তাহার রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। চালুক্য রাজের (সম্ভবতঃ দ্বিতীয় জগদেব মল্ল) কন্যা রামদেবীকে তিনি বিবাহ করেন। ইহাতে প্রমাণিত হয় যে সেন রাজনামের সম্মান ও প্রতিপত্তি বঙ্গের বাহিরেও বিস্তৃত হইয়াছিল এবং পিতৃভূমি কর্ণাটকের সহিত তখনও তাহাদের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয় নাই। পিতার অনুকরণে তিনিও সম্রাট সূচক নানা উপাধি গ্রহণ করেন (অরিরাজ নিঃশঙ্ক শঙ্কর)। বল্লাল সেন কেবল রাজাগণের মধ্যে নহে বিদ্বানমণ্ডলেরও চক্রবর্তী ছিলেন প্রশস্তিকারের এই উক্তি অধিকাংশই সত্য বলিয়া মনে হয়।

প্রচলিত প্রবাদ অনুসারে বল্লালসেনের রাজ্যের যে পাঁচটি প্রদেশ ছিল, তাহা হইল যথাক্রমে রাঢ়, বরেন্দ্র, বাগড়ি, বঙ্গ ও মিথিলা। ইহার মধ্যে প্রথম তিনটি বঙ্গদেশে এবং শেষের দুইটি উত্তর বিহারে অবস্থিত। বাগড়ি বলিয়া কথিত জায়গাটি বঙ্গদেশের প্রেসিডেন্সি বিভাগের অন্তর্গত সুন্দরবন অঞ্চল জুড়িয়া ছিল বলিয়া অনুমান করা হয়। যদিও ইহার স্বপক্ষে কোন সন্তোষজনক প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। সম্ভবতঃ এই অঞ্চলটি 'আইন-ই-আকবরীতে' উল্লিখিত মহল বাগড়ি এবং রেনেলের মানচিত্রে প্রদর্শিত রাঢ় ও উৎকলের সীমান্তবর্তী উত্তর মেদিনীপুরের কোন অঞ্চল। রেনেলের মানচিত্রে সপ্তম চিত্রে বাগড়ি দেশকে মেদিনীপুর ও বিষ্ণুপুরের সীমানায় রূপনারায়ণ ও কাঁসাইয়ের মধ্যবর্তী অঞ্চল হিসাবে দেখানো হইয়াছে। কানিংহাম এই সনাক্তকরণ প্রথম উল্লেখ করেন। পরবর্তীকালে ইহা মোটামুটি গৃহীত হয়। বঙ্গদেশে প্রচলিত শাসনতান্ত্রিক

বিভাগগুলির (রাঢ়, বরেন্দ্র এবং বঙ্গ) বাহিরে ছিল বলিয়া সম্ভবতঃ ইহাকে 'বাগড়ি' এই নূতন নামে অবিহিত করা হইয়াছিল। এই মত অনুসারে দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গের যেখানে বাগড়ি অবস্থিত তাহা বৃহত্তর বঙ্গেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল।

দীর্ঘকাল রাজ্য পরিচালনা ও শাস্ত্রীয় জীবন অতিবাহিত করিয়া বৃদ্ধবয়সে বল্লালসেন সম্ভবত পুত্র লক্ষণসেনের হাতে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া বানপ্রস্থ অবলম্বনপূর্বক শেষ জীবন অতিবাহিত করেন।[৪]

লক্ষ্মণ সেন (১১৭৯-১২০৬ খ্রীঃ)

বল্লালসেন ও রামদেবীর পুত্র লক্ষ্মণসেন আনুমানিক ১১৭৯ খ্রীষ্টাব্দে পিতার মৃত্যুর পর সিংহাসনে আরোহন করেন। তাহার রাজত্বকালের আটখানি তাম্রশাসন ও তাহার সভাকবিগণ রচিত কয়েকটি স্তুতিবাচক শ্লোক এবং তাহার পুত্রদ্বয়ের তাম্রশাসন ও ঐতিহাসিক মীনহাজুদ্দিন রচিত 'তবকাৎ-ই-নাসিরী' নামক গ্রন্থের বিবরণ হইতে তাহার রাজত্বের অনেক তথ্য পাওয়া যায়। তিনি "অরিরাজ মণ্ডল শঙ্কর" এই উপাধির সহিত "গৌড়েশ্বর" এই উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহার পরবর্তী সেন রাজাগণ নিজেদের নামের সঙ্গে 'পরম মহেশ্বর' এই কথা ব্যবহার করিতেন। বল্লালসেন সরকারী নথিপত্রে এই উপাধির পরিবর্তে 'পরম বৈষ্ণব' বা 'পরম নরসিংহ' এই উপাধিও প্রয়োগ করিতেন দেখা যায়।

রাজকীয় উপাধিতে এই পরিবর্তনের মাধ্যমে লক্ষ্মণ সেন পূর্বপুরুষের শৈব ধর্মের পরিবর্তে বৈষ্ণব ধর্মের প্রতি অনুরক্ত হইয়াছিলেন প্রমাণিত হয়। তাহার রাজসভা যাহারা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে বিখ্যাত হইলেন কবি জয়দেব, ধোয়ী, শরন, উমাপতিধর এবং সম্ভবতঃ গোবর্ধন। বিখ্যাত পণ্ডিত হলায়ূধ তাহার প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। রাজা নিজেও পণ্ডিত ছিলেন। রাজা এবং তাঁহার পরিবারের কাহারও কাহারও রচিত কিছু সংস্কৃত শ্লোক শ্রীধর দাস কর্তৃক সংকলিত 'সদুক্তিকর্ণামৃত' গ্রন্থে পাওয়া যায়। লক্ষ্মণসেন তাহার পিতার রচিত জ্যোতির্বিদ্যা গ্রন্থ 'অদ্ভুত-সাগরকে' সমাপ্ত করিয়াছিলেন।

তিনি যখন সিংহাসনে আরোহন করেন তখন তাহার বয়স প্রায় ষাট বৎসর। তিনি একদিকে বিদ্যাচর্চায় যেমন পারদর্শী ছিলেন তেমনি যুদ্ধ বিদ্যায়ও কম ছিলেন না। তিনি পিতা ও পিতামহের সঙ্গে বিভিন্ন যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিয়া রণকুশলতার পরিচয় দিয়াছিলেন এবং যুদ্ধক্ষেত্রে কাশিরাজকে পরাজিত করেন। তাঁহার প্রশস্তিকার লিখিয়াছেন তিনি নিজ বাহুবলে যুদ্ধ জয় করিয়া

গৌড় লক্ষ্মীকে লাভ করেন। রাজধানী লক্ষ্মণাবতী তাহার নামানুসারে হইয়াছিল। তাহার তাম্রশাসনে প্রথম সেনরাজাদের নামের পূর্বে "গৌড়েশ্বর" এই উপাধি ব্যবহৃত হইয়াছিল।

লক্ষ্মণসেনের কলিঙ্গ ও কামরাজ জয় সম্ভবতঃ তাহার পিতামহের রাজত্ব-কালেই হইয়াছিল। তবে ইহা অসম্ভব নয় যে গৌড়ের ন্যায় এই দুই রাজ্যও লক্ষ্মণসেনই সম্পূর্ণভাবে জয় করিয়াছিলেন। কারণ তাহার পুত্রদ্বয়ের তাম্রশাসনে বলা হইয়াছে যে তিনি কাশিতে এবং প্রয়াগে জয়স্তম্ভ স্থাপন করিয়াছিলেন। এই সময়ে বঙ্গদেশের রাজাগণ কলিঙ্গ এবং উৎকল উভয় দেশেই রাজত্ব করিতেন। সম্ভবতঃ লক্ষ্মণসেন কোন গঙ্গরাজকে পরাজিত করিয়াই পুরীতে জয়স্তম্ভ স্থাপন করিয়াছিলেন।

গঙ্গ, গহড়বাল ও জয়চন্দ্রের লিপি হইতে প্রমাণিত হয় যে ১১৬৯-১১৯০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে মগধের পশ্চিম ও মধ্যভাগ গহড়বাল রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। পূর্বদিকে ইহাদের দ্রুত রাজ্য বিস্তার সেন রাজাদের পক্ষে বিশেষ আশঙ্কাজনক হওয়ায় লক্ষ্মণসেনের সহিত তাহাদের যুদ্ধ অনিবার্য হইয়া পড়ে। লক্ষ্মণসেন ইহাদের সহিত যুদ্ধে বিশেষ সাফল্যলাভ করিয়াছিলেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। মগধের মধ্যভাগে গয়া জেলায় তিনি যে রাজ্যবিস্তার করিয়াছিলেন বৌদ্ধগয়ায় প্রাপ্ত দুইখানি লিপিতে তাহার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। জয়চন্দ্রের একটি লিপি হইতে প্রমাণিত হয় যে ১১৮২-১১৯২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি গয়ায় রাজত্ব করিতেন। জয়চন্দ্রকে পরাজিত না করিয়া লক্ষণসেন কখনও গয়া অধিকার করিতে পারেন নাই। লক্ষ্মণসেনের মগধ অধিকার ও প্রয়াগ পর্যন্ত যুদ্ধের অভিযান নিশ্চিতভাবে গাহড়বাল রাজশক্তিকে দুর্বল করিয়াছিল। এই রাজ্যই সেই সময়ে ছিল ভারতের নবাগত মুসলমান রাষ্ট্রশক্তির ক্রমঅগ্রগতির বিরুদ্ধে শেষ প্রতিরোধ প্রাচীর। সেই প্রতিরোধ প্রাচীরকে দুর্বল করিয়া লক্ষ্মণসেন রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়াছিলেন কিনা বিচার্য বিষয়। তবে একথা সত্য গাহড়বাল রাজ শক্তির প্রতিরোধ ভাঙ্গিয়া পড়ায় মহম্মদ বখতিয়ার খিল্‌জীর পক্ষে বঙ্গ ও বিহার জয় করা সহজে সম্ভব হইয়াছিল।

উমাপতি ধর লক্ষ্মণসেনের বিজিত রাজ্যগুলির মধ্যে একজন চেদি রাজের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। রতনপুরের কলচুরি রাজ্যের একজন সামন্ত বল্লভরাজ কোন এক গৌড় রাজাকে পরাজিত করার দাবি করিয়াছেন। এই বল্লভরাজ দ্বাদশ শতকের মধ্যভাগে রাজত্ব করিতেন। তাই মনে হয় উমাপতি ধর সম্ভবতঃ ইহার সহিত লক্ষ্মণসেনের সংঘাতের কথা বলিয়াছেন। বল্লভ রাজের এই উল্লেখ

হইতে উমাপতি ধরের বর্ণনা যে একেবারে কাল্পনিক নয় এবং ইহার পশ্চাতে যে কিছু ঐতিহাসিক সত্যতা আছে তাহাই মনে হয়। কলচুরি রাজাদের সহিত গৌড় রাজাদের সম্বন্ধ ও সংঘর্ষ বহুদিনের পুরাতন ঘটনা। তবে এই বিশেষ সংঘর্ষের ঘটনাটির কারণ ও ফলাফল একেবারেই অজ্ঞাত। তবে এই বর্ণনায় উভয় পক্ষই যখন জয়ের দাবি করিয়াছেন তখন এই যুদ্ধে তেমন সুনির্দিষ্ট ফলাফল কিছুই হয় নাই।

এইভাবে দেখা যায় যে লক্ষ্মণসেন উত্তর গৌড়, কামরূপ ও দক্ষিণে কলিঙ্গ রাজকে পরাভূত করিয়া পৈতৃক রাজ্য অক্ষুণ্ণ ও সুদৃঢ় করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। পশ্চিমদিকে তাঁহার পিতা ও পিতামহ অপেক্ষা তিনি অধিকতর সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন। তিনি অন্তত মগধ পর্যন্ত তাঁহার রাজ্যসীমা বিস্তার করিয়াছিলেন। তাহার মৃত্যু ও সেন রাজ্যের ধ্বংসের বহুকাল পরেও মগধে তাহার নামে সংবৎ গণনা করা হইত। ইহাতে মগধে লক্ষ্মণসেনের ক্ষমতা যে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহার নির্ভরযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায়।

যদিও বাল্যকাল হইতে আরম্ভ করিয়া লক্ষ্মণসেন সারাজীবন যুদ্ধবিগ্রহ করিয়াছিলেন এবং যদিও তাহার ন্যায় যুদ্ধে সীমান্তের বাহিরে অনেকেই সাফল্য লাভ করেন নাই তথাপি তাহার শেষ জীবন নিশ্চিন্তে কাটে নাই। তাঁহার ন্যায় একজন সমরকুশলী ব্যক্তির রাজত্বকালের শেষদিকে কি করিয়া রাজনৈতিক বিপর্যয় ঘটিল এবং কি ভাবেই বা সেন রাজাদের রাজনৈতিক ক্ষমতা ধ্বংস হইল তাহার বিষদ বিবরণ স্পষ্টভাবে জানার কোন নির্ভরযোগ্য তথ্য নাই। তিনি দীর্ঘ ২০ বৎসর রাজত্ব করিয়া বৃদ্ধ বয়সে গঙ্গাতীরে অবস্থান করিবার উদ্দেশ্যে নবদ্বীপে আসেন।

১১৯৬ খ্রীষ্টাব্দে সুন্দরবনের পশ্চিম অঞ্চলে প্রাপ্ত একখানি তাম্রশাসন হইতে জানা যায় ডোম্মনপাল (Damman Pal) নামে এক ব্যক্তি খাড়ি পরগণায় বিদ্রোহী হইয়া একটি স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। লক্ষ্মণসেন ও বিজয়সেনের নথিপত্র হইতে জানা যায় সুন্দরবনের এই অঞ্চলটি সেনরাজ্যের অন্তর্গত ছিল। কাজেই ডোম্মন পালের এই বিদ্রোহ বৃদ্ধ বয়সে লক্ষ্মণসেনের রাজত্বে তাহার ক্ষমতার শৈথিলতা এবং সাম্রাজ্য ভাঙ্গনের প্রথম পদক্ষেপ বলিয়া মনে করা যায়।

এই তাম্রশাসনে ডোম্মন পাল যে পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাহারা অযোধ্যা অঞ্চল হইতে আসিয়া এই অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেন বলিয়া উল্লেখ আছে। তবে তাহারা কিভাবে এই অঞ্চলে আসিয়াছিলেন, যুদ্ধের দ্বারা অধিকার

করিয়াছিলেন বা অন্য উপায়ে সে বিষয়ে কোন স্পষ্ট উল্লেখ নাই। এই তাম্রশাসনে মাত্র দুইজন শাসকের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। উল্লিখিত শাসকদের দ্বিতীয় জনই হইল ডোম্মন পাল। যাহার উপাধি বলা হইয়াছে'মহাসামন্তাধিপতি মহারাজাধিরাজ'। ইহাদের সহিত বঙ্গদেশের পাল রাজাদের কোন সম্পর্ক ছিল কিনা তাহা বলা শক্ত। খুব সম্ভব ডোম্মন পাল সেন রাজাদের অধীনস্থ সামন্ত রাজার পুত্র ছিলেন। পরে তিনি এই অঞ্চলে নিজেকে স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করেন। এই পরিবারের পরবর্তী ইতিহাস কিছু জানা যায় নাই।

ঠিক একই সময়ে সেন সাম্রাজ্যের পূর্ব দিকে মেঘনা নদীর পূর্বপারে দেব পরিবার সম্ভবতঃ একটি স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। এইরূপে অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহের সময় ১২০২ খ্রীষ্টাব্দে বখতিয়ার খিল্‌জী বাংলাদেশ আক্রমণ করেন এবং তখন লক্ষ্মণসেন নবদ্বীপ পরিত্যাগ করিয়া পূর্ববঙ্গে চলিয়া যান। লক্ষ্মণসেনের নবদ্বীপ ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে বিশাল সেন সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া পড়িতে শুরু করে। অবশ্য সেন রাজবংশ পূর্ববঙ্গে আরো কিছুকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। লক্ষ্মণ সেন সম্ভবতঃ ১২০৬ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

তাহার মৃত্যুর পর তাহার দুইপুত্র বিশ্বরূপ সেন ও কেশব সেন রাজত্ব করেন। বিজয় সেন, লক্ষ্মণ সেন উভয়েই 'গৌড়েশ্বর' রূপে পরিচিত ছিলেন। তাহাতেই মনে হয় পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের সহিত দক্ষিণ ও পশ্চিমবঙ্গও তাহাদের রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। অর্থাৎ তাহারা দণ্ডভুক্তি অঞ্চলের অধিপতি ছিলেন। যদিও কোন লিপিতে দণ্ডভুক্তি তাহাদের অধিকারে ছিল বলা হয় নাই। উত্তরভারতে যখন তুর্কীদের আক্রমণের ফলে রাজনৈতিক বিপর্যয় ঘটিয়াছিল সেই দুর্দিনে লক্ষ্মণসেন নিজের রাজ্যরক্ষার ব্যবস্থা কি করিয়াছিলেন সঠিক জানা যায় নাই। কোন ভারতীয় লেখক বঙ্গদেশের রাজনৈতিক বিপর্যয় সম্পর্কে কোন বিবরণ লিখিয়া যান নাই। এই ঘটনার প্রায় ৫০ বৎসর পরে বিভিন্ন লোক মারফৎ শ্রবণ করিয়াও নানা স্থান হইতে তথ্য সংগ্রহ করিয়া সুলতানদের মধ্যে একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী 'মীনহাজুদ্দিন' তাহার 'তাবকৎ-ই-নাসিরী'তে বখ্‌তিয়ার খিল্‌জীর নবদ্বীপ বিজয়ের কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তবে তাহার নদীয়া বিজয়কাহিনী সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া গ্রহণ করা খুবই কঠিন।

লক্ষ্মণসেনের দুই পুত্রের রাজত্বকালের বিস্তৃত বিবরণ কিছু পাওয়া যায় নাই। তবে তাঁহাদের রাজত্বের সময়ের কয়েকটি তাম্রলিপি পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে অনুমান করা হয় এই দুই ভ্রাতা মোট প্রায় ২৫ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। পূর্ববঙ্গ এবং দক্ষিণবঙ্গ তাহাদের রাজ্যাংশের মধ্যে ছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ

নাই। কারণ ইহাদের তাম্রশাসনে দক্ষিণবঙ্গের সমুদ্রতীরে ভূমিদানের উল্লেখ আছে। তাম্রশাসনে উভয় ভ্রাতাকেই 'যবনান্বয়-প্রলয়-কাল-রুদ্র' বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। তাহাতে অনুমিত হয় যে উভয়েই বঙ্গদেশের মুসলমান তুর্কীরাজ্যের সহিত যুদ্ধে সফলতা অর্জন করিয়াছিলেন। তাহাদের পরবর্তীকালের ইতিহাস কিছু জানা যায় নাই। অর্থাৎ তাহাদের পতন সম্ভবতঃ সম্পূর্ণ হইয়াছিল। সেন রাজাদের পতনের একমাত্র কারণ তুর্কী-আক্রমণ নয় ইহা সহজেই বোঝা যায়। অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহও ইহার ধ্বংসের পথকে প্রশস্ত করিয়াছিল। সেন রাজাগণের পর হইতে বঙ্গের প্রাচীন ইতিহাসেরও সমাপ্তি ঘটে।[৫]

সূত্র নির্দেশ

১। History of Bengal, Chap. VIII, pp. 205-210
রমেশচন্দ্র মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস, পৃঃ ৯০-৯২
নীহাররঞ্জন রায়, বাঙালীর ইতিহাস, পৃঃ ৫২৭-৫২৮
রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, বাঙ্গালার ইতিহাস, পৃঃ ২৪২-২৬১
কল্যাণকুমার দাসগুপ্ত, 'রাজনৈতিক ইতিহাসে প্রাচীন তাম্রলিপ্ত', 'ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে তাম্রলিপ্ত', পৃঃ ১২৫

২। History of Bengal, Ibid, pp. 210-215
মজুমদার, পূর্বে উল্লিখিত, পৃঃ ৯২-৯৫
রায় „ „ পৃঃ ৫২৮-৫২৯

৩। যোগেশচন্দ্র বসু, মেদিনীপুরের ইতিহাস, পৃঃ ৮৯-৯৩

৪। History of Bengal, Ibid, pp. 215-218
মজুমদার, পূর্বে উল্লিখিত, পৃঃ ৯৫-৯৮
রায় ” ” পৃঃ ৫২৯-৫৩১

৫। History of Bengal, Ibid, pp. 218-228
মজুমদার, পূর্বে উল্লিখিত, পৃঃ ৯৮-১০২
রায় ” ” পৃঃ ৫৩১-৫৩৩
দাসগুপ্ত ” ” পৃঃ ১২৫

ষষ্ঠ অধ্যায়

তাম্রলিপ্ত : নামকরণ ও ভৌগোলিক সীমা

প্রাচীন বঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ বন্দরনগরী তাম্রলিপ্ত বা তাম্রলিপ্তির উল্লেখ বহুবার আছে। অতীত দিনের সাহিত্যে এবং বিভিন্ন লিপিতে দ্বাদশ শতকের জৈন লেখক হেমচন্দ্রের "অভিধান চিন্তামণি" গ্রন্থে তাম্রলিপ্তের একাধিক নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। যথা, তাম্রলিপ্ত, দামলিপ্ত, তমালিনী, বিষ্ণুগৃহ, স্তম্বপুর। এয়োদশ শতাব্দীর 'ত্রিকাণ্ড শেষ' নামক অভিধান গ্রন্থে বেলাকুল তমালিকা নামেরও উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

বৌদ্ধগণ ও চীনদেশীয় পরিব্রাজকগণের ভ্রমণ বৃত্তান্তে ইহার নাম 'তমল্লিতি' ও 'তম্মোলিতি' বলিয়াও উল্লেখ আছে। মসিঁয়ে জুলিয়েন ও প্রত্নতাত্ত্বিক জেনারেল ক্যানিংহামের মতে 'তম্মোলিতি' কথাটি পালি সংস্কৃতের তাম্রলিপ্ত কথার অপভ্রংশ।

'শব্দকল্পদ্রুম', 'তমোলিপ্তী' ও 'তাম্রলিপ্ত' শব্দের অর্থে তমলুক বলিয়া ধরা হইয়াছে। 'বাচস্পত্যে', 'তমালিকা', 'তমালিনী' ও 'তামলিপ্ত' শব্দে তমলুককেই বোঝাইয়াছেন। এইচ. এইচ. উইলসনের সংস্কৃত ও ইংরাজী অভিধানে ও 'তমালিকা', 'তমোলিপ্তী', 'তামলিপ্ত' ও 'দামলিপ্ত' শব্দের আধুনিক তমলুককেই বোঝায় বলিয়া লিখিত আছে। 'প্রকৃতিবাদ' অভিধান ও 'শব্দার্থ প্রকাশিকা' প্রভৃতি বাংলা অর্থ পুস্তকেও 'তমালিকা', 'তমালিনী', 'তমোলিপ্তী', 'তমলিপ্ত' ও 'দাবলিপ্ত' শব্দের অর্থ তমলুক বলিয়া লেখা আছে। মহাভারতে ইহার নাম 'তাম্রলিপ্ত', ভারতকোষে 'তাম্রলিপ্তি' এবং শব্দ-রত্নাবলীতে 'তমোলিপ্ত' দেখিতে পাওয়া যায়। একই স্থানের এতগুলি বিভিন্ন নাম কেন তাহা বলা খুবই কঠিন। অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র সরকার মনে করেন এই বিভিন্ন নাম তাম্রলিপ্তের সুদীর্ঘ ইতিহাস ও তাহারা গুরুত্বের দ্যোতনা করে। এই সমস্ত নামগুলির অর্থ নির্ণয় করা খুব সহজ নয়।

মেদিনীপুরের ইতিহাস প্রণেতা যোগেশচন্দ্র বসু মহাশয় তাহার পুস্তকে বিভিন্ন লেখকের উদ্ধৃতি (হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 'কনকাভই পিল্লে, রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, দুর্গাদাস লাহিড়ী) সহযোগে মন্তব্য করিয়াছেন যে তাম্রলিপ্ত নামটির সহিত দক্ষিণ ভারতীয় তামিল জাতির একটি

নিকট সম্বন্ধ ছিল। তাহাদের মতে তাম্রলিপ্ত এক সময় দ্রাবিড় জাতির প্রাধান্য ছিল। তাহারাই এখান হইতে দক্ষিণে গিয়া বসতি স্থাপন করে। এক সময় এখানে যে দামল বা তামল জাতির প্রাধান্য ছিল তাহা 'দামলিপ্ত' নাম হইতেই বোঝা যায়। তাহাদের মতে বাঙ্গালী, মঙ্গোল ও দ্রাবিড় জাতির মিশ্রণে উৎপন্ন। কেহ কেহ তাম্রলিপ্ত নামটিরও কোনও জায়গার মধ্যে তামিল জাতের সন্ধান পাইয়াছেন। অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র সরকার এই ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত বলিয়া মনে করেন। কারণ দক্ষিণ ভারতীয় জাতিবোধক যে শব্দটি ইংরেজী 'তামিল' তাহাই ভারতীয় আর্য ভাষায় 'দ্রাবিড়'। কাজেই তামিল বর্ণমালায় যে বর্ণটিকে ইংরেজীতে "T" দ্বারা প্রকাশ করা হইয়াছে সেটি সংস্কৃত বর্ণমালাতে অনুপস্থিত। তাই ডঃ সরকার দক্ষিণ ভারতের তামিল জাতির সহিত তাম্রলিপ্তের কোন সম্পর্ক নাই মনে করেন। তাম্রলিপ্ত নামের মধ্যে এই অঞ্চলে তাম্র নির্মিত ধাতুর প্রচলনের ইঙ্গিত এবং তমালিনী নামের মধ্যে তমাল বৃক্ষের প্রভাব থাকা সম্ভব বলিয়া মনে করেন।

কেহ কেহ 'তামলিপ্ত' বা 'তমোলিপ্ত' নামের মধ্যে অন্ধকারাচ্ছন্ন বা পাপে জড়িত (তম—Darkness or Sin এবং লিপ্ত—Soiled) অর্থ করিয়াছেন। সম্ভবতঃ এই অঞ্চলে 'দমল' জাতির প্রাধান্য ছিল বলিয়া এই স্থান 'দামলিপ্ত' বা 'দামলিপ্তা' এইরূপ নামে পরিচিত ছিল। আর্যগণ তাহাদের সভ্যতায় ঈর্ষাপরায়ণ হইয়া 'দামলিপ্ত'কে ঘৃণাসূচক 'তমোলিপ্ত' নামে অভিহিত করিতেন। পরবর্তীকালে এই অঞ্চল আর্যদের অধিকারভুক্ত হইলেও তাহারা এই অপবিত্র সূচক নামকেও পবিত্র একটি অর্থ প্রদান করিয়াছিলেন। তাহাদের মতে বিষ্ণু যখন কল্কিরূপ ধারণ করিয়া অসুরগণকে নিধন করেন তখন যুদ্ধশ্রমে ক্লান্ত তাহার দেহ হইতে ঘর্ম নির্গত হইয়া এই স্থানে পতিত হয়। দেব শরীর নির্গত ক্লেদ স্পর্শে 'তমোলিপ্তের' পবিত্রতা সম্পাদিত হয়। এইজন্যই ইহার আর এক নাম সম্ভবতঃ 'বিষ্ণুগৃহ'।

তাম্রলিপ্তের প্রাচীন নামগুলির মধ্যে 'বেলাকুল' নামটি খুবই অর্থবহ। 'বেলাকুল' শব্দের অর্থ সামুদ্রিক বন্দর। এক সময় তাম্রলিপ্ত পূর্ব ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ বন্দর ছিল, কাজেই এই নামটি বিশেষভাবে সার্থক। এই স্থানটি কোন সময়ে ঠিক সমুদ্রের তীরে অবস্থিত ছিল কিনা তাহা বলা সম্ভব নয়। প্রাচীন ভারতে অবশ্য জোয়ারের সময় সমুদ্রের লবণাক্ত জল দেশের যতদূর পর্যন্ত অভ্যন্তরে প্রবেশ করিত তাহার সবটাই সামুদ্রিক এলাকা বলিয়া গণ্য করা হইত। মনে হয় তাম্রলিপ্ত এই অর্থে সামুদ্রিক বন্দর হিসাবে চিহ্নিত

হইয়াছে। বর্তমান তমলুক সমুদ্র হইতে প্রায় ৬০ মাইল দূরে অবস্থিত অতীত কালে কোন সময় ইহা ঠিক সমুদ্রের নিকটে অবস্থিত ছিল বলিয়া মনে হয় না। তবে হয়তো ইহার খুব কাছাকাছি সমুদ্র ছিল।

'বিষ্ণুগৃহ' এই নামের কারণ বোধহয় এই, আদি মধ্যযুগে তাম্রলিপ্তে ভগবান বিষ্ণুর মন্দির বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল। 'স্তম্বপুর' নামটির 'স্তম্ব' শব্দ আভিধানিকেরা 'স্তম্ভ' অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন। নামটি আদি মধ্যযুগের উড়িষ্যার জনপ্রিয় দেবতা। স্তম্ভেশ্বরী অর্থাৎ আধুনিক খম্বেশ্বরীকে স্মরণ করাইয়া দেয়। তাম্রলিপ্ততে ও উড়িষ্যার অনুরূপে স্তম্ভ বা স্তম্ভেশ্বর নামক কোন দেবতার মন্দির ছিল কিনা অনুসন্ধান প্রয়োজন। তবে ঐ যুগে বর্গভীমা মন্দিরে কোন অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। চৈনিক পরিব্রাজকদের উচ্চারণের পার্থক্যের জন্য সম্ভবতঃ 'তাম্রলিপ্ত' 'তাম্রলিপ্তি' তাহাদের গ্রন্থে বিকৃতরূপ ধারণ করিয়াছে।[১]

বিষ্ণুপুরাণ গ্রন্থে চতুর্থ অংশে প্রাচীন তাম্রলিপ্তকে সমুদ্রতটে অবস্থিত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছে। পাণ্ডববিজয় নামক সংস্কৃত ভৌগোলিক গ্রন্থেও তাম্রলিপ্তের রাজাকে ভাগীরথীর তীরস্থ রাজা বলা হইয়াছে। বায়ুপুরাণ গ্রন্থেও তাম্রলিপ্তকে গঙ্গার তীরবর্তী বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। এশিয়াটিক রিসার্চ (Asiatic Research) পত্রিকায় বিশেষজ্ঞদের মত উদ্ধৃত করিয়া বলা হইয়াছে যে গঙ্গা তাম্রলিপ্তের নিকট দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। বহুদিন পূর্বে প্রকাশিত 'জন্মভূমি' পত্রিকার এক প্রবন্ধে লেখা হইয়াছিল যে ভাগীরথী নদী হুগলী নাম লইয়া সপ্তগ্রাম, আদমপুর, আমতা, তমলুক প্রভৃতি জনপদ অতিক্রম করিয়া প্রবাহিত হইত।

ফা-হিয়েন তমলুককে গঙ্গার মোহনায় অবস্থিত একটি বৃহৎ সামুদ্রিক বন্দর বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। প্লিনি লিখিয়াছেন তখনকার দিনে জাহাজে করিয়া বঙ্গদেশ হইতে সিংহলে যাইতে প্রায় কুড়ি দিন সময় লাগিত। ফা-হিয়েনের মতে একটি বিরাট বাণিজ্যপোত তাম্রলিপ্ত হইতে সিংহল যাইতে ৩৪ দিন ৩৪ রাত্রি লাগিয়াছিল। হিউয়েন-সাঙ তাম্রলিপ্তকে একটি উপসাগরের নিকটবর্তী বৌদ্ধ বন্দর বলিয়াছেন। তিনি এই রাজ্যকে দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরের উপকূলবর্তী নিম্ন-ভূমিতে ১৪০০ লি পরিধি এবং উহার বিস্তৃতি ১০ লি পর্যন্ত বলিয়াছেন। ইৎ-সিঙ্ তাম্রলিপ্ত সম্পর্কে বলিয়াছেন যে, ইহা ভারতবর্ষের মধ্যদেশ হইতে এক প্রান্তে অবস্থিত। পূর্বে ও পশ্চিমে ইহা ৩০০ যোজনেরও অধিক। দক্ষিণ ও উত্তরে সীমান্তভূমি ৪০০ যোজনেরও অধিক দূরবর্তী। ভারতের সীমা হইতে এই রাজ্য ৪০ যোজন দক্ষিণে অবস্থিত এবং পূর্ব ভারতের অন্তর্গত মহাবোধি ও

নালন্দা এখান হইতে প্রায় ৬০ যোজন দূরে অবস্থিত। তিনি শুনিয়াছিলেন যে সিংহলদ্বীপ তাম্রলিপ্ত বন্দর হইতে ৭০০ যোজন দূরে অবস্থিত।

রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটির এক জার্নালে প্রাচীন সূত্র উল্লেখ করিয়া এই মন্তব্য করা হইয়াছে তাম্রলিপ্ত গঙ্গার মোহনায় অবস্থিত বলিয়া বর্তমান তমলুকের সহিত ইহা অভিন্ন মনে হয়। ক্যানিংহামের মতে তাম্রলিপ্ত হুগলী নদীর পশ্চিম দিকে এবং উত্তরে বর্ধমান হইতে কালনা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। অর্থাৎ এই বর্ণনা অনুসারে তাম্রলিপ্তের দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, পূর্বদিকে গঙ্গা, উত্তরে বর্ধমান ও কালনা ছিল মনে হয়। বিশ্বকোষ প্রণেতা নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় অতীত কলিঙ্গরাজ্য বর্তমান তমলুকের সীমান্ত হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণে গোদাবরী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। অর্থাৎ তাহার বর্ণনা অনুসারে বর্তমান মেদিনীপুর, উড়িষ্যা, গঞ্জাম সেই সময় কলিঙ্গরাজ্যের অন্তর্গত ছিল। এই বর্ণনা যদি সঠিক হয় তাহা হইলে তাম্রলিপ্তের পশ্চিমদিকে ছিল কলিঙ্গরাজ্য, পূর্বে গঙ্গা, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর। সেই সময়ে ইহার পরিধি ছিল ২৫০ মাইল।

পরবর্তী যুগে গঙ্গার মোহনাতে ক্রমাগত পলি পড়িয়া রূপনারায়ণ নদীতে অনেক চরের সৃষ্টি হইয়াছে। ফলে সম্ভবতঃ তাম্রলিপ্তের পরিধি অনেক সংকোচিত হইয়া গিয়াছে।

আধুনিক তমলুক (যাহা প্রাচীন তাম্রলিপ্ত মনে করা হয়) পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান বিভাগের মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত। ইহা কলিকাতা হইতে ৩৫ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে ও মেদিনীপুর হইতে ৪১ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে রূপনারায়ণ নদের পশ্চিম তীরে অবস্থিত।

প্রাচীন মহাকাব্য ও অন্যান্য গ্রন্থে তাম্রলিপ্তের উল্লেখ

প্রাচীন মহাভারতে বিভিন্ন ঘটনার বর্ণনা উপলক্ষে তাম্রলিপ্তের উল্লেখ বার বার দেখিতে পাওয়া যায়। মহাভারতের আদিপর্বে দ্রৌপদীর স্বয়ংবর সভা প্রসঙ্গে দ্রৌপদীকে তাহার স্বয়ংবর সভায় উপস্থিত বিভিন্ন নৃপতিদের কথা উল্লেখ করিতে গিয়া কলিঙ্গ এবং তাম্রলিপ্তের নরপতিদের কথা বলা হইয়াছিল।

মহাভারতের 'সভাপর্বে' ভীমের দিগ্বিজয় প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে তিনি যে সমস্ত বঙ্গের অধীশ্বরকে পরাজিত করিয়াছেন তাহাদের মধ্যে চন্দ্রসেন, সমুদ্র-সেনের নামের সঙ্গে তাম্রলিপ্তের নরপতির নাম উল্লেখ করা হইয়াছে। এই সভাপর্বে আবার দেখা যায় পাণ্ডবদের রাজসূয় যজ্ঞে যে সমস্ত রাজারা সমবেত

হইয়া বিভিন্ন কাজে পাণ্ডবদের দ্বাররক্ষক হিসাবে সাহায্য করিয়াছেন তাহাদের মধ্যে বঙ্গ, কলিঙ্গ, মগধ তাম্রলিপ্ত প্রভৃতির নামের উল্লেখ আছে। ইহারা এই যজ্ঞে দণ্ডায়মান হইয়া রাজার আজ্ঞানুসারে কাজ করিবার জন্য প্রতীক্ষা করিয়াছিলেন। ইহাদের সম্পর্কে আরো বলা হইয়াছে ইহারা ছিলেন প্রত্যেকেই সুশিক্ষিত, পর্বতপ্রতিম এবং কবচাবৃত এবং তাহারা সহস্র হস্তী উপহারস্বরূপ পাণ্ডবদের দান করিয়া যজ্ঞের দ্বারে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

এই মহাকাব্যে ভীষ্মপর্বে অন্ধ নরপতি ধৃতরাষ্ট্রের নিকট সঞ্জয় ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের পুণ্য নদীসমূহের নাম প্রসঙ্গে তাম্রলিপ্তের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। মহাভারতের 'দ্রোণপর্বে' পরশুরামের' সহিত বিভিন্ন রাজাদের যুদ্ধ প্রসঙ্গে ও অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ ও তাম্রলিপ্তের কথা বলা হইয়াছে।

মহাভারতের 'কর্ণপর্বে' এক যুদ্ধের বর্ণনা আছে। এই বর্ণনায় বলা হইয়াছে হস্তীযুদ্ধে বিশারদ প্রাচ্য, দাক্ষিণাত্য এবং অঙ্গ, বঙ্গ, পুণ্ড্র, মগধ, তাম্রলিপ্ত, কলিঙ্গ ও অন্যান্য দেশীয় বীরগণ একত্রে মিলিত হইয়া দুর্যোধনের সৈন্যদের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। এই যুদ্ধে নকুলকে পরাজিত করিবার উদ্দেশ্যে একদল সৈন্য প্রেরণ করা হইলে তাহাদের সহিত উৎকল, কলিঙ্গ ও তাম্রলিপ্ত দেশীয় বীরগণ অসংখ্য শর বর্ষণ করিয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে অঙ্গরাজ সেনানায়ক হইলে বঙ্গ, পুণ্ড্র, তাম্রলিপ্ত দেশীয় বীরগণ ভয়ানক যুদ্ধ করিয়াছিলেন। এই যুদ্ধে তাম্রলিপ্তের অধিপতি নকুল ধৃষ্টদ্যুম্ন কর্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন।

জৈমিনী মহাভারতে 'অশ্বমেধ পর্বে' একটি কাহিনীর বর্ণনা আছে। তাহাতে দেখা যায় অশ্বমেধ যজ্ঞের ঘোড়াকে কেন্দ্র করিয়া অর্জুন প্রভৃতির সহিত তাম্রলিপ্তের অধিপতি ময়ূরধ্বজের পুত্র তাম্রধ্বজের ঘোরতর যুদ্ধ হইয়াছিল। এই যুদ্ধে মহাবীর তাম্রধ্বজের নিকট নাকি সকলে একে একে পরাজিত হন। এমনকি কৃষ্ণার্জুন পর্যন্ত মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন। ময়ূরধ্বজ কৃষ্ণার্জুনকে অপমান করিবার জন্য পুত্রকে ভৎর্সনা করেন। কৃষ্ণপ্রেমিক রাজা দেবতার জন্য শেষ পর্যন্ত আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন। এই আত্মোৎসর্গে মুগ্ধ হইয়া ময়ূরধ্বজ নরপতিকে কৃষ্ণ নাকি নরনারায়ণরূপে দেখা দিয়াছিলেন। এই রকম একটি কাহিনী কাশীরাম দাসের মহাভারতে রত্নাবতীপুরে ঘটিয়াছিল বলিয়া উল্লেখ আছে। স্যার উইলিয়াম হাণ্টার কাশীরাম দাসের উল্লিখিত রত্নাবতীপুর তমলুকের কোথাও বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু মূল সংস্কৃত মহাভারতে এবং পরবর্তীকালে কালি-প্রসন্ন সিংহের মহাভারতে কোথাও এই স্থানের উল্লেখ পাওয়া যায় নাই।

সুতরাং জৈমিনী ও কাশীরাম দাসের মহাভারতে উল্লিখিত রত্নাবতীপুর নর্মদার নিকট বিলাসাপুরের উত্তরে রত্ননগর বা রত্নাবতীপুর বলিয়া মনে করেন। কিন্তু বর্তমান তমলুকের প্রাচীন রাজাদের বংশাবলীর তালিকায় প্রথম রাজার নাম ময়ূরধ্বজ এবং তাহার পুত্রের নাম তাম্রধ্বজ দেখা যায়। উপরন্তু এখানে জিষ্ণু-হরি নামের দেবতাদ্বয়ের একটি মন্দির আছে। এইজন্য এখানকার স্থানীয় অধি-বাসীদের মনে এই রাজবংশের সহিত মহাভারতের ঐ কাহিনীর সম্পর্ক আছে বলিয়া বহুদিন ধরিয়া একটি কল্পনা ও বিশ্বাস প্রচলিত আছে। কিন্তু এই বিশ্বাসের মূলে কোন ঐতিহাসিক সত্যতা আছে বলিয়া মনে হয় না।

আরও পরবর্তীকালে বিভিন্ন শাস্ত্র হইতে তথ্য উদ্ঘাটন করিয়া কেহ কেহ দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে প্রাচীনকালে দ্বারকায় এক সভায় উপস্থিত হইয়া অর্জুন কৃষ্ণকে কোন্ স্থান তাহার অতিশয় প্রিয় তাহা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি 'তমোলিপ্ত' বা 'তাম্রলিপ্তের' কথা বলিয়াছিলেন। তিনি উত্তরে যাহা বলিয়াছেন তাহার সারাংশ হইল কালে কালে যুগে যুগে অন্যসব তীর্থ পরিত্যাগ করিলেও 'তমোলিপ্ত' বা 'তাম্রলিপ্তকে' তিনি পরিত্যাগ কখনও করিবেন না। এই কাহিনীটি বিশ্বকোষ গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে উল্লিখিত হইয়াছে।

মহাভারতের বিভিন্ন পর্বে তাম্রলিপ্তের উল্লেখ সেই যুগে তাম্রলিপ্ত নগর যে বিশেষ প্রতিপত্তিশালী ছিল তাহাই প্রমাণ করে। দ্রৌপদীর স্বয়ংবর সভায় লক্ষ্যভেদ উদ্দেশ্যে গমন, রাজসূয় যজ্ঞে নিমন্ত্রিত হইয়া হস্তিনাপুরে যাত্রা এবং তথায় সুশিক্ষিত, সুসজ্জিত সহস্র হস্তী প্রদান এবং পাণ্ডবদের সহিত যুদ্ধ তাম্র-লিপ্তের নরপতির পক্ষে কম গৌরবের পরিচায়ক নহে।

মহাভারতের যুগ তথা কুরুক্ষেত্রের কাল সম্বন্ধে এদেশ এবং বিদেশে নানা মতবাদ প্রচলিত আছে। এই মতবাদের মধ্যে কোন্‌টি সঠিক তাহা বলা মুশকিল। তবে বিভিন্ন আলোচনা হইতে একথা মনে করা হয় যে খ্রীষ্টের জন্মের বহুশতবর্ষ আগে তাহা ঘটিয়াছিল। দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাসের প্রাচীনত্ব নির্ণয় প্রসঙ্গে তাম্রলিপ্তের উল্লেখ বারেবারে থাকায় মহাভারতের কাল সম্পর্কে সঠিক কিছু নির্ণয় করিতে পারিলে খুবই ভাল হইত সন্দেহ নাই। কিন্তু বর্তমান প্রসঙ্গে ইহা খ্রীষ্টজন্মের পূর্বেকার কোন একসময়ের কাহিনী এই তথ্যের উপরই নির্ভর করিতে হইবে।

পৌরাণিক কাব্য

ইতিহাসের ক্রম অনুসারে মহাভারতের পর জৈন ও বৌদ্ধ শাস্ত্রে (আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দী) দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গে কোথাও উল্লেখ আছে কিনা সন্ধান

করা যুক্তিসঙ্গত ছিল। কিন্তু ঘটনার পারম্পর্য অনুসরণ করিলে জনমানসে মহাভারতের পরে পুরাণের কথাই মনে হয়। সেইজন্য প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্রের মধ্যে তথ্যানুসন্ধানের জন্য মহাভারতের পরেই পুরাণের কথা (আনুমানিক খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতক হইতে যাহার আরম্ভ) উল্লিখিত হইল।

মার্কণ্ডেয় পুরাণ, শাস্ত্রীয় গ্রন্থে এবং অন্যান্য প্রাচীন পুস্তকেও তাম্রলিপ্তের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু ব্রহ্ম পুরাণে এই স্থানের বিশেষভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে।

মহাদেব রাজা দক্ষের যজ্ঞ বিনষ্ট করিয়া তাহাকে হত্যা করিয়াছিলেন। এই ব্রহ্ম হত্যার জন্য দক্ষের ছিন্নমস্তক মহাদেবের হাতে আটকাইয়া যায়। এই বিপদ হইতে মুক্ত হইবার জন্য মহাদেব দেবতাদের পরামর্শে বিভিন্ন তীর্থ পরিভ্রমণ করিয়া বিফল মনোরথ হন। সেই সময় তিনি উপায়ন্তর না দেখিয়া ভগবান বিষ্ণুর স্মরণাপন্ন হইলেন। বিষ্ণু তখন নাকি তাহাকে ভারতবর্ষের দক্ষিণে 'তমোলিপ্ত' নামক মহাতীর্থে গমন করিয়া সেখানকার পবিত্রকুণ্ডে স্নান করিতে পরামর্শ দেন। এইভাবে তিনি তাম্রলিপ্তে আসেন এবং পবিত্রকুণ্ডে স্নান করিয়া দক্ষের ছিন্নমুণ্ডের হাত হইতে রক্ষা পান। ব্রহ্মপুরাণে এই কাহিনী অনুসারে যে ক্ষুদ্রকুণ্ডে মহাদেব স্নান করিয়াছিলেন তাহা কপালমোচন নামে অভিহিত হইতে থাকে এবং তাম্রলিপ্ত ভারতবর্ষের একটি প্রধান তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হয়। ইহাতে আরো উল্লেখ আছে, মহাদেব নাকি বলিয়াছিলেন তাম্রলিপ্ত অপেক্ষা কোন যুগেই অন্য কোন তীর্থই শ্রেষ্ঠ নয়। এখানে স্নান করিয়া বর্গভীমার দর্শন করিলে নাকি পুনর্জন্ম হয় না।

বর্গভীমার উল্লেখ হইতে বোঝা যায় এই কাহিনীটির রচনা বহু পরবর্তী যুগের। কারণ বর্গভীমার অস্তিত্ব খুব প্রাচীনকালের নহে। এই কাহিনীতে বর্ণিত কপালমোচন কুণ্ডটি এবং তাহার নিকটবর্তী প্রাচীন বিষ্ণুনারায়ণের মন্দিরটি বহুদিন আগে রূপনারায়ণের গর্ভে চলিয়া গিয়াছে। তথাপি আধুনিক কালেও বর্গভীমা মন্দির ও তৎপার্শ্বস্থ কুণ্ডকে অবলম্বন করিয়া প্রতিবৎসর মকর সংক্রান্তিতে বিরাট মেলা বসিয়া থাকে। একথা মনে রাখা আবশ্যক, কপাল-মোচন এই কাহিনীর সহিত সম্পর্কিত ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলেও অনেকগুলি তীর্থের অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। তাম্রলিপ্ত সম্পর্কীয় কাহিনীটি শুধু ব্রহ্ম পুরাণে পাওয়া যায়। বায়ু পুরাণ ও তাম্রলিপ্তের উল্লেখ পাওয়া যায়।

শ্রীপদ্মপুরাণে ভারতবর্ষের বর্ণনা প্রসঙ্গে তাম্রলিপ্তের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ পদ্মপুরাণে পূর্বদেশের বর্ণনায় অঙ্গ, বঙ্গ, সুহ্ম এবং প্রাগ্‌জ্যোতিষ,

পুণ্ড্র ও বিদেহের সহিত তাম্রলিপ্তের উল্লেখ আছে। ইহা ছাড়া এই পুস্তকে মগধ, পাঞ্চল, বঙ্গের সহিত তাম্রলিপ্তের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। মার্কণ্ডেয় পুরাণে পূর্বদেশ বর্ণনা প্রসঙ্গে এবং কূর্মরূপী ভগবান কোন্ কোন্ দেশে অবস্থিত থাকেন তাহার বিবরণ প্রসঙ্গে ও বিভিন্ন দেশের নামের সহিত যথা, বঙ্গ, বিদেহ মগধ, প্রাগ্‌জ্যোতিষ প্রভৃতির সহিত তাম্রলিপ্তের কথা বিশেষভাবে লিখিত আছে।

শ্রীমৎ বরাহমিহির আচার্যের বৃহৎ সংহিতাতে যে সব নামের উল্লেখ আছে তাহার মধ্যে বঙ্গ, কোশল, গিরিব্রজ, মগধ, পুণ্ড্র, মিথিলার সহিত তাম্রলিপ্তের নামও দেখা যায়। ইহার উল্লেখ বৃহৎ সংহিতার অন্যত্রও আছে।[২]

জৈন, বৌদ্ধ ও অন্যান্য সাহিত্যের বর্ণনায় তাম্রলিপ্ত

মহাভারত, পুরাণ, সংহিতা প্রভৃতি বিভিন্ন জায়গায় তাম্রলিপ্তের উল্লেখ থাকিলেও হান্টারের মতে বৌদ্ধযুগ হইতে তাম্রলিপ্তের প্রথম নির্ভরযোগ্য বিবরণ পাওয়া যায় (Hunter, History of Orissa, P-309)। তিনি মনে করেন তাম্রলিপ্ত যে বৌদ্ধযুগে একটি বন্দর নগরী ছিল তাহার নিদর্শন আধুনিক যুগেও পাওয়া গিয়াছে। মহাকবি কালিদাসের কাব্যে রঘুর দিগ্বিজয় বর্ণনায় চতুর্থ স্বর্গে একজায়গায় আছে মহারাজ রঘু সৈন্যসহ পূর্বসাগরে তালবন সমাচ্ছন্ন উপকণ্ঠে উপস্থিত হইলে সেখানে তাহাকে বঙ্গীয় নরপতিগণ রণতরীসহ বাধাদান করেন। রঘু তাহাদিগকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া হস্তীর দ্বারা রচিত সেতুর সাহায্যে কপিশা নদী অতিক্রম করিয়া কলিঙ্গ, উৎকলদেশ অভিমুখে যাত্রা করেন। এই বর্ণনায় তাম্রলিপ্তের নাম উল্লেখ না থাকিলেও অনেকে মনে করেন তিনি তাম্রলিপ্তে আসিয়াছিলেন। কারণ এই তাম্রলিপ্তের একদিকে গঙ্গা, অন্যদিকে সমুদ্র এবং আর একদিকে কপিশা বা কাঁসাই নদী যাহা অতিক্রম করিলে তবেই কলিঙ্গ বা উৎকলদেশে যাওয়া যায়।

সাহিত্যের মাধ্যমে যে তথ্য পাওয়া যায় বৈদিক সাহিত্য, পৌরাণিক সাহিত্য, সূত্রাবলী এবং ব্রাহ্মণ ও অব্রাহ্মণ সাহিত্যে তথ্যাবলীর ক্রমানুসরণের ধারা নির্ণয় করা খুবই কঠিন। তবে ঐতিহাসিকেরা সঠিক তারিখ যুক্ত কোন ঘটনার সহিত তুলনামূলকভাবে এই সমস্ত কাহিনীর আনুমানিক সময়কাল নির্ণয় করার চেষ্টা চিরকালই করিয়া থাকেন। তাম্রলিপ্ত সম্বন্ধেও এই একই পদ্ধতির সাহায্যে তাহার ইতিহাসের প্রাচীনত্বের পর্যায়ক্রম সম্বন্ধে একটি সময়কাল নির্ণয়ের চেষ্টা হইয়াছে।

আলেকজাণ্ডারের আক্রমণের সমসাময়িক কালে যে সমস্ত গ্রীক ঐতিহাসিক এদেশে আসিয়াছিলেন তাহাদের কাহিনী হইতে প্রথম কিছু তথ্য পাওয়া যায়। এ প্রসঙ্গে খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে প্লিনি, দ্বিতীয় শতকে টলেমী, পেরিপ্লাস, অজ্ঞাতনামা একজন গ্রীকলেখক ও নাগার্জুনকোণ্ডার লিপির উল্লেখ স্মরণীয়। টলেমী গঙ্গানদীর মোহনায় নদীধারায় পাঁচটি মুখের সৃষ্টি হইয়াছিল বলিয়াছেন। তাহাদের যথার্থ পরিচয় সঠিকভাবে বলা সম্ভর ময়। তবে ডঃ এইচ, সি, রায়-চৌধুরীর মতে প্লিনির গ্রন্থে উল্লিখিত পাঁচটির একটির নাম ছিল কম্বিসন, যাহা পূর্ব পশ্চিমগামী। তাহার মতে এই কম্বিসনই কালিদাস উল্লিখিত সংস্কৃত কপিসা, যাহা আধুনিক কাঁসাই এবং রূপনারায়ণের ন্যায় মেদিনীপুরের মধ্য দিয়া প্রবাহিত।

প্রজ্ঞাপন নামক জৈন উপাঙ্গে তাম্রলিপ্তকে একটি সমৃদ্ধ নগরী বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। কিন্তু অন্যান্য প্রাচীন সাহিত্যে তাম্রলিপ্তকে একটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র অঞ্চল বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। মনে হয় পাল ও সেন যুগে বঙ্গদেশের আয়তন জৈনদের প্রজ্ঞাপন এবং কালিদাসের রঘুবংশের আমলে উল্লিখিত আয়তন অপেক্ষা অনেক ছোট ছিল। এই জৈন কল্পসূত্রে বর্ধমান মহাবীরের রাঢ় দেশে অগমনের কাহিনী আছে। তিনি দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গে আসিয়াছিলেন কিনা তাহার সঠিক খবর পাওয়া যায় না। তবে অধ্যাপক পরেশ দাসগুপ্তের মতে জৈন ঐতিহ্যের বলে মহাবীরের বহু পূর্বেকার ২৩তম জৈন তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথ নাকি তাম্রলিপ্তে আসিয়াছিলেন। অন্য একটি জৈন কাহিনী অনুসারে 'কালকাচার্য' নামে একজন সুবর্ণদ্বীপ অভিমুখে তাম্রলিপ্ত হইতে জাহাজে যাত্রা করেন। পরবর্তীকালে জৈনদের অনেকগুলি সম্প্রদায়ের মধ্যে একটির নাম তাম্রলিপ্তিকা বলিয়া দেখিতে পাওয়া যায়। খুব স্বাভাবিক কারণে ইহা তাম্রলিপ্ত তথা দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গে বিশেষ প্রসারলাভ করিয়াছিল ইহাই সকল ঐতি-হাসিকেরা মনে করেন। মৌর্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের সমসাময়িক কালে জৈন আচার্য ভদ্রবাহুর শিষ্য গোদাস কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত গোষ্ঠী পরবর্তীকালে যে চারটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয় তাহার একটির নাম তাম্রলিপ্তিকা। এই শাখাগুলি কাল্পনিক নহে তাহার প্রমাণ খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীর উৎকীর্ণ শিলালিপিতে ইহাদের উল্লেখ আছে।

হিউয়েন-সাঙ এর বর্ণনায় দিগম্বর জৈনদের প্রাধান্যের কথা বলা হইয়াছে। মনে হয় তাহার পরবর্তীকালে জৈন্যদের প্রভাব হ্রাস পায়। তবে ইহা যে একেবারে লুপ্ত হয় নাই তাহা দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন অঞ্চলে প্রাপ্ত বহু জৈন মূর্তি হইতে প্রমাণিত হয়।

মনে হয়, সম্রাট অশোকের সময় দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গে বৌদ্ধ ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার পূর্বে এদেশে প্রচারিত হইলেও সে বিষয়ে সঠিক খবর পাওয়া যায় নাই। খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয়-তৃতীয় শতাব্দীর নাগার্জুনকোণ্ডা শিলালিপিতে যে সমস্ত দেশ সিংহলী বৌদ্ধ সন্তদের দ্বারা বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিল তাহাদের মধ্যে বঙ্গদেশের নাম প্রথম পাওয়া যায়। মনে হয় পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যে বঙ্গদেশ বৌদ্ধধর্মের একটি প্রধান কেন্দ্রে রূপান্তরিত হয়। পঞ্চম শতাব্দীতে চীনদেশীয় পরিব্রাজক ফা-হিয়েনের বর্ণনায় দেখা যায় তখন তাম্রলিপ্ত নগরীতে ২২টি বৌদ্ধ-বিহার ছিল। তিনি সেখানে দুই বৎসর অতিবাহিত করিয়া বৌদ্ধ গ্রন্থ নকল ও বৌদ্ধ মূর্তির ছবি আঁকিয়া ছিলেন। তাম্রলিপ্তের প্রত্যেকটি বিহারেই অনেক ভিক্ষু বাস করিত বলিয়া তিনি উল্লেখ করিয়াছেন। বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে ষোড়শ স্থবিরের মত সম্মান আর কেহ লাভ করেন নাই। ভারতের মহাযান বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের অভ্যুত্থানের সঙ্গে খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে মহাযান-স্থবির পূজার প্রথম সূত্রপাত হয়। তখন হইতে ভারতের বৌদ্ধ বিহারে এই ষোড়শ স্থবিরের পূজা হইত। তাম্রলিপ্তের বৌদ্ধ বিহারগুলিতে, নিশ্চয়ই ষোড়শ স্থবিরের অন্যতম বাঙ্গালী 'কালিক'-এর নিত্যপূজা হইত ইহা অনুমান করা যাইতে পারে। বৌদ্ধ স্থবিরে 'কালিক' তাম্রলিপ্তবাসী বলিয়া তমলুকের অধিবাসীদের বিশেষ গৌরব শুধু নয় তিনি বঙ্গ ও বাঙালীদের গৌরবও বটে।[৩]

ফা-হিয়েনের প্রায় দুইশত পঁচিশ বৎসর পরে চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন-সাঙ মগধ হইতে বঙ্গদেশে আসেন (৬৩৮-৩৯ খ্রীঃ)। তিনি পুণ্ড্র, সমতট, কর্ণসুবর্ণ, তাম্রলিপ্ত বঙ্গের এই চারটি জনপদে ৭০টির বেশী বৌদ্ধবিহার দেখিয়াছিলেন। তাম্রলিপ্তে তিনি ১০টি বিহার দেখিয়াছিলেন এবং বিহারগুলিতে ১০০০ মত বৌদ্ধশ্রমন বাস করিতেন বলিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে তিন-চতুর্থাংশ ছিলেন হীনযান পন্থী আর এক-চতুর্থাংশ ছিলেন মহাযান পন্থী। তাম্রলিপ্তে উভয় সম্প্রদায়ের বৌদ্ধই বাস করিতেন। তিনি তাম্রলিপ্তে একটি অশোকস্তম্ভও দেখিতে পাইয়াছিলেন।

তাম্রলিপ্ত সম্পর্কে আরও চীনদেশীয় বিবরণ পাওয়া যায়। প্রা-চেং-টেং নামক একজন বৌদ্ধ পরিব্রাজক ও শিক্ষার্থী তাম্রলিপ্তে দীর্ঘ ১২ বৎসর সংস্কৃত শিক্ষা লাভ করিয়া ঐ ভাষায় সমস্ত বৌদ্ধশাস্ত্র গ্রন্থ আলোচনা করিয়াছিলেন। তিনি চীনে ফিরিয়া গিয়া উল্লঙ্গের রচিত 'নিদান' শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। তাওলিন নামক আর একজন চৈনিক বিদ্যার্থী এই তাম্রলিপ্তে তিন বৎসর

ব্যাকরণ ও বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া কাটাইয়া ছিলেন। তিনি বৌদ্ধধর্মের সর্বাস্তিবাদী শাখার অনুগামী ছিলেন।

বিখ্যাত অপর একজন চৈনিক পরিব্রাজক ইৎ-সিঙ ৬৭৩ খ্রীষ্টাব্দে তাম্রলিপ্তে আগমন করেন। তিনি এখানে পো-লো-হো-বিহারে বা বরাহ (?) বিহারে তাহার পূর্বে আগত চীনদেশীয় শিক্ষার্থী চা-তেং-তেন-এর সাক্ষাত পান। এইখানে তিনি সংস্কৃত ও ব্যাকরণ অধ্যয়ন করেন। ইৎ-সিংও সংস্কৃত শব্দবিদ্যার (ব্যাকরণ) অধ্যয়ন করেন এবং কমপক্ষে একটি সংস্কৃত শাস্ত্রগ্রন্থকে (নাগার্জুন বোধিসত্ব সুহৃল্লেখ) চীনা ভাষায় অনুবাদ করেন। এই বিখ্যাত পো-লো-হো বিহারে একজন অল্পবয়স্ক শ্রমন বাস করিতেন। তাহার নাম রাহুল মিত্র এবং তিনি তাম্রলিপ্তেরই অধিবাসী। রাহুল মিত্রের বয়স যখন ৩০ বৎসর তখনই তাহার পাণ্ডিত্যের খ্যাতি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। ইৎ-সিঙ বলিয়াছেন সারা ভারতে তাঁহার মত যশস্বী পণ্ডিত আর কেহ ছিল কিনা সন্দেহ। তাম্রলিপ্ত ও দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গে বৌদ্ধ সংস্কৃতির প্রভাব সপ্তম-অষ্টম শতাব্দী পর্যন্ত যে কতদূর ব্যাপক ছিল তাহা এই সমস্ত তথ্য হইতে জানা যায়।

খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে বুদ্ধদেবের একটি দন্ত তাম্রলিপ্ত হইতে সিংহলে পাঠানো হয়। একটি বৌদ্ধগ্রন্থ হইতে জানা যায় একজন বৌদ্ধশিষ্য বুদ্ধের চিতা হইতে এই দন্তটি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। যেখানে মন্দির নির্মাণ করিয়া ইহা রক্ষিত হয় তাহা দন্তপুর বা দন্তপুরী নামে খ্যাত। রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও নগেন্দ্রনাথ বসু মনে করেন দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান দাঁতনই প্রাচীন দন্তপুর। সিংহলীয় পালিভাষায় মহাবংশে (খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী) জানা যায় থেরোবাদী বৌদ্ধধর্মের এক মহাসম্মেলন উপলক্ষে বঙ্গদেশ হইতে অনেক প্রধান ব্যক্তিরা সিংহলে গমন করিয়াছিলেন। মহাবংশে যে কাহিনীর উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকে ঘটিয়াছিল বলিয়া বলা হইয়াছে। আরো একটি সিংহলী পালি কাহিনী গ্রন্থে (দীপবংশ) অন্য একটি ঘটনার উল্লেখ আছে। তাহাতে বলা হইয়াছে সিংহবাহু নামে একজন রাজার জ্যৈষ্ঠপুত্র পিতার বিরাগভাজন হওয়ায় জাহাজযোগে দলবল সহ তাম্রলিপ্ত হইতে সিংহল অভিমুখে যাত্রা করেন। সিংবাহুর এই পুত্রের নাম ছিল বিজয় সিংহ। তিনি বুদ্ধের পরিনির্বাণের দিন সিংহলে অবতরণ করিয়াছিলেন এবং সেখানে তিনি নাকি একটি সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। এই কাহিনীর মধ্যে ঐতিহাসিক সত্যতা বিশেষ কিছু নাই বলিয়াই প্রায় সকল ঐতিহাসিকেরা মনে করেন। তবে তাহারা মনে করেন যে এই কাহিনীর মধ্যে প্রাচীন যুগে

বঙ্গদেশ ও সিংহলের মধ্যে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ ছিল সেই ঐতিহ্যকেই স্মরণ করা হইয়াছে।[৪]

বন্দরনগরী তাম্রলিপ্ত

ইৎ-সিঙ-এর পরেও আরো কয়েকজন চৈনিক পরিব্রাজক ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাদের ভ্রমণ বৃত্তান্তে তাম্রলিপ্ত সম্পর্কে বিশেষ কিছু পাওয়া যায় নাই। তবে তাহারা কোন্ পথে কিভাবে তাম্রলিপ্তে আসিয়াছিলেন সে সব বর্ণনা হইতে সে যুগের বন্দর নগরী তাম্রলিপ্ত সম্পর্কে একটা ধারণা পাওয়া যায়। এইসব পর্যটকদের মধ্যে তাওলিং তাং-চেং-তেং হুইলুন, য়ু-হিং-চেং-কং, চাং-মিং প্রভৃতি প্রসিদ্ধ। তাওলিং যবদ্বীপ ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের পথে তাম্রলিপ্তে আসিয়াছিলেন। তাং-চেং-তেং লঙ্কাদ্বীপ হইতে আসিয়া বরাহ বিহারে বাস করিয়াছিলেন। হুইলুং ও য়ু-হিং যথাক্রমে কোরিয়া ও লঙ্কাদ্বীপ হইতে তাম্রলিপ্তে আসিয়াছিলেন। তাহাদের বিবরণ হইতে তাম্রলিপ্তের সহিত বিভিন্ন দেশের যে যোগাযোগ ছিল সে সম্বন্ধে জানা যায়। পাল রাজাদের আমলে অনেক বৌদ্ধভিক্ষু চীনদেশে গিয়াছিলেন। মনে হয় ইহারা সকলেই জলপথে ভ্রমণ করিয়াছিলেন এবং সম্ভবত তাম্রলিপ্ত বন্দর হইতে যাত্রা করিয়াছিলেন।

খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতকে লিখিত দণ্ডীর 'দশকুমার চরিতে' মিত্রগুপ্তের কাহিনীতে অনেক যবন (বিদেশী) যাহাদের তাম্রলিপ্ত বন্দরে আগমনের কথা বলা হইয়াছে। হাজারীবাগ জেলায় দুধপানি গ্রামে একটি পাহাড়ের গায়ে অষ্টম শতাব্দীর একটি f পি পাওয়া গিয়াছে। মনে হয় ইহার রচনাকাল পাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার ঠিক পূর্ববর্তী সময়ে। এই লিপি অনুসারে অযোধ্যাবাসী তিন বণিক ভ্রাতা (উদয়মান, শ্রীধৌতমান এবং অজিতমান) তাম্রলিপ্তে আসিয়া বাণিজ্য করিয়া প্রভূত ধনশালী হইয়াছিলেন। অনেকে অবশ্য এই বিবরণটি একটি প্রাচীন কাহিনী বলিয়া মনে করেন। তবে পাল যুগে অনেক গ্রন্থে বহির্বাণিজ্যের কেন্দ্র হিসাবে তাম্রলিপ্তের নাম বারবার উল্লেখ আছে। যেমন একাদশ শতাব্দীতে রচিত পণ্ডিত সোমদেবের রচিত 'কথাসরিৎ সাগর' এইরূপ একটি গ্রন্থ। এই গ্রন্থের কাহিনী সমূহ প্রাচীন কবি গুণাঢ্য রচিত 'বৃহৎ কথা-সঙ্গবিলুপ্ত' কাব্য হইতে গৃহীত। সুতরাং একাদশ শতাব্দীতে বন্দর হিসাবে তাম্রলিপ্ত কতটা বর্ধিষ্ণু ছিল তাহা এই কাহিনীতে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় না। তবু অনেকে মনে করেন ওই সময়ে তাম্রলিপ্ত বন্দরের অতীত গৌরব অনেকটা হ্রাস পাইলেও তাহা একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই।[৫]

বাণিজ্য কেন্দ্র হিসাবে তাম্রলিপ্ত

প্রাচীন বঙ্গের স্থলপথে বাণিজ্যের বিবরণ অতি অল্পেই পাওয়া যায়। বিদেশী পর্যটকদের বিবরণীতে, কিছু সমসাময়িক সাহিত্যে এবং শিলালিপিতে কয়েকটি সুদীর্ঘ পথের উল্লেখ ও ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ফা-হিয়েন, হিউয়েন-সাঙ, ইৎ-সিঙ-এর ভ্রমণ বৃত্তান্তে, কথাসরিৎ সাগর গ্রন্থে এবং জাতক গল্পে ও লিপিমালায় এই পথের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দেখিতে পাওয়া যায়। এই সব পথ ধরিয়াই বঙ্গদেশ হইতে প্রাচীনকালে ভারতবর্ষের অন্যান্য অংশে যাতায়াত করা সম্ভব ছিল। কথাসরিৎ সাগরে পুণ্ড্রবর্ধন হইতে পাটলীপুত্র পর্যন্ত একটি সুবিস্তৃত পথের উল্লেখ আছে। ইৎ-সিঙ তাম্রলিপ্ত হইতে বুদ্ধগয়া পর্যন্ত পশ্চিমাভিমুখী একটি পথের উল্লেখ করিয়াছেন। দুধপানি শিলালিপিতে অযোধ্যা হইতে তাম্রলিপ্ত পর্যন্ত সুদীর্ঘ পথের উল্লেখ আছে। হিউয়েন-সাঙ বারানসী, বৈশালী, পাটলীপুত্র, বুদ্ধগয়া, রাজগৃহ, নালন্দা, অঙ্গ, চম্পা হইয়া ক-জঙ্গলে গিয়াছিলেন। তিনি পুণ্ড্রবর্ধন হইতে একটি প্রশস্ত নদী অতিক্রম করিয়া আসাম যান। কামরূপ হইতে সমতট এবং সেখান হইতে তাম্রলিপ্তে আসেন। এই তাম্রলিপ্ত হইতে তিনি কর্ণসুবর্ণ হইয়া কলিঙ্গে গমন করেন। তাহার এই বিবরণীতে অন্তর্দেশীয় পথগুলির একটা স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। এই পথ তাহার আগমনের পূর্ব হইতে ছিল।

বহির্দেশীয় পথ

বঙ্গদেশ হইতে তিনটি প্রধান পথ পশ্চিম দিকে বিস্তৃত ছিল। একটি উত্তরবঙ্গ হইতে মিথিলা হইয়া পাটলীপুত্রের ভিতর দিয়া বুদ্ধগয়া স্পর্শ করিয়া বারানসী অযোধ্যা অতিক্রম করিয়া সিন্ধু ও গুজরাট বন্দর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। বিদ্যাপতির পুরুষ-পরীক্ষায় এই বাণিজ্য পথের উল্লেখ আছে। হিউয়েন-সাঙ-এর বিবরণ ও কথাসরিৎ-এর গ্রন্থে ইহার আভাস পাওয়া যাইবে।

দ্বিতীয় পথটি ছিল তাম্রলিপ্ত হইতে উত্তরাভিমুখী যাহা কর্ণসুবর্ণের মধ্যদিয়া রাজমহল-চম্পা স্পর্শ করিয়া পাটলীপুত্রের দিকে গিয়াছিল। এই পথটির কথা হিউয়েন-সাঙ-এর বর্ণনায় পাওয়া যায়।

তৃতীয় পথটি তাম্রলিপ্ত হইতে সোজা উত্তর-পশ্চিম অভিমুখে বুদ্ধগয়া হইয়া অযোধ্যা পর্যন্ত বিস্তৃত। ইহার বিবরণ ইৎ-সিঙ-এর ভ্রমণ কাহিনীতে ও দুধপানি শিলালিপিতে আছে। এই তিনটি পথ দিয়াই বঙ্গদেশের সহিত উত্তরভারতের বাণিজ্য, সামরিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ রক্ষিত হইত।

উত্তর পূর্বাভিমুখী পথ

বঙ্গদেশের পূর্বদিকে কামরূপ রাজ্য, উত্তরে চীন ও তিব্বত। উত্তরবঙ্গ ও কামরূপের ভিতর দিয়া বঙ্গদেশ চীন ও তিব্বতের সহিত বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ রক্ষা করিত। এই পথের বিবরণও হিউয়েন-সাঙ-এর বর্ণনায় পাওয়া যায়। মনে হয় মহম্মদ বখ্‌তিয়ার খিলজীর আসাম তিব্বত অভিযান সংক্রান্ত শিলালিপিতেও ইহার উল্লেখ আছে। এই পথ দুইটি খুবই সু-দীর্ঘ এবং এই পথদুইটির মধ্যদিয়া বঙ্গদেশের আমদানি রপ্তানি বাণিজ্য সাধিত হইত। কামরূপই কিন্তু পূর্বাভিমুখী পথের শেষ সীমানা নহে। হিউয়েন-সাঙ-এর অন্তত সাতশত বৎসর আগে চিং কিএং (খ্রীষ্টপূর্ব ১২৬) নামে এক চীন দেশীয় রাজদূতের বিবরণে দক্ষিণ-চীন হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তর ব্রহ্ম ও মনিপুরের ভিতরদিয়া কামরূপ হইতে আফগানিস্থান পর্যন্ত এক সুদীর্ঘ পথের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। কামরূপ হইতে তিব্বত পর্যন্ত একটি দুর্গম গিরিপথ ছিল এবিষয়ে সন্দেহের অবকাশ খুবই কম। কামরূপে আসিয়া এই দুর্গম পথই চিং কিএং কথিত চীন ভারত আফগানিস্থান সুদীর্ঘ পথের সহিত মিলিত হইত। মনে হয় এই দুর্গম পথ দিয়াই বৌদ্ধ পণ্ডিত ও পরিব্রাজকেরা এবং তিব্বতীয় রাষ্ট্রদূতেরা মগধ, তাম্রলিপ্ত প্রভৃতি অঞ্চলে যাতায়াত করিত।

অনেকে মনে করেন তিব্বতের সহিত ভারতবর্ষের যোগাযোগের আর একটি পার্বত্য পথ ছিল। এই পথ উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি অঞ্চল হইতে সিকিম ভূটান পার হইয়া হিমালয় গিরিপথের মধ্যদিয়া তিব্বত পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পেরিপ্লাস গ্রন্থে এই পথের উল্লেখ আছে। বঙ্গদেশ হইতে পূর্বাভিমুখী আর একটি স্থলপথ ছিল। এই পথটি পূর্ববঙ্গের ত্রিপুরা জেলার ময়নামতি অঞ্চল হইতে আরম্ভ করিয়া বর্তমান শ্রীহট্ট, শিলচর ও লুসাই পাহাড়ের মধ্যদিয়া মনিপুর ও ব্রহ্মদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই পথের ব্যবহার অবশ্য খুব বেশী প্রচলিত ছিল না।

তাম্রলিপ্ত এবং কর্ণসুবর্ণ হইতে সোজা দক্ষিণমুখী একটি পথ বঙ্গদেশকে সোজা দক্ষিণভারতের সহিত যুক্ত করিয়াছে। হিউয়েন-সাঙ এই পথ দিয়াই কর্ণসুবর্ণ হইতে ওড্র, কঙ্গোদ, কলিঙ্গ, দক্ষিণ কোশল, অন্ধ্র হইয়া দ্রাবিড়, চোল, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি দেশে গিয়াছিলেন। বঙ্গদেশের পাল ও সেন রাজারাও এই পথ দিয়া দক্ষিণ দেশ আক্রমণে অগ্রসর হইয়াছিলেন। পশ্চিম চালুক্যবংশীয় চোলরাজ রাজেন্দ্রচোল এবং পূর্ব গঙ্গ বংশের রাজা এই পথেই বঙ্গদেশ আক্রমণ

করিয়া ছিলেন। পরবর্তীকালে এই পথে চৈতন্যদেব নীলাচল হইয়া দক্ষিণ-ভারতে গিয়াছিলেন।

অন্তর্দেশীয় নদীপথ

শঙ্খজাতক, সমুদ্রবাণিজ্য জাতক, মহাযান জাতক ইত্যাদি গল্পে মধ্য-প্রদেশের বণিকের বারানসী-চম্পা হইতে জাহাজে করিয়া গঙ্গা, ভাগীরথী পথে তাম্রলিপ্তে আসিত। সেখান হইতে বঙ্গোপসাগর অতিক্রম করিয়া যাইত স্বর্ণভূমিতে (নিম্ন ব্রহ্ম দেশ)। মেগাস্থিনিসের বিবরণ হইতে স্ট্র্যাবো সম্ভবতঃ এই তথ্য আরোহন করিয়াছিলেন যে ভাগীরথী গঙ্গার উজানে বহিয়া সাগরমুখে বন্দর হইতে বাণিজ্যতরীগুলি প্রাচ্য ও পাটলীপুত্রের মধ্যে যাতায়াত করিত। নদীপথে গঙ্গা ভাগীরথী বাহিয়া বঙ্গদেশের সহিত উত্তর ভারতের যোগাযোগ ছিল। কামরূপ হইতে কর্ণস্বর্ণ পর্যন্ত এক জলপথের কথায়ও হিউএন-সাঙ-এর বিবরণ ও হর্ষবর্ধন, ভাস্কর বর্মার কাহিনী প্রসঙ্গে উল্লিখিত দেখা যায়। এই পথটি ঠিক কোথা দিয়া গিয়াছিল তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা কষ্টকর। তবে একথা অনুমেয় যে উত্তর আসামের বাণিজ্য সামগ্রী ব্রহ্মপুত্র, মেঘনার সুর্মা বাহিয়াই বঙ্গদেশে আসিত। নদীমাতৃক বঙ্গদেশে খুব স্বাভাবিক কারণেই স্থলপথ অপেক্ষা নদীপথেই অধিকতর পরিমাণে বাণিজ্য চালিত হইত।

বহির্দেশীয় সমুদ্রপথ

প্রাচীন বঙ্গদেশের সামুদ্রিক বাণিজ্য এবং বাণিজ্য পথের সংবাদ অনেক বেশী পাওয়া যায়। জাতকের গল্পে সিংহল ও সুবর্ণদ্বীপ যাত্রার কথা আছে। সিংহলী দ্বীপবংশ ও মহাবংশের উল্লিখিত বিজয়সিং কর্তৃক সমুদ্র পথে সিংহল গমন ও তাহা অধিকার করার কাহিনী খুবই পরিচিত। এই কাহিনীর লাঢ় দেশ অর্থাৎ প্রাচীন বঙ্গদেশের রাঢ় জনপদ অথবা প্রাচীন গুজরাটের লাচ দেশ ইহা লইয়া ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ আছে। ফা-হিয়েন তাম্রলিপ্ত হইতে এক বাণিজ্য জাহাজে করিয়া এই পথেই ১৪ দিন ও ১৪ রাত্রি অতিক্রম করিবার পর সিংহলে উপনিত হইয়াছিলেন। তাহার পর হইতে বহু চীনদেশীয় বৌদ্ধ পরিব্রাজক এই পথেই সিংহল ও বঙ্গদেশে যাতায়াত করিতেন। ইৎ-সিঙ এর সময়েও অসংখ্য বৌদ্ধ শ্রমণ সিংহল হইতে বঙ্গদেশে এবং বঙ্গদেশ হইতে সিংহলে এই সমুদ্র পথে যাতায়াত করিয়াছিলেন।

তাম্রলিপ্ত, আরাকান, যবদ্বীপ, মালয়, ব্রহ্ম এবং সুবর্ণদ্বীপ পথ

তাম্রলিপ্ত হইতে নিম্ন ব্রহ্মদেশ বা সুবর্ণভূমি পথের ইঙ্গিত খ্রীষ্টীয় চতুর্থ-পঞ্চম শতকে মহাজাতকের গল্পে পাওয়া গিয়াছে। এই পথ সম্ভবতঃ চট্টগ্রাম ও আরাকানের সমুদ্র উপকূলে বাহিয়া গিয়াছিল। ইৎ-সিঙ-এর বর্ণনায় আছে সপ্তম শতকে হিউ-এন-তা নামে একজন চৈনিক পরিব্রাজক মালয় উপদ্বীপ হইতে তাম্রলিপ্তে আসিয়াছিলেন।

ভৌগোলিক ও জ্যোতির্বিদ টলেমী অন্য আর একটি সামুদ্রিক পথেরও সংবাদ দিয়াছেন। তাম্রলিপ্ত হইতে যাত্রা করিয়া এই পথের জাহাজগুলি সোজা আসিত উড়িষ্যাদেশে পলৌড়া বন্দরে (Palura) এবং সেখান হইতে কোনাকুনি বঙ্গোপসাগরে পাড়ি দিয়া যাইত মালয়, যবদ্বীপ, সুমাত্রা বন্দরগুলিতে।[৬]

'দশকুমারচরিতে' বিবৃত মিত্রগুপ্তের কাহিনীতে তাম্রলিপ্ত বন্দর প্রসঙ্গে বৈচিত্র্যময় ঘটনা পরম্পরায় যবন পরিচালিত সমুদ্র তরণীর উল্লেখ আছে। বঙ্গোপসাগর অতিক্রান্ত যবন অথবা হেলনীর (অথবা গ্রেকো রোমান ?) বাণিজ্যতরীর এই উল্লেখ প্রকৃতই চিত্তাকর্ষক। আজ হইতে প্রায় দুই হাজার বৎসর পূর্বে তাম্রলিপ্ত তথা দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গের নিম্নগাঙ্গেয় উপত্যকা ভূমধ্য-সাগরীয় নাবিকদের নিকট যে পরিচিত ছিল, এই কাহিনী পাঠ করিলে সে বিষয়ে সন্দেহ থাকে না।

"গাঙ্গে" নামক বন্দরটির সহিত তাম্রলিপ্তের অভিন্নতা সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন উঠিলেও ইহা যে গঙ্গার মোহনার নিকটবর্তী ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। এই 'গাঙ্গে' কে কেন্দ্র করিয়া বিদেশী বর্ণনার (প্লুটার্ক, ভার্জিল, ভ্যালেরিয়াস, ফ্লাক্কাস্ ও অন্যান্য লেখকদের) অতীত বঙ্গদেশের নানা নির্ভীক দুঃসাহসী সমুদ্র যাত্রার ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠার উল্লেখ স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। এই বাণিজ্যিক সমৃদ্ধির সহিত কোন না কোন সূত্রে বন্দর তাম্রলিপ্তের অবিচ্ছিন্ন যোগাযোগ ছিল ইহা সহজে অনুমান করা যায়।

'দশকুমারচরিতে'র কাহিনীতে পরিষ্কারভাবে বোঝা যায় তাম্রলিপ্ত বন্দর তখন পূর্বদিকে সিংহল, যাভা ও চীন এবং পশ্চিমদিকে গ্রীস ও রোমের সহিত বাণিজ্যিক যোগাযোগের কেন্দ্রস্বরূপ ছিল। ইহাতে দেখা যায় তাম্রলিপ্ত বন্দর হইতে দীর্ঘদিন পর্যন্ত পণ্য ও যাত্রীদল সুদূর মালয়দ্বীপে যাতায়াত করিত। দুধপানি শিলালিপিতে অযোধ্যা হইতে তাম্রলিপ্তে আসিয়া ব্যবসা করিবার কথা উল্লেখ আছে। অর্থাৎ অষ্টম শতাব্দী পর্যন্ত বাণিজ্য কেন্দ্র হিসাবে তাম্রলিপ্তের উল্লেখ বহুবার দেখিতে পাওয়া যায়। তবে একথা সত্য যে অষ্টম শতাব্দীর

পরবর্তীকাল হইতে তাম্রলিপ্ত বন্দরে ক্রমশ বাণিজ্যিক আদান-প্রদান হ্রাস পাইতে থাকে। তাহার কারণ সম্ভবতঃ নদীমুখে তখন ধীরে ধীরে পলি জমিয়া নদীর নাব্যতা কমিয়া গিয়াছিল। সম্ভবতঃ নবম শতাব্দী হইতে বৃহৎ বাণিজ্য-পোতগুলি তাম্রলিপ্তের অগভীর পোতাশ্রয়ে প্রবেশ করিতে পারিত না। অর্থাৎ তখন বন্দরটি ক্রমে দূরে সরিয়া যাইতেছিল, যদিও তখন তাহার প্রাচীন নাম অব্যাহত ছিল। সম্ভবতঃ একাদশ শতক পর্যন্ত তাম্রলিপ্ত বন্দর ধ্বংসের সম্মুখীন হইলেও একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই। তাম্রলিপ্ত বন্দরের পতন এবং পরবর্তীকালে বন্দর হিসাবে সপ্তগ্রামের মধ্যবর্তী সময়কালে দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গের জলপথে বাণিজ্য চলাচলের প্রকৃত ইতিহাস এখনও অজ্ঞাত।

মেদিনীপুরের গেজিটিয়ার প্রণেতা O'Mally লিখিয়াছেন খ্রীষ্টীয় অষ্টম ও নবম শতাব্দীর পরে আর তাম্রলিপ্তের উল্লেখ পাওয়া যায় না (District Gazetteer, Page 220)। কিন্তু পেগু (বর্মা) অঞ্চলের একটি গ্রামে একটি শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহাতে দেখা যায় খ্রীষ্টের জন্মের ১২-১৩ শত বৎসর পরেও তাম্রলিপ্ত হইতে বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ ঐখানে গিয়া ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় মেদিনীপুর সাহিত্য পরিষদে এক অভিভাষণে ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। মেজর উলবারফোর্স লিখিয়াছেন যে খ্রীষ্টীয় ১০০১ অব্দে তাম্রলিপ্তের একজন রাজা ঐ বন্দর হইতে চীন দেশে দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। ইহাতে আকস্মিক বা হঠাৎ যে তাম্রলিপ্ত বন্দরের পতন ঘটে নাই এইরূপ অনুমান করা সঙ্গত মনে হয়।

তাম্রলিপ্তের রাষ্ট্রীয় পট পরিবর্তন

মহাভারতে ভীষ্মের দিগ্বিজয় প্রসঙ্গে প্রথম তাম্রলিপ্তের উল্লেখ পাওয়া যায়। পুরাণে এই জনপদটির বহুবার উল্লেখ দেখা যায়। বঙ্গ, কর্বট ও সুহ্ম ছিল তাম্রলিপ্তের প্রতিবেশী রাজ্য। জৈনকল্প সূত্র গ্রন্থে গোদাসগন নামাঙ্কিত জৈন সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের অন্যতম শাখার নাম ছিল তাম্রলিপ্তিকা। জৈন প্রজ্ঞাপনা গ্রন্থেও তামলিত্তি (তাম্রলিপ্ত) বঙ্গ জনগণের অধিকার ভুক্ত ছিল বলিয়া উল্লেখ আছে। দশকুমারচরিত গ্রন্থে দামলিপ্ত (তাম্রলিপ্ত) সুহ্মের অন্তর্গত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। জাতকের গল্পেও বৌদ্ধগ্রন্থে সুবৃহৎ নৌবাণিজ্য কেন্দ্ররূপে তাম্রলিপ্তের উল্লেখ বারবার পাওয়া যায়। পেরিপ্লিস গ্রন্থে, টলেমীর বিবরণে, ফা-হিয়েন, হিউ-এন-সাঙ ও ইৎ-সিঙ-এর বর্ণনায় তাম্রলিপ্ত বন্দর সুপ্রসিদ্ধ। টলেমীর সময় তাম্রলিপ্ত জনগণের রাজধানী ছিল তাম্রলিপ্ত বন্দর। সপ্তম

শতকে হিউয়েন-সাঙ বলিয়াছেন তাম্রলিপ্ত বন্দর সমুদ্রের একটি উপবাহুর তীরে অবস্থিত ছিল। অষ্টম শতকের পর হইতে তাম্রলিপ্ত বন্দরের সমৃদ্ধি হ্রাস পায় এবং সম্ভবতঃ তাহার আগে সপ্তম শতক হইতে দণ্ডভুক্তির জনপদের নামেই তাম্রলিপ্ত জনপদের পরিচয়। মনে হয় এই সময় তাম্রলিপ্ত কিছুদিনের সুহ্ম জনপদের দ্বারা প্রভাবিত হয়। ষষ্ঠ-সপ্তম শতকে, বরাহমিহির তাম্রলিপ্ত জনপদকে গৌড়ক (মুর্শিদাবাদ, বীরভূম এবং সম্ভবতঃ পশ্চিম বর্ধমান ও মালদহ) এবং বর্ধমান হইতে পৃথক জনপদ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

সপ্তম শতকে দণ্ডভুক্তি দেশ গৌড় কর্ণসুবর্ণরাজ শশাঙ্কের অধিকার ভুক্ত হয়। শশাঙ্কের মেদিনীপুর লিপি দুইটি ও এগরা লিপি হইতে বোঝা যায় দণ্ডভুক্তির শাসন কর্তার (সামন্ত মহারাজ সোমদত্ত এবং মহাপ্রতীহার শুভকীর্তি) অধীন এবং তখন উৎকল দেশ এই রাষ্ট্রবিভাগে অন্তর্গত। দশম শতকের 'ইর্দা' লিপিতে দণ্ডভুক্তি মণ্ডলকে বর্ধমান ভুক্তির অন্তর্ভুক্ত দেখা যায়। একাদশ শতকের প্রথম পাদে রাজেন্দ্র চোলের তিরুমলৈ লিপিতে দণ্ডভুক্তি দক্ষিণ রাঢ় বাঙ্গালাদেশ ও উত্তর রাঢ় পৃথক জনপদ রাষ্ট্ররূপে উল্লিখিত হইয়াছে। দ্বাদশ শতকের মধ্যভাগে এই দণ্ডভুক্তি আবার বর্ধমান ভুক্তির অন্তর্ভুক্ত হয়। দণ্ডভুক্তির রাজা পালরাজ রামপালের অন্যতম বিশ্বস্ত বন্ধু ও সহায়ক ছিলেন।[৮]

তাম্রলিপ্তের প্রকৃতিক বর্ণনা ও অধিবাসীদের সম্পর্কে মন্তব্য

পরিব্রাজক হিউয়েন-সাঙ তাম্রলিপ্তের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন এখানকার ভূমি সমতল এবং বায়ু আর্দ্র ও উষ্ম, ফুল ফল শস্য প্রচুর জন্মে এবং দেশের প্রাকৃতিক পরিবেশ অত্যন্ত মনোরম। ইহা দেশের স্থল ও জলপথের সমন্বয় এবং সমুদ্রের খাঁড়ির উপর অবস্থিত। ইহাতে বোঝা যায় তিনি মেদিনীপুরের পূর্ব ও পূর্ব-দক্ষিণের কথা বলিয়াছেন পশ্চিম পার্বত্য অঞ্চলের কথা নহে।

হিউয়েন-সাঙ তাম্রলিপ্তের লোকের সম্পর্কে মন্তব্য করিয়াছেন যে ইহাদের আচার আচরণ ব্যবহার খুব রূঢ়। তাহারা খুব পরিশ্রমী ও সাহসী, কিন্তু চটপটে ও ব্যস্তবাগীশ। তিনি দেশের সর্বত্র বৌদ্ধ ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকের পাশাপাশি বাস করিতে দেখিয়াছেন। তাম্রলিপ্তে তিনি দশটি বৌদ্ধ বিহার দেখিয়াছিলেন সেক্ষেত্রে এখানেই তিনি পঞ্চাশটি দেব মন্দিরের অবস্থানের কথা বলিয়াছেন। ফা-হিয়েন তাহার সময় তাম্রলিপ্তে ২২টি বৌদ্ধ বিহার দেখিয়াছিলেন। তাহার বর্ণনায় কোথাও তাম্রলিপ্তের কোন হিন্দু মন্দির ছিল কিনা তাহার উল্লেখ নাই। তাহার অনেক পরে হিউয়েন-সাঙ যেখানে

তাম্রলিপ্তে ৫০টি মন্দির দেখিয়াছিলেন সেখানে ফা-হিয়েন এর যুগে মন্দির ছিল না একথা বিশ্বাসযোগ্য নয়। অথচ তাহার বর্ণনায় ইহাদের কোন উল্লেখ নাই। তাহার কারণ সম্বন্ধে এ কথাই মনে করা সঙ্গত যে তিনি অন্য ধর্মের প্রতি ততটা সহনশীল ছিলেন না। খুব স্বাভাবিক কারণে একথা মনে করা যাইতে পারে যে ফা-হিয়েনের পরবর্তী পরিব্রাজকদের ভ্রমণের মধ্যবর্তী সময়ে ১২টি বৌদ্ধ বিহার প্রাকৃতিক বা অন্যান্য কারণে বিলুপ্ত হইয়াছিল। যে হেতু বিলুপ্ত বৌদ্ধবিহারগুলির পুর্নগঠনের কোন চেষ্টা করা হয় নাই, তাহা হইতে অনেকে অনুমান করেন যে হিউয়েন-সাঙ-এর সময়ে এই অঞ্চলে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব হ্রাস পাইতে আরম্ভ করিয়াছিল। তাম্রলিপ্ত স্থলপথ জলপথের মিলন-স্থল হওয়াতে এখানকার অধিবাসীরা বেশ সমৃদ্ধশালী বলিয়া তিনি মন্তব্য করিয়াছেন। তাম্রলিপ্তের লোকেরা জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি অনুরাগী বলিয়াও হিউয়েন-সাঙ মন্তব্য করিয়াছেন।

হিউয়েন-সাঙ-এর বর্ণনায় অন্যত্র ৬৩৫ খ্রীষ্টাব্দে তাম্রলিপ্ত বন্দর সমুদ্রে প্লাবিত হওয়ার সংবাদ আছে। ইহা কিভাবে ঘটিয়াছিল সে সম্পর্কে স্পষ্টভাবে তিনি কিছু বলেন নাই। পরবর্তীকালেও এই অঞ্চলে এই ধরণের সমুদ্র প্লাবনের বর্ণনা পাওয়া যায় (১৭৩৭ ও ১৮৬৪ খ্রীঃ)।

৬৭৩ খ্রীষ্টাব্দে ইৎ-সিঙ তাম্রলিপ্তে আসিয়া একটি বরাহ মন্দির দেখিয়াছিলেন। ঐ মন্দিরে তখন হারিতী দেবীর পূজা হইত। পণ্ডিত বিল (Beal) এর বক্তব্য হইল চালুক্যগণ নিজেদের হারিতী দেবীর সন্তান বলিয়া পরিচয় দেন এবং তাহাদের জাতীয় চিহ্নও বরাহ মূর্তি। তাই তিনি মনে করেন তমলুকের প্রাচীন বরাহ মূর্তিটি চালুক্যবংশীয় কাহারো দ্বারা নির্মিত হইয়াছিল। হিউয়েন-সাঙ-এর বর্ণনায় ইহারও উল্লেখ নাই। সেজন্য মনে হয় ৬৩৫-৬৩৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যবর্তী কোন সময় ইহার প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। ইৎ-সিঙ তাম্রলিপ্তের বৌদ্ধ সংঘারামে যখন আসিয়া উপস্থিত হন, তখন এখানকার প্রধান সংঘারামের আচার্য ছিলেন সম্ভবতঃ দিবাকর মিত্র। তিনি এখানে আসিয়া আরো কয়েকজন চীনদেশীয় বৌদ্ধ শিক্ষার্থীর সাক্ষাত পাইয়াছিলেন। প্রায় এক বৎসর সংস্কৃত শিক্ষার পর ইৎ-সিঙ এই ভাষা অনেকটা আয়ত্ব করিতে পারিয়াছিলেন। ইৎ-সিঙ ভারতে আসিয়াছিলেন বৌদ্ধ ভিক্ষুদের জীবন চর্চা বিষয়ক শাস্ত্র বিনয়পিটক শিক্ষার জন্য। সেজন্য তিনি তাম্রলিপ্ত বিহারে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের আচার-আচরণ খুবই গভীরভাবে লক্ষ্য করিয়াছিলেন। ইৎ-সিঙ যাহার কাছে শিক্ষা লাভ করেন তিনি হইলেন তা-চেং-তেন। তিনি ইহাও

দেখিয়াছিলেন যে এখানকার বৌদ্ধবিহারগুলির নিয়মকানুন, চালচলন অন্যের অপেক্ষা অনেক স্বতন্ত্র। তাহার সবচেয়ে ভালো লাগিয়াছিল এখানকার সান্ধ্য উপাসনার পদ্ধতি।

সন্ধ্যাবেলা বৌদ্ধ ভিক্ষুরা দল বাঁধিয়া বিহার হইতে বাহিরে আসিয়া চৈত্য (স্তূপ) প্রদক্ষিণ করিয়া ধূপ-ধূনাসহ ফুল ছড়াইয়া দিতেন। তাহার পর সমবেত কণ্ঠে বুদ্ধদেবের গুণমহিমা কীর্তন করিয়া স্তোত্রপাঠ হইত। ইহার পর তাহারা আবার দল বাঁধিয়া বিহারে ফিরিয়া আসিয়া এক জায়গায় সমবেত হইতেন। তখন বিভিন্ন বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ হইতে আবৃত্তি ও ব্যাখ্যা করা হইত। এই সমস্ত অনুষ্ঠানে অশ্বঘোষ সংকলিত তিন ভাগে বিভক্ত একটি বৌদ্ধ প্রার্থনা পুস্তক ব্যবহার করা হইত। অনুষ্ঠানের শেষে একে একে বুদ্ধের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়া শান্ত সমাহিতভাবে সন্ন্যাসীরা সমাবেশ কক্ষ পরিত্যাগ করিতেন। ইৎ-সিঙ এইভাবে তাম্রলিপ্ত বৌদ্ধ বিহারে সন্ন্যাসীদের নৈতিক চরিত্রের উন্নত মানের স-প্রশংস বর্ণনা করিয়াছেন।

তিনি এই প্রসঙ্গে আরো বলিয়াছেন যে বৌদ্ধ ভিক্ষুরা খুবই কঠোর ও সংযত জীবন যাপন করিতেন। বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা সাধারণত দুইজনে একসঙ্গে ভ্রমণে বাহির হইতেন। কিন্তু কোন গৃহীর বাড়িতে যাইতে হইলে তাহারা চারজন একত্রে যাইতেন। একসময় একজন শিক্ষক একটি বালকের হাতে তাহার স্ত্রীকে সামান্য চাল দিয়া পাঠাইয়া ছিলেন। এই সংবাদ সকলে জানায় শিক্ষকটি লজ্জায় চিরকালের জন্য সব ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। রাহুল মিত্র কখনও মা বা ভগিনী ব্যতীত অন্য কোন স্ত্রীলোকের মুখের দিকে তাকাইয়া কথা বলিতেন না।

ইৎ-সিঙ-এর বর্ণনা হইতে স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় যে তখন তাম্রলিপ্ত মহাজন বৌদ্ধধর্মের একটি অন্যতম প্রধান কেন্দ্র ছিল। এখানকার অপর একজন চৈনিক পরিব্রাজক যাহার নাম তাওলিন শিলপ্রভা পো-লো-হো বিহারে (তাম্রলিপ্ত) তিন বৎসর সংস্কৃত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তিনি ও মহাযান বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

এই সময় তাম্রলিপ্ত প্রসিদ্ধ শিক্ষাকেন্দ্র ছিল ইহা ইৎ-সিঙ-এর বর্ণনা হইতে স্পষ্টভাবে বোঝা যায়। ইৎ-সিঙ-এর বর্ণনায় তাম্রলিপ্তের শ্রেষ্ঠ বৌদ্ধ বিহারের (পো-লো-হো, বা বরাহ বিহার) ভিক্ষুদের জীবনযাত্রা, তাহাদের দৈনন্দিন নিয়ম, সংযম খ্যাতি ও সমৃদ্ধি, ভিক্ষু ও ভিক্ষুনীদের পরস্পর সম্বন্ধ বিষয়ে জানা যায়। এই সমস্ত বিহারে কিভাবে ব্যয়ভার নির্বাহ হইত ফা-হিয়েন ও ইৎ-সিঙ-

এর বর্ণনায় তাহার কিছু কিছু আভাস পাওয়া যায়। ফা-হিয়েন বলিয়াছেন দেশের রাজারা ও অন্যান্য ধনী ব্যক্তিরা বৌদ্ধ শ্রমণদের জন্য বিহার নির্মাণ করিয়া তাহার সকল ব্যয়ভার নির্বাহের জন্য ভূমি, উদ্যান ও ঘরবাড়ি দান করিতেন। এই সমস্ত সম্পত্তি যাহাতে কেহ আত্মসাৎ বা বাজেয়াপ্ত না করিতে পারে সেইভাবে তাহারা দানপত্র করিতেন। ইৎ-সিঙ বলিয়াছেন যেহেতু বৌদ্ধ ভিক্ষুদের কৃষিকার্য করা নিষেধ ছিল সেইজন্য তাহারা বিহারের কৃষিজমি বিনা করে অন্যকে চাষ করিতে দিতেন। পরিবর্তে তাহারা উৎপন্ন শস্যের কিছু অংশ গ্রহণ করিতেন। এইভাবে তাহারা সাংসারিক চিন্তা হইতে মুক্ত থাকিতেন। জল সেচনের দ্বারা প্রাণীহত্যাও তাহাদের করিতে হইত না। এইজন্য শীল ও সদাচার পালন তাহাদের পক্ষে সহজ ছিল। ভিক্ষুদের পরিচ্ছদের ব্যয় সংঘের সাধারণ সম্পত্তি হইতে বহন করা হইত। বিহারে নিজস্ব ভূমির উৎপাদিত শস্য; বৃক্ষ ও ফল হইতে ভিক্ষু শ্রমণদের অন্তর্বাস বহির্বাস, চীবর প্রভৃতি সব কিছুর ব্যয়ভার নির্বাহ হইত। গৃহী ভক্ত ও উপাসকদের নিকট হইতে তাহারা নানা প্রকার দানও গ্রহণ করিতেন। আহার্য গ্রহণে কাহারও কোন আপত্তি ছিল না। আহার্য ও পরিচ্ছদ সম্বন্ধে তাহারা নির্ভাবনায় ছিলেন বলিয়াই সুস্থ ও স্বচ্ছন্দ-চিত্তে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাধনায় সময় অতিবাহিত করিতে পারিতেন।

পুঁথি নকল ও অনুবাদ করা বৌদ্ধ বজ্রযানে তান্ত্রিক দেবদেবীর ছবি আঁকা প্রভৃতি বিহারের ভিক্ষুদের অনুশীলনের বিষয় ছিল। প্রত্যেকটি বিহারে ছোট বড় গ্রন্থগার ছিল এরূপ অনুমান করা বোধ হয় অযৌক্তিক নয়। বৌদ্ধ বিহারে সন্ন্যাসীদের উন্নত নৈতিক চরিত্রের দৃষ্টান্ত অন্যান্য শ্রেণীর জনগনকেও যে প্রভাবিত করিয়াছিল এই সময় ও তাহার পরবর্তীকালে গ্রন্থপাঠে পরিষ্কার ভাবে তাহা অনুধাবন করা যায়। বঙ্গদেশে ইৎ-সিঙ-এর সমসাময়িক কালে ব্রাহ্মণ এবং বৌদ্ধ ভিক্ষুদের মধ্যে যাহারা শাস্ত্র ও অন্যান্য বিদ্যা চর্চায় রত ছিলেন তাহাদের জীবন সহজ করিবার উদ্দেশ্যে অনেক ধনীব্যক্তি তাহাদের জীবন ধারনের উপযোগী ভূমিদান করিতেন। ফলে জীবিকা অর্জনের দায়ীত্ব হইতে মুক্ত থাকায় তাহারা সমস্ত মনপ্রাণ উচ্চতর বিদ্যাচর্চার কাজে নিয়োজিত করিতে পারিতেন। ফা-হিয়েন, হিউয়েন-সাঙ, ইৎ-সিঙ-এর বর্ণাসারে বৌদ্ধ জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষাদীক্ষার অন্যতম কেন্দ্রহিসাবে তাম্রলিপ্তের সশ্রদ্ধ উল্লেখ সর্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়। এই কেন্দ্রগুলিতে শুধু বৌদ্ধ ধর্ম ও শাস্ত্রের চর্চা হইত তাহা নহে, ব্যাকরণ, শব্দবিদ্যা, হেতুবিদ্যা, চিকিৎসা বিদ্যা, চতুর্বেদ, শব্দ সঙ্গীত, চিত্রকলা, মহাযান শাস্ত্র, অষ্টাদশ নিকারবাদ, যোগশাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা প্রভৃতি চর্চাও বৌদ্ধ শ্রমণদের

অধিতব্য বিষয়ের অন্তর্গত ছিল। হিউএন-সাঙ তাম্রলিপ্তে যে অগণিত দেবমন্দিরের কথা বলিয়াছেন সেখানে ব্রাহ্মণ, আচার্য, উপাধ্যায় অগণিত পণ্ডিতব্যক্তি ছিলেন তাহারা শুধু ব্রাহ্মণ ধর্মশাস্ত্র আলোচনা করিতেন এরূপ মনে করিবার কোন কারণ নাই। স্বাভাবিক কারণে একথা মনে করা যাইতে পারে তাহারাও নানা পার্থিব দৈনন্দিন সমস্যার সমাধানকল্পে জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং শিক্ষাদীক্ষারও নিশ্চয়ই চর্চা করিতেন। অর্থাৎ একথা স্পষ্ট যে ষষ্ঠ সপ্তম শতকের মধ্যে বঙ্গদেশে সংস্কৃত ভাষা এবং বৌদ্ধ, জৈন, ব্রাহ্মণ্য ধর্মকে আশ্রয় করিয়া আর্য জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিক্ষার যে ধারার সূত্রপাত হইয়াছিল তাহাকে তাম্রলিপ্তের বৌদ্ধ মঠ ও দেবমন্দিরগুলির অবদান নিশ্চয়ই ছিল একথা মনে করা যাইতে পারে।[৯]

তাম্রলিপ্তের সমৃদ্ধি

প্রাচীন বঙ্গদেশের অর্থনৈতিক জীবন যাত্রা বিষয়ে যে সমস্ত বিবরণ বিভিন্ন পরিব্রাজকের ভ্রমণ কাহিনীতে পাওয়া যায় তাহাতে মনে হয় সে যুগে বঙ্গদেশে অর্থাগমের অন্যতম প্রথম এবং প্রধান উপায়ই ছিল বাণিজ্য। বিভিন্ন লেখনি মাধ্যমে যে ছবিটি ফুটিয়া উঠে তাহাতে মনে হয় বঙ্গদেশের পান, সুপারি, নারিকেল, ইক্ষুজাত দ্রব্য, লবণ এবং বস্ত্র প্রভৃতি ছিল বাণিজ্যের প্রধান সামগ্রী। পেরিপ্লাস গ্রন্থেও টলেমীর 'ইণ্ডিকা' গ্রন্থ হইতে প্রমাণ পাওয়া যায় ভারতবর্ষ হইতে অন্যান্য মশলার সঙ্গে এলাচ, লবঙ্গ, প্রচুর পরিমাণে এশিয়া, ইউরোপ ও পূর্ব-দক্ষিণ ইউরোপে রপ্তানি হইত। রাজশেখর কাব্য মীমাংসা গ্রন্থে পূর্বদেশে ৪৫টি জনপদের মধ্যে তাম্রলিপ্তের উল্লেখ করিয়াছেন। এই অঞ্চলে অগুরু, কস্তুরী প্রভৃতি বিভিন্ন দ্রব্য উৎপাদনের কথাও বলিয়াছেন। কিন্তু এই সমস্ত দ্রব্যের পরিমাণ সম্পর্কে পরবর্তীকালে অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের টীকাকার বঙ্গদেশের কয়েকটি খনিজদ্রব্যের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার মধ্যে তাম্রের উল্লেখও আছে। সুবর্ণরেখার তীর ধরিয়া জামশেদপুর ও তাহার পশ্চিমাঞ্চলে অনেক তামার খনি আছে। এখানে আহরিত তাম্রই তাম্রলিপ্ত বন্দর হইতে সম্ভবতঃ রপ্তানি হইত। তাম্রলিপ্ত নামটির মধ্যে তাম্র সমৃদ্ধির স্মৃতি স্পষ্টভাবে জড়িত।

রপ্তানিকৃত শিল্পজাত দ্রব্যের মধ্যে প্রথমেই বস্ত্রের কথা বলা চলে। বঙ্গদেশে বস্ত্রের খ্যাতি খ্রীষ্ট জন্মের বহুপূর্বে দেশ-বিদেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। ইহার প্রমাণ কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, পেরিপ্লাসের গ্রন্থে এবং অন্যান্য ভ্রমণকাহিনী ও ব্যবসায়ীদের বৃত্তান্তে পাওয়া যায়। প্রাচীন বঙ্গের বস্ত্রশিল্পের কথা গ্রীক

ঐতিহাসিকেরা বারবার উল্লেখ করিয়াছেন। পেরিপ্লাসে বিভিন্ন প্রকার বস্ত্র রপ্তানির উল্লেখ আছে। এই রপ্তানিকৃত দ্রব্য পূর্বদেশে তাম্রলিপ্ত বন্দর হইতে যাইত ইহাই সকলে অনুমান করেন। তাম্রলিপ্ত বন্দর হইতে গাঙ্গেয় অঞ্চলের প্রচুর মুক্তাও পশ্চিম এশিয়া, গ্রীসে রপ্তানি হইত। কিন্তু সেই যুগের সবচেয়ে মূল্যবান রপ্তানি দ্রব্য ছিল গাঙ্গেয় অঞ্চলের সূক্ষ্মতম মসলিন বস্ত্রসম্ভার। রপ্তানি দ্রব্যের মধ্যে আর একটি দ্রব্যের উল্লেখ পাওয়া যায় তাহা হইল স্বর্ণ। বঙ্গদেশ হইতে প্রচুর পরিমাণে কার্পাস বস্ত্র রপ্তানি হইত উল্লেখ আছে। কারণ ইহা ছিল প্রাচীন বঙ্গের সর্বাধিক প্রসিদ্ধ শিল্প এবং ধন উৎপাদনের অন্যতম উপায়।

বঙ্গদেশ হইতে প্রচুর পরিমাণে চিনিও বিভিন্ন অঞ্চলে রপ্তানি করা হইত। সিংহল, আরব, পারস্য প্রভৃতি দেশে চিনি রপ্তানি করা হইত। লবণের ব্যবসা ছিল খুবই লাভজনক। ইহা ছাড়া মৎসেরও অন্তর্দেশীয় এক বিস্তৃত ব্যবসা চালু ছিল। অন্যান্য কারুশিল্পের সহিত তাম্রলিপ্ত অঞ্চলে আর একটি শিল্প খুবই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল তাহা হইল নৌ-শিল্প। নদ-নদীগামী ছোটবড় নৌকা এবং সমুদ্রগামী পোত ইত্যাদি নির্মাণ সংক্রান্ত একটি সমৃদ্ধশিল্প ও ব্যবসা প্রাচীন তাম্রলিপ্ত বন্দরকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল এরূপ মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে। পেরিপ্লাস গ্রন্থে তেজপাতা ও পিপ্পলের উল্লেখ দেখা যায়। এই দুই দ্রব্যের ব্যবসা খুবই লাভজনক ছিল সন্দেহ নাই। প্লিনি তাহার ইণ্ডিকা গ্রন্থে একজায়গায় বলিয়াছেন তাহার সময় (খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকে এক পাউণ্ড বা অর্ধসের পিপ্পলের দাম রোমের বাজারে ছিল ১৫টি স্বর্ণমুদ্রা। ইহা হইতে স্পষ্ট বোঝা যায় এই সব বাণিজ্য সম্ভার রপ্তানি করিয়া দেশে প্রচুর অর্থাগম হইত। কার্পাস ও অন্যান্য বস্ত্রশিল্প সম্বন্ধেও একই কথা বলা চলে। প্লিনি বলিয়াছেন ভারতবর্ষ হইতে যত রেশম ও কার্পাসজাত বস্ত্র বণিকেরা পশ্চিমে বহন করিয়া আনিত তাহার বার্ষিক মূল্য ছিল প্রায় এক লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা। ইহার অনেকটাই বঙ্গদেশ হইতে আসিত তাহা মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে।

দুধপানি শিলালিপিতে যে কাহিনী উল্লিখিত আছে তাহার মধ্যে ঐতিহাসিক সত্যতা আছে সন্দেহ নাই। বৌদ্ধ জাতকের অনেক গল্পে তাম্রলিপ্তে বাণিজ্য সম্পর্কে অনেক সুপ্রসিদ্ধ কাহিনী আছে। সোমদেবের কথাসরিৎসাগরে একাধিকবার পাটলীপুত্র হইতে বাণিজ্য সম্পর্কে বণিকদের পুণ্ড্রবর্ধন ও তাম্রলিপ্তে আসিবার উল্লেখ আছে। ইৎ-সিঙ যখন তাম্রলিপ্ত হইতে পশ্চিমবাহী এই পথ ধরিয়া বুদ্ধগয়ায় গিয়াছিলেন তখন তাহার সঙ্গী হইয়াছিলেন শতশত

বণিক। তাম্রলিপ্তের বাণিজ্যের উল্লেখ বারবার অন্যান্য গ্রন্থেও দেখা যায়। বিদ্যাপতির পুরুষপরীক্ষায় গুজরাটের সঙ্গে গৌড়ের বাণিজ্যের আভাস পাওয়া যায়। তাম্রলিপ্ত ও কর্ণসুবর্ণের বাণিজ্যের সমৃদ্ধির কথা হিউয়েন-সাঙ বিস্তৃত-ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন নানাপ্রকার মূল্যবান দ্রব্য, মণিমুক্তা প্রভৃতি প্রচুর সমাগম হইত তাম্রলিপ্তে। সেজন্য এখানকার লোকেরা খুবই বিত্তবান ছিলেন। কথাসরিৎসাগরেও তাম্রলিপ্তকে বিত্তশালী বণিকদের কেন্দ্র হিসাবে উল্লেখ করা হইয়াছে। এই বণিকেরা লঙ্কা, সুবর্ণদ্বীপ ও অন্যান্য দেশের সঙ্গে সমুদ্র বাণিজ্যে লিপ্ত ছিলেন। উত্তাল সমুদ্রকে তুষ্ট করিবার জন্য তাহারা মণিমুক্তা ও অন্যান্য মূল্যবান দ্রব্যাদি জলে সমর্পন করিয়া জলদেবতার পূজা করিতেন।

পেরিপ্লাস গ্রন্থে আরো দেখা যায় যে সেই খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকে চীন দেশ হইতে বঙ্গদেশে কাঁচা রেশম, রেশম সূতা এবং রেশমবস্ত্র আমদানি করা হইত এবং তাহা নদীপথে বিভিন্ন জায়গায় পাঠানো হইত। একই পথে বঙ্গদেশ হইতে প্রাচীন যুগের শেষ দিকে বহু অশ্বও আমদানি করা হইত।

এই সমস্ত কাহিনী হইতে সহজে অনুমান করা যায় প্রাচীন বঙ্গের সমৃদ্ধি বহুলাংশে নির্ভর করিত ব্যবসা বাণিজ্যের উপর। সেই ব্যবসা বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র ছিল বন্দরনগরী তাম্রলিপ্ত। সমাজে ব্যবসায়ীদের মর্যাদা ছিল বহুল পরিমাণে। তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় পঞ্চম হইতে অষ্টম শতাব্দীর মধ্যে ভূমিদান দলিলগুলির মধ্যে। ৪৪৪ হইতে ৫৪৪ খ্রীষ্টাব্দ চিহ্নিত চারটি তাম্রশাসন দামোদরপুর অঞ্চলে পাওয়া গিয়াছে। এই অঞ্চলটি কোটি বর্ষ অর্থাৎ উত্তরবঙ্গে অবস্থিত বলিয়া মনে হয়। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে বঙ্গদেশে বাণিজ্যিক সমৃদ্ধির সূচনা হইয়াছিল। খুব স্বাভাবিক কারণে একথা মনে করা যাইতে পারে যে গুপ্তযুগে বাণিজ্যিক গোষ্ঠীদের রাষ্ট্রের সহিত সম্পর্কের যে কাহিনী উক্ত তাম্রশাসনগুলিতে উল্লিখিত হইয়াছে তাহা সম্ভবতঃ গুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্যান্য অঞ্চলেও প্রচলিত ছিল। বিশেষত পূর্বে দেখানো হইয়াছে যে দক্ষিণ পশ্চিমবঙ্গ এবং সেই সঙ্গে তাম্রলিপ্ত ছিল বহির্দেশীয় ও অন্তর্দেশীয় বাণিজ্যকেন্দ্র। সেখানকার শ্রেষ্ঠীশ্রেণীও এই তাম্রশাসনে উল্লিখিত বর্ণনার মতই গোষ্ঠীবদ্ধ ছিলেন একথা মনে করা খুবই সঙ্গত।

গুপ্তযুগে ভুক্তি বা জেলাগুলিতে ভূমি বিক্রয় বা দানের ক্ষেত্রে জেলা সরকারী অফিসে (অধিকরণ) যে নথিপত্র পাওয়া যায় তাহারই বিস্তৃত বর্ণনা ওই তাম্র-শাসনগুলিতে পাওয়া যায়। দেখা যাইতেছে জমি বিক্রয় বা দান উপলক্ষে

সরকারী কর্মচারী ব্যতীত আরও চারজন ব্যক্তি এই কাজটি সমাধা করিত। এই চারজনের মধ্যে একজন হইলেন নগরশ্রেষ্ঠী, যিনি শহরের বিভিন্ন ব্যবসায়ী গোষ্ঠী ও ধনী মহাজনদের সভাপতি। দ্বিতীয়জন হইলেন প্রথম স্বার্থবাহ। অর্থাৎ এই বিভাগের বিভিন্ন জেলার (বিষয়) ব্যবসায়ীদেরও বণিকদের প্রধান প্রতিনিধি এবং তৃতীয়জন হইলেন প্রথম কুলিক। অর্থাৎ তিনি ব্যবসায়ে নিযুক্ত গোষ্ঠীর প্রতিনিধি। চতুর্থজন হইলেন প্রথম কায়স্থ। অর্থাৎ তিনি হইলেন প্রথম করণিক। এই প্রসঙ্গে উত্তর বিভাগে আবিষ্কৃত কতকগুলি শিলমোহরের কথা বিশেষভাবে স্মরণীয়। যাহাতে শ্রেষ্ঠী হইলেন স্বার্থবাহ, কুলিক নিগম অর্থাৎ তাহারা হইলেন বিভিন্ন মহাজন, শিল্পী ও ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর যৌথ প্রতিনিধি। ইহার সহিত আরও দুইটি নাম পাওয়া যায় যথাক্রমে শ্রেষ্ঠী নিগম ও কুলিক নিগম। এই সমস্ত বিভিন্ন উদাহরণের ফলে মনে হয় এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব যে এই যুগে বঙ্গদেশে তথা তাহার নিকটবর্তী অঞ্চলে ব্যবসায়ীগণ প্রত্যেকে পেশাগতভাবে গোষ্ঠীবদ্ধ ছিলেন।

এই ঘটনা হইতে দেখা যাইতেছে জমিদান ও বিক্রয় ব্যাপারে যাহারা সর্বশেষ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেছেন তাহাদের পাঁচজনের মধ্যে দুইজন সরকারী কর্মচারী, একজন বিশপতি স্বয়ং অপর জন প্রথম বা জৈষ্ঠ্য কায়স্থ বা করণিক এবং বাকি তিনজন ব্যবসা বাণিজ্য, শিল্প ও মহাজনদের প্রতিনিধি। এই শিলালিপিতে একটা বিষয় অস্পষ্ট তাহা হইল এই বে-সরকারী প্রতিনিধিরা কিভাবে ঐ গোষ্ঠীতে আসিতেন। সরকারী নির্বাচন, মনোনয়ন বা তাহাদের গোষ্ঠীর দ্বারা নির্বাচনের মাধ্যমে? দ্বিতীয়ত ইহাদের সহিত সরকারী কর্মচারীদের সম্পর্ক কি ছিল? তাহারা কি শুধু পরামর্শদাতা হিসাবে কাজ করিতেন? এই অস্পষ্টতা সত্বেও যে হেতু সমাজের প্রভাবশালী জনগোষ্ঠীর মধ্য হইতে শ্রেষ্ঠী গোষ্ঠীর প্রধান ও বণিকদের প্রধান ও শিল্পীগোষ্ঠীর প্রধানদের ডাকা হইত বলিয়া এইরূপ অনুমান করার যথেষ্ট সঙ্গত কারণ আছে যে সম-সাময়িক কালে রাষ্ট্রপরিচালনার ব্যাপারে বণিক ও ব্যবসায়ীরা কতটা প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। খুব স্বাভাবিক কারণে একথা মনে করা যাইতে পারে ব্যবসা বাণিজ্যের ফলে এইসব শ্রেষ্ঠী ও বণিকদের হাতে যে অর্থাগম হইয়াছিল তাহার ফলে ইহারা রাষ্ট্রে আধিপত্য লাভের সুযোগ পাইয়াছিলেন। প্রাচীন বঙ্গের লক্ষ্মী ব্যবসা বাণিজ্যের উপরই বেশী নির্ভরশীল ছিলেন এবং সেই লক্ষ্মী বাস করিতেন বণিক ও শ্রেষ্ঠীদের ঘরেই।

তাম্রলিপ্তের বাণিজ্যিক সমৃদ্ধি সম্বন্ধে বিদেশী ভ্রমণকারীরা বিশেষতঃ

হিউয়েন-সাঙ অনেক কথাই বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন এখানে তুর্লভ এবং মূল্যবান দ্রব্য প্রচুর পাওয়া যাইত এবং এখানে অনেক সমুদ্রগামী জাহাজের মালিক ও ধনী সওদাগর বাস করিত। কাহারও কাহারও ধারণা সেই সমৃদ্ধির যুগে এখানে প্রায় ৭০০০ জন প্রভুত ধনশালী বণিকের বাস ছিল। হিউয়েন-সাঙ-এর বর্ণনা হইতে মনে হয় আভ্যন্তরীণ জলপথ ও সমুদ্রপথে বাণিজ্যপোযোগী জাহাজ এই সময়ে তাম্রলিপ্তে নির্মিত হইত।

সাধারণ লোকেদের যে আর্থিক স্বচ্ছলতা ছিল তাহা ইৎ-সিঙ-এর একটি বর্ণনা হইতে দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি তাম্রলিপ্তে একটি উৎসব উপলক্ষে ভোজের সম্পর্কে বলিয়াছেন যে এখানকার খাদ্য পরিবেশনের একটি চিরাচরিত নিয়ম হইল পর্যাপ্ত পরিমাণে পরিবেশন করা এবং তাহা খাওয়া অসম্ভব হইলেও না দিতে বলা চলিবে না। অর্থাৎ এই সমস্ত উৎসবে প্রচুর পরিমাণে খাদ্যদ্রব্যের অপচয় ঘটিত।

এই ঘটনা আর্থিক স্বচ্ছলতার পরিচায়ক না দীর্ঘকালীন রীতি অনুসরণ করিয়াই করা হইত এ সম্পর্কে ইৎ-সিঙ কিছু বলেন নাই। তাম্রলিপ্তের সাধারণ গৃহস্থেরাও খুবই অতিথিপরায়ণ ছিলেন। হিউয়েন-সাঙ বলিয়াছেন এখানকার সাধারণ গৃহস্থেরাও একজন অতিথিকে অন্তত তিনজনের খাদ্য দিতেন এবং ধনীরা দিতেন অন্তত দশজনকে। অতিথি ইচ্ছা করিলে তাহার প্রয়োজনাতিরিক্ত আহার্য দ্রব্য সঙ্গে লইয়া যাইতে পারিতেন। ইহা হইতে স্পষ্ট বোঝা যায় বন্দর নগরী তাম্রলিপ্তের অধিবাসীরা ছিলেন খুবই সম্পদশালী।[১০]

ব্যবসা বাণিজ্যের বিনিময় রীতি

মুদ্রা হিসাবে ধাতুর প্রচলন সভ্যতার ক্ষেত্রে (বিশেষত আর্থিক সভ্যতার ক্ষেত্রে) একটি বিরাট পদক্ষেপ। বঙ্গদেশে ইহার প্রচলন কবে হইয়াছিল তাহা সঠিকভাবে বলা মুশকিল। তবে এ বিষয়ে নিশ্চিত যে মুদ্রার ব্যবহার কয়েক শত বৎসর পূর্ব হইতে বঙ্গদেশের লোকেদের জানা ছিল।

ইহার স্বপক্ষে তিনটি প্রমাণ আছে। প্রথমত মহাস্থানগড়ে একটি ব্রাহ্মী লিপিতে 'গণ্ডক' নামক মুদ্রার কথা উল্লেখ আছে সম্ভবতঃ উক্ত স্থানে উল্লিখিত আরো একটি মুদ্রার নাম 'কাকনিক' অথবা 'কাকনিকা'। ইহার প্রথমটি সম্ভবতঃ পরবর্তী যুগের 'কড়ি' জাতীয় কোন ক্ষুদ্র মুদ্রা। আর দ্বিতীয়টি সম্ভবতঃ কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র উল্লিখিত 'কার্ষাপণ'।

দ্বিতীয়তঃ পেরিপ্লাস তাহার গ্রন্থে নদীর মোহনায় অবস্থিত গঙ্গে (তাম্রলিপ্ত)

এবং কেল্‌টিস (caltis) নামক একপ্রকার স্বর্ণমুদ্রা প্রচলনের উল্লেখ করিয়াছেন (প্রথম শতাব্দী)। তৃতীয়তঃ এ সম্পর্কে সবচেয়ে মূল্যবান প্রমাণ হইল অনেকগুলি খ্রীষ্টপূর্ব যুগের, রৌপ্য ও তাম্রমুদ্রা প্রাপ্তি। এই মুদ্রাগুলি পাঞ্চমার্কড (punchmarked) এবং কাষ্টকয়েন (cast coin)। এই উভয় মুদ্রাই খ্রীষ্টপূর্ব যুগে বঙ্গদেশের বিভিন্ন জায়গায় (বিশেষত তাম্রলিপ্ত ও নিকটবর্তী অঞ্চলে) পাওয়া গিয়াছে। একথা মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে যে এই বিশেষ ধরণের চিহ্নিত মুদ্রাগুলি (punchmarked) বঙ্গদেশে ব্যবহৃত প্রাচীনতম মুদ্রার নিদর্শন এবং সম্ভবতঃ এই ধরণের মুদ্রা বঙ্গ ও ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে কয়েক শতাব্দী ধরিয়া লোকেদের ব্যবসা বাণিজ্যের প্রয়োজন মিটাইত। অর্থাৎ প্রাচীনকাল হইতে বঙ্গদেশের অর্থনৈতিক জীবনযাত্রার ধারা সর্ব ভারতীয় অর্থনৈতিক জীবনযাত্রার মূলধারার সহিত যুক্ত ছিল।

কিছু কুষাণ আমলের স্বর্ণ ও অন্যান্য মুদ্রা বঙ্গদেশে আবিষ্কৃত হইয়াছে। এমনকি তাম্রলিপ্তেও কয়েক বৎসর আগে অনেকগুলি কুষাণ তাম্রমুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। তবে এই মুদ্রাগুলি এই অঞ্চলে ব্যবসায়িক বিনিময়ের জন্য ব্যবহৃত হইয়াছিল এইরূপ মনে করিবার স্বপক্ষে বিশেষ কিছু পাওয়া যায় নাই। সম্ভবতঃ ইহা ব্যবসায়ীদের সঙ্গে অথবা তীর্থযাত্রীদের অথবা আক্রমণকারী সৈন্যদের সহিত বঙ্গদেশে আসিয়াছিল। শিলমোহরিত মুদ্রা অথবা ঢালাই মুদ্রা অর্থাৎ প্রাচীনতম বঙ্গের কোন মুদ্রাই খ্রীষ্টপূর্ব ৩০০ বৎসরের পূর্বে ব্যবহৃত হয় নাই।

গুপ্তশাসন প্রচলিত হইবার পর তাহাদের দ্বারা প্রচলিত নূতন মুদ্রার ব্যবহার বঙ্গদেশে শুরু হয়। গুপ্ত সম্রাটরা সাধারণত স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা ব্যবহার করিতেন, যদিও তাম্রমুদ্রা তাহাদের অজানা ছিল না। বঙ্গদেশে প্রায় প্রত্যেক অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণ গুপ্ত মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। গুপ্ত আমলে দুই প্রকার মুদ্রার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে 'দিনার' (Dinara) অপরটি 'রূপক' (Rupaka) সম্ভবতঃ প্রথমটি স্বর্ণ ও দ্বিতীয়টি রৌপ্য মুদ্রা। পঞ্চম শতাব্দীর শেষভাগে গুপ্ত সম্রাটদের পরবর্তী উত্তরাধিকারীগণ বঙ্গদেশে সম্ভবতঃ প্রায় রৌপ্য মুদ্রার ব্যবহার পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। গুপ্ত পরবর্তী যুগে বঙ্গদেশে স্বর্ণমুদ্রার মূল্যমান হ্রাস করা হয়। অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ইহার প্রধান কারণ মনে হয়। বঙ্গদেশের রাজনৈতিক বিপর্যয়ের সময় রাজারা বাধ্য হইয়া মুদ্রার মূল্যমান হ্রাস করার মাধ্যমে যতটা সম্ভব স্বর্ণ নিজেদের হাতে রাখিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই পদ্ধতি কয়েক পুরুষ ধরিয়া চলিয়াছিল ফলে প্রাচীন যুগের শেষ দিকে বঙ্গদেশে স্বর্ণ মুদ্রার প্রচলন প্রায় বন্ধ হইয়া গিয়াছিল।

অর্থনৈতিক এই বিপর্যস্ত পরিবেশের সময় সম্ভবতঃ 'কড়ির' প্রচলন অধিক পরিমাণে হইয়াছিল। ইহার প্রচলন পূর্বে জানা থাকিলেও এই সময় ইহা প্রায় ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে একমাত্র বিনিময়ের মাধ্যম হইয়াছিল।

পরবর্তীকালে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা স্থাপনের ফলে পালরাজারা নূতন করিয়া রৌপ্যমুদ্রার প্রচলন করেন। সেজন্য পাল রাজাদের আমলের বহু রৌপ্যমুদ্রা বঙ্গদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পাওয়া গিয়াছে। যদিও দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গে এই ধরনের মুদ্রা এখনও পাওয়া যায় নাই। ডঃ নীহাররঞ্জন রায়ের মতে পাল-রাজাদের আমলে স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন আর হয় নাই। গুপ্তযুগে এক ধরণের স্বর্ণ-মুদ্রার প্রচলন ছিল।

সেন রাজাদের আমলে দুই প্রকারের মুদ্রার উল্লেখ বিভিন্ন তাম্রলিপিতে দেখিতে পাওয়া যায়। একটি হইল 'পুরান' অপরটি হইল 'কপর্দক পুরান' মনে হয় এই শব্দ দুইটি সমার্থক। কাজেই ইহারা দুই ধরনের মুদ্রা না হইবার সম্ভাবনাই বেশী। আশ্চর্যের বিষয় সেন রাজাদের সময়কার কোন মুদ্রাই বঙ্গদেশে আবিষ্কৃত হয় নাই। বরং সেই সময়কার অর্থনৈতিক পরিস্থিতি বর্ণনা প্রসঙ্গে মুসলমান ঐতিহাসিকগণ কড়ির ব্যবহারের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। কাজেই সেন রাজাদের আমলে বঙ্গদেশে পণ্যবিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে 'কড়ির' প্রচলন ছিল বলিয়া মনে হয়। ডঃ ভট্টশালী মনে করেন 'কপর্দক' সম্ভবতঃ 'কড়ি'। কিন্তু আগেই বলা হইয়াছে সেনদের সময়কার কোন রৌপ্যমুদ্রা পাওয়া যায় নাই। বঙ্গদেশে 'কড়ির' ব্যবহার চতুর্থ শতকে ফা-হিয়েন লক্ষ্য করিয়াছেন। ইহার প্রচলন বঙ্গদেশে উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত ছিল। চর্যাপদে, মীনহাজউদ্দিনের বর্ণনায় এবং মধ্যযুগের সাহিত্যেও বিদেশী পর্যটকদের বর্ণনায় 'কড়ির' প্রচলন ছিল দেখা যায়।

গুপ্তযুগের পর অর্থাৎ খৃষ্টীয় ষষ্ঠ ও সপ্তম হইতে মুদ্রা বিশেষত স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রার এইরূপ অবনতি কেন ঘটিল তাহার সঠিক উত্তর দেওয়া খুবই কষ্টকর। প্রথম অবস্থায় স্বর্ণমুদ্রার অবনতি ঘটিল। কিছুদিন গুপ্ত স্বুবর্ণমুদ্রার নকল চলিল, তাহার কিছুদিন পর ইহা একেবারে অন্তর্হিত হইয়া গেল।

রৌপ্যমুদ্রা সপ্তম শতকে একবার অন্তর্হিত হইয়াছিল। পাল আমলে ইহাদের উদ্ধারের চেষ্টা হয় নাই। গুপ্তযুগের স্বর্ণ ছিল অর্থমানের নির্দেশক। আর পাল আমলে তাহা ছিল রৌপ্য। সেন আমলেও রৌপ্য মূল্যমান হিসাবে স্বীকৃত তাহা দৃশ্যত ছিল অনুপস্থিত। নিম্নতম ছোটখাট বিক্রয়ের মান হিসাবে 'কড়ির' ব্যবহার ছিল বহুল প্রচলিত। কিন্তু তখনও অর্থমান নির্ণিত হইত

স্বর্ণ বা রৌপ্যে। সেন আমলে কড়ি মনে হয় সর্বেসর্বা ছিল। নীহার রায়ের মতে মুদ্রার এই ক্রমোবনতি দেশের সাধারণ আর্থিক দুর্গতির নির্দেশ করে। সেইসঙ্গে রাষ্ট্রের গচ্ছিত স্বর্ণ ও রৌপ্যের পরিমাণ হ্রাসের প্রতিও নির্দেশ করে।

সামুদ্রিক বাণিজ্য হইতে প্রাচীনকালে বঙ্গদেশে প্রচুর অর্থাগম হইত। গঙ্গাবন্দর ও তাম্রলিপ্ত হইতে জাহাজ বোঝাই হইয়া যে পণ্য বিদেশে রপ্তানী হইত তাহার বদলে দেশে প্রচুর স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রা আমদানি হইত। এই স্বর্ণ-মুদ্রা রোমান 'দিনার' ও রৌপ্যমুদ্রা রোমান 'দ্রক্ষ' হওয়াই সম্ভব। খ্রীষ্ট জন্মের বহু শতাব্দী হইতে এই যে বাণিজ্যিক সমৃদ্ধি দেখা দিয়াছিল তাহা চলিয়াছিল প্রায় খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতক পর্যন্ত।

খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতকের প্রারম্ভে মুসলমানরা সিন্ধুদেশ অধিকার করেন। ইহারা পূর্বদিকে স্পেন এবং অন্যদিকে ভারতবর্ষ পর্যন্ত নিজেদের রাষ্ট্রীয় প্রভুত্ব এবং চীনদেশ পর্যন্ত বাণিজ্য প্রভুত্ব বিস্তার করে। ভূমধ্যসাগর হইতে আরম্ভ করিয়া ভারত মহাসাগরের দক্ষিণ-পূর্বদিকে যে সামুদ্রিক বাণিজ্য একসময় রোম ও মিশর দেশীয় বণিকদের নিয়ন্ত্রণে ছিল তাহা ধীরেধীরে সপ্তম শতাব্দীর মাঝামাঝি হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বাদশ শতকের মধ্যে আরব বণিকদের হাতে চলিয়া যায়। ইহারই ফলে অষ্টম শতাব্দী হইতে বঙ্গদেশের তাম্রলিপ্ত বন্দরবাহী সামুদ্রিক সমৃদ্ধ বাণিজ্যস্রোতে ক্রমশ ভাটা পড়িতে শুরু করে। ভারতীয় দ্রব্যসম্ভারে চাহিদা পশ্চিমের সুবিস্তৃত অঞ্চলগুলিতে প্রায় বন্ধ হইয়া যায়। অর্থাৎ পশ্চিমের বাজারে ভারতীয় যেসব জিনিসের চাহিদা ছিল তাহা ক্রমশ হ্রাস পাইতে লাগিল। সু-সমৃদ্ধ বাণিজ্যে বঙ্গদেশের যে অংশ ছিল তাহা এই সময়ে খুবই খর্ব হইয়া যায়।

বঙ্গদেশের প্রধান বাণিজ্যবন্দর তাম্রলিপ্ত। সেই বাণিজ্যবন্দরের সমৃদ্ধির কথা সকলের মুখে এবং পুঁথির পাতায় পাওয়া গিয়াছে। সপ্তম শতকে তাম্র-লিপ্তের বাণিজ্যিক সমৃদ্ধির কথা হিউয়েন-সাঙ ও ইৎ-সিঙ বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিয়াছেন কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় সামুদ্রিক বাণিজ্যকেন্দ্র হিসাবে তাম্রলিপ্তের উল্লেখ অষ্টম শতকের পর আর পাওয়া যায় না। মনে হয়, যে নদীর উপর তাম্রলিপ্ত অবস্থিত ছিল সেখানে পলি পড়িয়া হয় সে নদীর মুখ বন্ধ হইয়া গিয়াছিল অথবা নদীটির খাদ পরিবর্তিত হইয়াছিল। ইহারই ফলে তাম্রলিপ্তের সৌভাগ্যরবি অস্তমিত হইল। অষ্টম হইতে পঞ্চদশ শতক পর্যন্ত বঙ্গদেশে আর কোথাও সামুদ্রিক বন্দর গড়িয়া ওঠে নাই।

পঞ্চম শতকের প্রারম্ভ হইতে অষ্টম শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত বাঙ্গালী সমাজ প্রধানতঃ শিল্প ও ব্যবসাবাণিজ্যের উপর নির্ভরশীল। অর্থনৈতিক শ্রেণী হিসাবে তাহাদের সমাজে ও রাষ্ট্রে বিশেষ প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতকে শিল্পী, শ্রেষ্ঠী, স্বার্থবাহ, ব্যাপারী প্রভৃতি শ্রেণী বরাবর রাষ্ট্রের আনুকূল্য লাভ করিয়াছে। অর্থাৎ রাষ্ট্রযন্ত্রে ইহাদের প্রভাব অক্ষুন্ন ছিল। আর একটি শ্রেণীও রাষ্ট্রের প্রাধান্য লাভ করিয়াছিলেন, তাহারা হইলেন জৈন, বৌদ্ধধর্মজীবি সম্প্রদায় ও ব্রাহ্মণগণ। সপ্তম শতাব্দীর শেষার্ধে এবং অষ্টম-শতাব্দীর প্রথমার্ধে যে রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক পরিবর্তন সূচিত হইয়াছিল তাহাতে পৌরাণিক ব্রহ্মণ্যধর্মের দ্রুত অবনতি শুরু হয়। এইজন্যই রাষ্ট্র ও সমাজে ইহাদের প্রাধান্য কমিতে থাকে। বৃহদ্ধর্ম ও ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে শিল্পী ও বণিক ব্যবসায়ী শ্রেণীর লোকেদের মধ্যমশঙ্কর বা অসৎশূদ্র শ্রেণীভুক্ত করা হইয়াছে। অর্থাৎ তাহারা উত্তমশঙ্কর বা সৎশূদ্রের মর্যাদা সম্পন্ন কায়স্থ, বৈদ্য, গোপ, নাপিত প্রভৃতির নীচে স্থান পাইয়াছেন। 'বল্লাল চরিতে' বিশেষভাবে সুবর্ণ-বণিকদের সামাজিকভাবে পতিত বলা হইয়াছে। ইহাতে স্পষ্ট অনুমেয় যে রাষ্ট্র ও সমাজে ইহাদের আধিপত্য খুবই কমিয়া গিয়াছিল।

ইহার ফলে শিল্প ব্যবসাবাণিজ্য রাষ্ট্রের প্রথম ও প্রধান ধনোৎপাদনের উপায় আর রহিলনা। তাহার ফলে সমাজ জীবনে যে পরিবর্তন শুরু হইয়াছিল তাহার পরিণতিতে দেখা যায় অষ্টম হইতে ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে সামন্ত প্রথা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ভূমি সমাজের প্রধান সম্পদরূপে গৃহীত হয়। অবশ্য ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পকর্ম তখনও পর্যন্ত ব্যহত হয় নাই। তবে তাহাদের প্রভাব ক্রমশ কমিয়া আসিতেছিল।

পৃথিবীর সর্বত্র সওদাগরী ধনতন্ত্রের সহিত ক্রীতদাস প্রথা অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়াইয়া ছিল। বঙ্গদেশেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। প্রাচীন যুগের শেষ পর্যন্ত এই প্রথা বঙ্গদেশে প্রচলিত ছিল। জীমূতবাহন 'দায়ভাগ' গ্রন্থে তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। বঙ্গদেশে এই প্রথা ঊনবিংশ শতকেও প্রচলিত ছিল।

সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় এই ব্যাপক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাম্রলিপ্তের সমৃদ্ধির গৌরবময় যুগেরও ধীরে ধীরে অবসান ঘটে।[১১]

তাম্রলিপ্ত অঞ্চলে প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান ও তাহার মূল্যায়ন

পূর্বভারতের সর্বপ্রাচীন বন্দরনগরী তাম্রলিপ্তের বৈচিত্র্যময় কাহিনী, স্বাভাবিক কারণে কৌতূহলী গবেষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। রামায়ণ

মহাভারত, পুরাণ ও অন্যান প্রাচীন বৌদ্ধ ও জৈন সাহিত্যে এবং চীনদেশীয় পরিব্রাজকদের বর্ণনায় যে সমৃদ্ধশালী ও বিশ্বের সহিত যোগাযোগ রক্ষাকারী বন্দরনগরীর বিস্তৃত বর্ণনা পাওয়া যায় তাহা বর্তমানের কোন স্থান তাহা নির্ণয় করার অদম্য আগ্রহ খুবই স্বাভাবিক।

উৎখনন ও অনুসন্ধানের মাধ্যমে প্রত্নবস্তর আবিষ্কার ও তাহার যথাযথ বিশ্লেষণের মাধ্যমেই ইহা নির্ণয় করা একমাত্র সম্ভব। ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রাচীন ভারতে দুই প্রকার তাম্রমুদ্রা বা (পুরাণ) ব্যবহৃত হইত বলিয়াছেন। এক ধরণের মুদ্রা ছিল বৃহৎ তাম্রখণ্ড হইতে কর্তিত ক্ষুদ্র চতুষ্কোণ আকৃতি, যাহাতে নানা দেবদেবী, গাছপালা, জন্তুজানোয়ারের ছবি অঙ্কিত থাকিত। আগেই বলা হইয়াছে ইহাকে Punchmarked বা চিত্রাঙ্কিত মুদ্রা বলা হয়। দ্বিতীয় আর একধরণের গোলাকার মুদ্রা ছিল ছাঁচে ঢালা। দীনবন্ধু মিত্র এই দ্বিতীয় প্রকারের মুদ্রা তমলুকে পাইয়াছিলেন।

তাম্রলিপ্ত ও তাহার নিকটবর্তী অঞ্চলে প্রাপ্ত প্রত্নবস্ত দীর্ঘকাল ধরিয়া জনমানসে সাড়া জাগাইয়া আসিতেছে। উনবিংশ শতকে এই অঞ্চলে দীনবন্ধু মিত্র কর্তৃক ১৮৬৭ খ্রীঃ বিভিন্ন চিত্রাঙ্কিত মুদ্রা (Punchmarked) পাওয়ার পর সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্র উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে (১৮৭৩) তাহার প্রকাশিত 'যুগলাঙ্গুরীয়' উপন্যাসে প্রাচীন তাম্রলিপ্তের বাণিজ্যিক সমৃদ্ধির কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি এই পুস্তকে প্রাচীন তাম্রলিপ্তকে আধুনিক তমলুকের সহিত অভিন্ন বলিয়া চিহ্নিত করিয়াছেন। খুব স্বাভাবিক কারণে তাহার কল্পিত এই উপন্যাসের মাধ্যমে বঙ্গদেশের জনমানসে অতীতকালের সমৃদ্ধ নগরী তাম্রলিপ্তের স্মৃতি পুনরায় জাগরিত হইয়াছিল।[১২]

১৮৮১ খ্রীঃ রূপনারায়ণ নদ পূর্বখাদ পরিবর্তন করিয়া নূতন খাদে প্রবাহিত হইলে প্রাচীন খাদের ভূগর্ভ হইতে কতকগুলি প্রাচীন মুদ্রার সন্ধান পাওয়া যায়। মুদ্রাগুলির অধিকাংশ স-ছিদ্র ছিল এবং অনেকগুলির উপর কোন কিছু খোদিত ছিল। কয়েকটির উপর পদ্ম, চক্র, চৈত্য অথবা হস্তী, মৃগ, সিংহ অঙ্কিত ছিল। পণ্ডিতগণ অনুমান করেন এই সকল মুদ্রা খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ অথবা পঞ্চম শতকে প্রচলিত ছিল। যোগেশ চন্দ্র বসু মহাশয় তাহার মেদিনীপুরের ইতিহাসে এশিয়াটিক সোসাইটির ১৮৮২ সালের বিবরণ উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন যে ঐ সালে তমলুকে প্রথম কনিষ্কের একটি মুদ্রা পাওয়া গিয়াছিল। ঐ মুদ্রাটিতে রাজার মূর্তি অঙ্কিত এবং গ্রীক অক্ষরে রাজার নাম ও উপাধি লিখিত ছিল। সমসাময়িককালে গুপ্তসম্রাট প্রথম কুমার গুপ্তের একটি স্বর্ণমুদ্রাও

তমলুকে পাওয়া গিয়াছে। এই মুদ্রাটির একদিকে পদ্মাসনা লক্ষ্মীমূর্তি এবং অপরদিকে অশ্বারূঢ় রাজমূর্তি। ১৯০৪ খ্রীঃ মেদিনীপুর জেলার অন্যত্র গুপ্ত সম্রাট স্কন্দগুপ্তের একটি মুদ্রাও পাওয়া গিয়াছে।[১৩]

১৮৮৮ সালে এশিয়াটিক সোসাইটির মাসিক অধিবেশনে ১৮৮২ সালে তমলুকে প্রাপ্ত তাম্রমুদ্রাগুলির সহিত একটি পোড়ামাটির যক্ষিণী প্রদর্শিত হয়। ইহার ছবি ও পূর্ণ বিবরণ এশিয়াটিক সোসাইটির ১৮৮৮ সালের বিবরণীতে প্রকাশিত হয়। পরবর্তীকালে এই যক্ষিণী মূর্তি কিভাবে এশিয়াটিক সোসাইটির সংগ্রহশালা হইতে হারাইয়া যায়। পরে এই যক্ষিণী মূর্তি অক্সফোর্ড-এর এ্যাসমোলিয়ন (Ashmolean) যাদুঘরে সংরক্ষিত দেখিতে পাওয়া যায়। তমলুকে প্রাপ্ত উক্ত যক্ষিণী মূর্তি যাহা ঐ যাদুঘরে রহিয়াছে তাহা অক্সফোর্ড যক্ষিণী নামে বিশেষ সুপরিচিত। বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ্ স্টেলাক্রামারিস (Stellakramrisch) এই যক্ষিণী মূর্তিকে সমুদ্রমন্থনে উদ্ভূত লক্ষ্মী বা মহাভারতে বর্ণিত অপ্সরা পঞ্চচূড়া বলিয়া সনাক্ত করিয়াছিলেন। প্রফেসর জনসন অবশ্য মনে করেন যে এই দেবী মাতৃকা মূর্তি সম্ভবতঃ পূর্ব এশিয়ার উদ্ভূত হইয়াছিলেন। তিনি ইহাকে মিশরের দেবী মাইয়ার (Maiya) সহিত তুলনীয় বলিয়া মনে করেন, যাহার উল্লেখ মিশরে Oxyrhychus Papyrus-এ আছে। অশ্বঘোষের সুন্দরানন্দ কাব্যেও মায়াদেবীর উল্লেখ আছে। কাজেই এই মূর্তির মূল পরিকল্পনা, ভারতীয় কি বহির্ভারতীয় তাহার সুষ্ঠু সমাধান তর্কসাপেক্ষ। এই যক্ষিণী মূর্তির সুন্দর পোশাক-পরিচ্ছদ ও তাহার কেশবিন্যাসের রীতি ও অলঙ্কার সজ্জা ইহাকে মনোরম সৌন্দর্যমণ্ডিত করিয়াছে। এই অপূর্ব সুন্দরীর চুলের কাঁটা, তলোয়ার, অস্ত্র ও আয়ুধের ধাঁচে তৈরী। তাহার কোটিদেশে অনন্ত যৌবনের প্রতীক অনবদ্য মেখলা। ভারতীয় পোড়ামাটির শিল্পে ইহার স্থান অনন্য। কেশবিন্যাস, অলঙ্কার সজ্জা ও বেশভূষার কমনীয়তা এবং সৌকুমার্য ইহাকে দ্বিতীয় শতাব্দীর শুঙ্গ রীতির প্রতিনিধি বলিয়াই সকলে মনে করেন। এই ধরনের যক্ষিণী মূর্তি ভারতবর্ষে খুবই বিরল।[১৪]

বিংশ শতাব্দীতে তাম্রলিপ্তের বিলুপ্ত প্রত্ন সম্পদের প্রতি আগ্রহ ১৯৩০ সালে আবার নূতন করিয়া সাড়া জাগায়। এই সময় প্রত্নতত্ত্ব অধিকারের সহকারী সর্বাধ্যক্ষ T. N. Rama Chandran কয়েকটি অত্যন্ত বৈচিত্র্যপূর্ণ মৃৎপাত্র তমলুক হইতে সংগ্রহ করিয়া আর্টিবাস এশিয়া (Artibus Asiae, Vol. XIV) নামক বিখ্যাত প্রত্ন বিষয়ক পত্রিকায় প্রকাশ করিলে তাহা বিশেষজ্ঞ মহলে বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টি করে। অজ্ঞাত যুগের আবিষ্কৃত এই মৃৎকলস

দুইটির গঠনভঙ্গি ও তাহাদের সুসামঞ্জস্য আকৃতি, পত্র শ্রেণী, স্বস্তিকা চিহ্ন, পুষ্প চিত্র এবং বিন্দুনিকরা বেত ও তৃণদণ্ড প্রাচীন মিশরে ক্রীট দ্বীপ ও গ্রীসদেশের মূল ভূখণ্ডে অবস্থিত মাইসেনির কৌলাল (Pottery) রীতিকে স্মরণ করাইয়া দেয়। সুপ্রাচীন মিশর ও গ্রীসের মৃৎপাত্রের সহিত এই সাদৃশ্য স্বভাবতই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ ইহার পটভূমিকা তাম্রলিপ্তের ইতিহাসকে অনিবার্যভাবে আরও অনেক এবং আরও সুদূর ও অভিনব পরিসর দান করিতে সক্ষম। এই অমূল্য প্রত্নবস্তুসমূহ বর্তমানে ঠাকুরপুরের অদূরে গুরুসদয় সংগ্রহশালায় রক্ষিত আছে। এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যাইতে পারে সিন্ধু উপত্যকায় আবিষ্কৃত মহেঞ্জোদড়োর ধ্বংসাবশেষ এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের সহিত এই সব পুরাবস্তু আবিষ্কৃত হইয়াছে যাহার দ্বারা সুদূর অতীতে ভারতবর্ষের সহিত পশ্চিম এশিয়া এবং মধ্যপ্রাচ্যের সভ্যদেশগুলির সহিত সংযোগের সম্ভাবনা আরও উজ্জ্বল হইয়া দেখা দিয়েছে।[১৫]

১৯৫০ সালের পরবর্তীকালের পশ্চিমবঙ্গের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধিকর্তা পরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয় তমলুকের স্থানীয় কলেজের অধ্যাপক হিসাবে যোগদান করেন। তিনি এখানে পাঁচ বৎসর থাকাকালীন তমলুক ও তাহার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে মাঝেমাঝেই অনুসন্ধান করিয়া বহু অমূল্য প্রত্নসম্ভার সংগ্রহ করিয়াছেন। তাহার সংগৃহীত প্রত্ন সামগ্রীর অধিকাংশই পোড়ামাটির বিভিন্ন মূর্তি। এই অমূল্য প্রত্ন সামগ্রী সেই সময়ে তমলুকে সংরক্ষণের কোন ব্যবস্থা করা হয় নাই। সেজন্য সে সব আবিষ্কৃত প্রত্নবস্তু বর্তমানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আশুতোষ সংগ্রহশালায় সযত্নে রক্ষিত আছে। প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ে গভীর আগ্রহে এবং অদম্য উৎসাহে অধ্যাপক দাসগুপ্ত মহাশয় শুধু সংগ্রহ করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন না তিনি সব্যসাচীর ন্যায় ইংরেজী ও বাংলা উভয়ভাষায় অসংখ্য প্রবন্ধ বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় সেই সময় প্রকাশ করেন। তাহার আবিষ্কৃত মূর্তি ও মৃৎপাত্রসমূহ শিল্পরীতির বিচারে মৌর্য, শুঙ্গ, কুষাণ, গুপ্ত ও পাল যুগের বলিয়া চিহ্নিত হইয়াছে। তিনি নিজেই প্রসঙ্গত তাহার আবিষ্কৃত কয়েকটি মূর্তির বর্ণনা দিয়াছেন। শুঙ্গযুগের যক্ষিণী মূর্তি অপূর্ব সৌন্দর্যমণ্ডিত। তাহার আবিষ্কৃত একটি মূর্তি দ্বিমুখ বিশিষ্ট। তাহাদের মস্তকে রোমান ধরনের শিরস্ত্রান পরা। তিনি তাহাকে প্রাচীন রোমান যুগের দেবতা জানুস (Janus) বলিয়া মনে করেন। ইহা সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় প্রথম-দ্বিতীয় শতকে নির্মিত। ইহা ছাড়া ছিল দণ্ডায়মান পুরুষ মূর্তি, সম্ভবতঃ কোন শক যোদ্ধার। ইহার বলিষ্ঠ ও ব্যক্তিত্বপূর্ণ আকৃতি বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য, ইহা ছাড়া মৌর্যযুগের কতকগুলি পৌরাণিক অথবা ঐতিহাসিক উপাখ্যান চিত্রিত মৃৎফলকও পাইয়াছিলেন।

এই মূর্তিগুলি প্রসঙ্গে তিনি নিজেই বলিয়াছেন যে এই শিল্পবস্তু সমূহ পর্যবেক্ষণ করিলে এককালে তাম্রলিপ্ত যে প্রাচ্য ও প্রতিচ্যের সভ্যতার মিলনভূমি ছিল তাহাতে কোন সন্দেহ থাকে না। তমলুকের বৈদেশিক ধাঁচে গড়া মূর্তিগুলি প্রমাণ করে যে প্রাচীন বঙ্গের সহিত সুদূর ভূমধ্যসাগর অঞ্চলের নিবিড় যোগাযোগ ছিল। বৈদেশিক সাহিত্যে এই আন্তর্জাতিক বন্দরের যে বিপুল খ্যাতির কথা জানা যায় তাহার পরিপূর্ণ সমর্থন তমলুকে প্রাপ্ত অসংখ্য প্রত্নবস্তুর মধ্যেই আছে। প্রাচীন বাঙ্গালী নাবিকগণের সপ্তসাগর অতিক্রম করার কথা এখন আর মোটেও কল্পনা মনে হয় না। প্রায় দুই হাজার বৎসর পূর্বে বঙ্গের সঙ্গে একদিকে লোহিত সাগর, ভূমধ্য সাগর এবং অন্যদিকে প্রশান্ত মহাসাগরের সহিত যে ঘনিষ্ঠ বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিল তাহা নানাভাবে প্রমাণিত হইয়াছে।

এই সমস্ত পোড়ামাটির মূর্তিগুলির মধুর লালিত্য ও সূক্ষ্ম মাধুর্য লক্ষ্য করা যায়। কাজেই তাম্রলিপ্তে পোড়ামাটির মূর্তিগুলি প্রাচীন বাঙ্গালীর অতুলনীয় সাংস্কৃতির গরিমারই সাক্ষ্য বহন করে।[১৬]

পরেশচন্দ্র দাসগুপ্ত মহাশয়ের দীর্ঘ ও অক্লান্ত প্রচেষ্টার ফলে যে সব প্রত্নবস্তু আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং তাহার যে মুল্যায়ন তিনি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রবন্ধের মাধ্যমে করিয়াছেন তাহা স্বভাবতই তাম্রলিপ্তের অতীত গৌরবের প্রতি অধিকতর আগ্রহ সঞ্চারে উৎসাহিত করিয়াছে। প্রাচীন তাম্রলিপ্তের ইতিহাস ও তাহার গৌরবকে পুনরুদ্ধারের জন্য যে প্রয়াস চলিতেছে তাহার অন্যতম শ্রেষ্ঠ পথিকৃৎ পরেশচন্দ্র দাসগুপ্ত মহাশয় একথা প্রত্যেক বাঙ্গালীকে কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করিতে হইবে। দীর্ঘকাল যাবৎ বিহারে এবং পরবর্তীকালে ভারতবর্ষের পূর্বাঞ্চলে প্রাচীনতম প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন পাওয়ার সম্ভাবনার কথা অনেক প্রত্নতাত্ত্বিকেরা বিশ্বাস করিতেন না। বিশেষতঃ মর্টিমার হুইলার ও তাহার শিষ্যদের এই ধারণা বদ্ধমূল ছিল যে ভারতবর্ষের প্রাচীনতম প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন কেবলমাত্র উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্তবর্তী অঞ্চলে পাওয়া সম্ভব। তাহারা মনে করিতেন বঙ্গদেশ বিশেষতঃ বঙ্গদেশের পূর্বাঞ্চল সমুদ্রগর্ভ হইতে খুব বেশীদিন আগে উত্থিত হয় নাই। সেইজন্য তাহা সর্বদাই এই অঞ্চলের প্রাচীনত্ব ও সেই সঙ্গে নানা প্রাগ-ঐতিহাসিক প্রত্নবস্তুর প্রাপ্তির সম্ভাবনা একেবারেই বাতিল করিয়া দিয়াছিলেন।

অধ্যাপক দাসগুপ্তের নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গ প্রত্নতত্ত্ব অধিকার ১৯৭৪ সালে বর্ধমান জেলায় বানেশ্বরডাঙ্গা ও পাণ্ডুরাজার ঢিবিতে উৎখনন কার্য চালাইয়া

এই অঞ্চলে তাম্রশ্মীয় যুগে (Chalcolithic) নানা নিদর্শন আবিষ্কার করিয়াছেন।[১৭] বঙ্গদেশের কোন অঞ্চলে এই যুগের সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া খুবই আশ্চর্যের বিষয়। স্বভাবতই এই আবিষ্কার পণ্ডিত মহলে খুবই আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছিল। প্রথম অবস্থায় ইহাতে নানা সন্দেহের ও বিতর্কের অবতারণা হইয়াছিল। কিন্তু অধ্যাপক দাসগুপ্তের অজয় নদীর তীরে তাম্রশ্মীর যুগের প্রত্নবস্তু আবিষ্কারের দাবি পণ্ডিতমহলে স্বীকৃত হইয়াছে। ঠিক ঐ তাম্রশ্মীরে যুগের প্রত্নবস্তুর নিদর্শন পরবর্তীকালে তাম্রলিপ্ত অঞ্চলেও পাওয়া গিয়াছে। বঙ্গদেশের প্রত্নতাত্ত্বিক ইতিহাসের এই প্রাচীনতা এখন সর্বজনগ্রাহ্য। ইহার পশ্চাতে অধ্যাপক দাসগুপ্তের একক প্রচেষ্টা বিশেষভাবে স্মরণীয়।

তাম্রলিপ্তের অতীত ইতিহাস অনুসন্ধানের কাজে ভারতের পুরাতাত্ত্বিক সমীক্ষা বিভাগের পূর্বাঞ্চলীয় শাখা ১৯৫৫ ও ১৯৭৫ সালে দুইবার বৈজ্ঞানিক উপায়ে উৎখননের ব্যবস্থা করেন। ১৯৫৫ সালের উৎখননের উপরে একটি ছোট রিপোর্ট ইণ্ডিয়ান আর্কিওলজিতে প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহা ছাড়া এই উৎখননের কোন বিস্তারিত বিবরণ অথবা প্রান্তবস্তুর ছবি কোথাও প্রকাশিত হয় নাই। ১৯৫৫ সালে তমলুকের ৭টি বিভিন্ন অঞ্চলে উৎখননের ফলে মোটামুটি পাঁচটি যুগের অধিবসতির স্তর আবিষ্কৃত হইয়াছিল। ইহাতে নব্যপ্রস্তর যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া একেবারে আধুনিককাল পর্যন্ত মানব সভ্যতার বিভিন্ন ধারার প্রবাহ প্রকাশিত হইয়াছে। অবশ্য মাঝেমাঝে এই ধারাগুলির অব্যাহত গতি স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। উক্ত রিপোর্টের শেষস্তরের কোন চিহ্ন দেওয়া হয় নাই। প্রথম চারিটি যুগকে (১) (২) (৩) (৪) এইভাবে চিহ্নিত করা হইয়াছে।

প্রথম স্তরে পাওয়া গিয়াছে নব্য প্রস্তর যুগের (Neolithic) কুঠার ও আধ-পোড়া মৃৎপাত্র এবং অনেকগুলি ক্ষুদ্রপ্রস্তরের (Microlithic) আয়ুধ। ইহা ছাড়াও হাড়ের তৈরী ছোট পাত্র এবং কতকগুলি ক্ষুদ্র তাম্রপাত্র এই স্তরে পাওয়া গিয়াছে। এই সমস্ত প্রত্নবস্তুর মধ্যে তাম্রলিপ্তের প্রাচীনত্ব প্রমাণিত হইলেও তখনও পর্যন্ত তাম্রলিপ্ত একটি সমৃদ্ধ বন্দরনগরীতে রূপান্তরিত হইয়াছিল এইরূপ কোন আভাস পাওয়া যায় নাই। এই যুগটি ছিল খ্রীষ্টপূর্ব কয়েক শতাব্দী আগের।

দ্বিতীয় স্তরে পাওয়া গিয়াছে মৌর্য ও শুঙ্গ যুগের সুন্দর পোড়ামাটির মূর্তি, ছাঁচে ঢালাই তাম্রমুদ্রা (Cast Coin), ঐ চিহ্নিত মুদ্রা (Punchmarked Coin) এবং এই যুগে অন্যান্য স্থানে প্রাপ্ত বিশেষ ধরণের উত্তর ভারতীয় মসৃণ কালো

মৃৎপাত্র যাহা N.B.P. নামে চিহ্নিত (Northern Black Polish Ware)। ইহা ছাড়াও অনেক পুঁতি (Beads), মূল্যবান এবং অল্প মূল্যবান প্রস্তর পাওয়া গিয়াছে।

তৃতীয় স্তর যাহা মোটামুটিভাবে শুঙ্গ, কুষাণযুগ রূপে চিহ্নিত (খ্রীষ্ট পূর্ব প্রথম শতাব্দী হইতে খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দী) তাহাতে সবচেয়ে বেশী মূল্যবান প্রত্নসামগ্রী আবিষ্কৃত হইয়াছে। কারণ এই সময়টি তাম্রলিপ্তের বন্দরনগরী হিসাবে সবচেয়ে সমৃদ্ধির সময়। কাজেই এই সময়কার প্রাপ্ত বস্তুর মধ্যে তাহার সেই বাণিজ্যিক সমৃদ্ধি স্পষ্টভাবে লক্ষিত হয়। বন্দরনগরী তাম্রলিপ্তের সঙ্গে তখন সমুদ্রপথে রোমের সহিত ঘনিষ্ঠ বাণিজ্যিক সংযোগ স্থাপিত হইয়াছিল। কাজেই এই সময়কার আবিষ্কৃত মৃৎপাত্রের মধ্যে রোমান রীতিতে গঠিত বিশেষধরণের পাত্র দেখা যায়। রোমান সভ্যতার মধ্য হইতে উদ্ভূত বিশেষ ধরণের রেখাঙ্কিত পাত্র (Rulated Ware) এবং জলের ঝারি রোমান প্রভাবকে স্মরণ করাইয়া দেয়। ইহা ছাড়া নানা আকৃতির ও রীতিতে গঠিত অসংখ্য পোড়ামাটির মূর্তি এই স্তরে পাওয়া গিয়াছে। এই সমস্ত মূর্তির পোশাকে ব্যবহৃত বস্ত্র এবং তাহার পরিধান রীতি কোন কোন ক্ষেত্রে রোমান রীতির সমতুল্য। রোমান শিল্পরীতির ভাবধারা এই মূর্তি শিল্পীদের যে প্রভাবিত করিয়াছিল সেবিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নাই। এ্যাগেড পাথরের পুঁতির মালাও ঐ স্তর হইতে পাওয়া গিয়াছে।

চতুর্থ স্তরটি মোটামুটিভাবে গুপ্তযুগের। যাহার পরিধি মোটামুটিভাবে ষষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত। এই স্তরটি খুব বিন্যস্ত নয়। কারণ এই স্তরে তৃতীয় ও চতুর্থ শতকে কিছু পোড়ামাটির মূর্তিও পাওয়া গিয়াছে। মোটকথা এই স্তরে আবিষ্কৃত পোড়ামাটির বস্তু খুব একটা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে পাওয়া যায় নাই। এই স্তরে প্রাপ্ত একটি মাত্র সুন্দর পোড়ামাটির মূর্তির নিম্নাঙ্গের উল্লেখ করা যায়। তাহার অঙ্গে সূক্ষ্ম ভাঁজের স্বচ্ছ বস্ত্রের আবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। রমনীয় ভাস্কর্যের এই নমুনা আদিগুপ্ত যুগের ভাস্কর্যের একটা রীতি হিসাবে পরিচিত।

১৯৭৫ সালে উৎখননের ফলে তমলুকের পোষ্টঅফিসের নিকটবর্তী অঞ্চলে একটি ইষ্টকনির্মিত কুঁয়া, কতকগুলি পোড়ামাটির গোলাকার বেড়িযুক্ত কুয়া পাওয়া গিয়াছিল। এই দুইটিকেই মৌর্য, শুঙ্গ যুগের বলিয়া অনুমান করা হয়। দ্বিতীয় স্তরে শুঙ্গ, কুষাণ যুগের অনেক সংখ্যক বিভিন্ন ধরনের মূর্তি, শীলমোহর এবং প্রচুর পরিমাণে চিহ্নযুক্ত ও ছাঁচেঢালাই মুদ্রা এবং নানাপ্রকার পুঁতির

মালা ও মূল্যবান এবং অল্প মূল্যবান প্রস্তর পাওয়া গিয়াছে। আশ্চর্যের বিষয় এইখানে গুপ্তযুগের তেমন কিছু মুল্যবান সামগ্রী পাওয়া যায় নাই।[১৮]

উনবিংশ শতকের মধ্যভাগ হইতে তমলুক ও তাহার নিকটবর্তী অঞ্চলে মাঝেমাঝে ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে প্রাচীন মুদ্রা ও অন্যান্য প্রত্নবস্তু প্রাপ্তিকালে জনমানসে এ সম্পর্কে একটা সাধারণ কৌতূহল সর্বদা ছিল। এখানকার স্থানীয় হ্যামিল্টন (Hamilton School) স্কুলে বিশেষভাবে বিদ্যাসাগর মহাশয় ব্যবহৃত কিছু কিছু সামগ্রী সংগ্রহকে কেন্দ্র করিয়া একটি ক্ষুদ্র সংগ্রহশালা গড়িয়া উঠিয়াছে। তাহাতে ইতস্তত প্রাপ্ত কিছু প্রত্নবস্তুও ক্রমে ক্রমে সংগৃহীত হইয়াছে। বিংশ শতকে পঞ্চাশের দশকে পরেশচন্দ্র দাসগুপ্ত মহাশয়ের প্রচেষ্টায় তমলুকে সেই প্রাচীন কৌতূহল পুনরুজ্জীবিত হয়। সেই সময়ে বিশেষতঃ ১৯৫৫ সালের পরবর্তী সময়ে একান্তভাবে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় সংগ্রহশালা গঠনেরও চেষ্টা হয়। এই সমস্ত চেষ্টার ফলশ্রুতি ব্যক্তিবিশেষের গৃহ প্রাঙ্গনে রহিয়াছে। সেই সব প্রত্নবস্তু অনুসন্ধিৎসু গবেষকদের কৌতূহল নিবৃত্তির কাজে সাহায্য করে।

অধ্যাপক দাসগুপ্ত মহাশয়ের অনুসন্ধানের সহিত প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত সেযুগের তাঁহার কিছু ছাত্রের মনে একটি প্রশ্ন বারংবার জাগিয়াছিল তাহা হইল তমলুকে সংগৃহীত প্রত্নবস্তু সমূহ একক প্রতিষ্ঠান হিসাবে এখানেই রাখা যায় কিনা? পঞ্চম ও ষষ্ঠ দশকে এই প্রশ্নের কোন সদুত্তর পাওয়া সম্ভব হয় নাই। ১৯৬৪ সালে স্থানীয় একজন লেখক, সাংবাদিক এবং সংগ্রাহক 'বৃহত্তর তাম্রলিপ্তের ইতিহাস' নামে একটি পুস্তক প্রকাশ করেন। এই পুস্তকটির দশম অধ্যায়ের শেষদিকে তিনি সরকারকে তমলুক শহরে একটি সংগ্রহশালা প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য অনুরোধ করেন। মনে হয় ইহার দ্বারা তিনি এই অঞ্চলের জনগণের দীর্ঘদিনের একটি সুপ্ত ইচ্ছাকে ভাষায় প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই পুস্তকটি ১৩টি অধ্যায়ে বিভক্ত যাহার অনেকগুলি লোককথা, প্রবাদ এমনকি কিংবদন্তীর উপর নির্ভর করিয়া রচিত। সেজন্য প্রচুর তথ্য থাকিলেও ইহাকে ঠিক বিজ্ঞান সম্মত ইতিহাস বলিয়া গ্রহণ করা যায় না।

১৯৭৩ সালে তমলুকের কয়েকজনের চেষ্টায় একটি সংগ্রহশালা স্থাপনের প্রচেষ্টা শুরু হয়। যাহার পরিণতি হয় ১৯৭৫ সালে তমলুকের পৌরভবনে 'তাম্রলিপ্ত সংগ্রহশালা ও গবেষণা কেন্দ্রের' উদ্বোধনের মাধ্যমে। বিভিন্ন ধরনের প্রত্নবস্তু সম্ভারে সমৃদ্ধ এই সংগ্রহশালায় রক্ষিত প্রত্নবস্তুর সংখ্যা কয়েক হাজার। ফলে ইহা অল্প সময়ের মধ্যেই প্রত্ন বিশারদদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। প্রধানত

এখানকার সংগৃহীত পোড়ামাটির প্রত্নবস্তুর বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে ১৯৭৮ সালে ভারতের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের একজন উচ্চপদস্থ অফিসার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে Ph.d. ডিগ্রী লাভ করেন। এই গবেষণাপত্র ১৯৮১ সালে যখন পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় তখন তিনি তাহাতে এখানকার বহু পোড়ামাটির মূর্তির ছবি প্রথম প্রকাশ করেন যাহা প্রত্নতত্ত্ব মহলে খুবই আগ্রহের সৃষ্টি করে।

নীহাররঞ্জন রায় তাহার 'বাঙ্গালীর ইতিহাসে' এই সংগ্রহশালার নয়টি পোড়ামাটির মূর্তির ছবি (৩য় সংস্করণ) প্রথম প্রকাশ করিয়াছেন। তাহার মধ্যে কতকগুলিকে তিনি খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় ও দ্বিতীয় শতাব্দীর এবং কতকগুলিকে তিনি প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ শতাব্দীর মনে করেন। তিনি গান্ধার ও গ্রীকো রোমান শিল্পের প্রভাব কোনটির মধ্যে লক্ষ্য করিয়াছেন। এখানে সংগৃহীত প্রত্নবস্তুর সামগ্রিক মূল্যায়ন করা সম্ভব নয়। কারণ তাহার জন্য বহু গবেষণার প্রয়োজন। অনেকেই অবশ্য গবেষণার কাজে এখানকার বিভিন্ন প্রত্নবস্তুর সাহায্য লইয়াছেন এবং লইতেছেন। প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে এখানকার সংগৃহীত প্রত্নবস্তু সম্পর্কে তাহাদের মূল বক্তব্যগুলির কিছুটা অনুধাবন করা প্রয়োজন।

পূর্বেই বলা হইয়াছে বিশেষজ্ঞেরা তাম্রশ্মীয় সভ্যতার নিদর্শন সম্পর্কে মোটামুটি নিশ্চিন্ত। সাম্প্রতিককালে এই অঞ্চলে কিছু শিলীভূত (জীবাশ্ম) (Fossilised) অস্থি ও কাষ্ঠ নির্মিত হাতিয়ার সংগ্রহ করা হইয়াছে। অনেকে অনুমান করেন ইহাতে মেসোলিথিক পূর্ব (Mesolithic) মানব সভ্যতার অস্তিত্ব এখানে থাকা অমূলক নয়। নিঃসন্দেহে এই সমস্ত দাবি খুবই দুঃসাহসিক। প্রকৃত বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ভিন্ন এ সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা খুবই শক্ত।[১৯]

এখানকার আর একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার হইল তামার কুঠার (Copper celt)। ১৯৭৫ সালে তৎকালীন ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের সহ-অধিকর্তা ইহা দেখিয়া অত্যন্ত চমৎকৃত হইয়াছিলেন। তাহার মতে ইহার বয়সকাল কমপক্ষে ২০০০খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ।[২০]

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবসর প্রাপ্ত অধ্যাপক কল্যাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায় এখানকার সংগৃহীত প্রত্নবস্তু সম্পর্কে মন্তব্য করিয়াছিলেন যে অতি প্রাচীনকালে তৈরী নানা আকারে নানা বৈচিত্র্যপূর্ণ সমৃদ্ধ মৃৎপাত্রসমূহ প্রাচীন সাংস্কৃতিক পরিচয়ে বিশেষভাবে মূল্যবান। এখানকার প্রস্তর নির্মিত একটি চক্রের উপর নারী মূর্তিকে তিনি প্রাক্ মৌর্যযুগের পরিচয়বাহী বলিয়া মনে করেন। তাঁহার ধারণা এখানকার অন্যান্য পোড়ামাটির মূর্তিসমূহ তাহার ঐশ্বর্য, গঠন

ও অঙ্গসজ্জা এক অপরূপ কল্পলোকের পরিচয় সমৃদ্ধ। তাহাদের অভাবনীয় ঐশ্বর্য, সমৃদ্ধি স্বচ্ছলতা ও রুচি পরিশীলনের জন্য ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করিবে বলিয়া তিনি বিশ্বাস করেন।[২১]

পরেশ দাসগুপ্ত মহাশয় এখানকার মৃৎপাত্রগুলি সম্পর্কে নানা উচ্ছ্বসিত মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। লাল রং-এর মসৃণ গোলাকৃতি, উপর দিক সরু এই ধরণের মৃৎপাত্র সহজেই ভূমধ্যসাগরীয় চিরাচরিত মৃৎপাত্রের রীতিকে স্মরণ করাইয়া দেয়। ইহাদের আকৃতি ও সাদৃশ্য ১৯৩০ সালে রামচন্দ্রন কর্তৃক সংগৃহীত মৃৎপাত্রগুলির সহিত সহজে তুলনীয়। এখানকার অধিকাংশ মৃৎপাত্রই ভগ্ন। এই মৃৎপাত্রগুলি কিছু হাতে কিছু বা ঘোরানো চাকায় তৈরী। এই ভগ্ন মৃৎ-পাত্রগুলির উপর নৌকা, মাছ, ফুল, জীবজন্তু, সরলরেখা, বক্ররেখা, উজ্জ্বল তারকা চিহ্নিত দেখা যায়। এই ধরণের মৃৎপাত্র যাহাতে দাঁড় সমন্বিত নৌকা ও পালের চিহ্ন আছে তাহা সহজেই সমুদ্রগামী জনজীবনকে স্মরণ করাইয়া দেয়। এই ধরণের নৌকার ছবি মিশরের Hierakonpolis-এর দেওয়ালে দেখিতে পাওয়া যায়। অর্থাৎ এই মৃৎপাত্রগুলি ভূমধ্যসাগরীয় অর্থাৎ মিশর ও ক্রীট অঞ্চলের মৃৎপাত্রের রীতির সমগোত্রীয়। পূর্ব ভারতের এই ধরণের প্রত্নসামগ্রী খুবই বিরল।

পোড়ামাটির মূর্তিগুলির কোন কোনটিতে স্পষ্টভাবে গ্রীকো-রোমান প্রভাব তিনি লক্ষ্য করিয়াছেন। এখানকার প্রাপ্ত যক্ষিণী মূর্তির মধ্যে একটি বিশেষভাবে সেই বিখ্যাত অক্সফোর্ড যক্ষিণীর সমগোত্রীয়। তাহার মতে শুঙ্গ, কুষাণ যুগে নির্মিত পোড়ামাটির যক্ষিণী অথবা অপ্সরাদের মনোরম কেশবিন্যাসে রত্নালঙ্কারের সমাবেশে এবং পরিচ্ছদের স্বচ্ছতায় যে মাধুর্য প্রকাশিত হইয়াছে তাহার স্থান প্রাচীন গাঙ্গেয় উপত্যকায় মৃন্ময় ভাস্কর্য শিল্পে অনন্য।

ইহা ছাড়া বৌদ্ধজাতক ও অন্যান্য পৌরাণিক কাহিনীর চিত্র সমন্বিত বহু পোড়ামাটির মৃৎফলক এখানে সংগৃহীত হইয়াছে। একটি ভগ্ন বৌদ্ধ পোড়া-মাটির ফলক পাওয়া গিয়াছে। যাহাকে তিনি ধর্মচক্র প্রবর্তন মুদ্রার প্রতীক বলিয়া মনে করেন। গুপ্তযুগের এই ভগ্নমূর্তিটি সারনাথের বৌদ্ধমূর্তির ধ্যানগম্ভীর প্রতীক বহন করিতেছে। ইহা ছাড়া সম্ভবতঃ একটি পরিপূর্ণ বোধিসত্ত্ব মস্তকও পাওয়া গিয়াছে। ইহা বঙ্গদেশের বৌদ্ধধর্ম ও শিল্পরীতির ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন। কুঞ্চিত কেশদাম, নিমীলিত চক্ষুদ্বয় ও নিবদ্ধ ওষ্ঠের মধ্যে বুদ্ধের ধ্যানগম্ভীর চিত্রটি স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।[২২]

এই সমস্ত অনুসন্ধানের ফলে আবিষ্কৃত পুরাবস্তুসমূহ সম্পর্কে বিশেষজ্ঞরা যে

সমস্ত অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন ভবিষ্যতে তাহা যদি আরও বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে সর্বজনগ্রাহ্য বলিয়া প্রমাণিত হয় তাহা হইলে ভারতবর্ষের এই পূর্বাঞ্চলের সংস্কৃতি ও সভ্যতার ইতিহাসের বয়সকাল মহেঞ্জদাড়োর সমসাময়িক অথবা তাহারও পূর্ববর্তী সময়ের বলিয়া গৃহীত হইতে পারে।

অনেকে মনে করেন বর্তমান তমলুক কি সেই তাম্রলিপ্ত? আকস্মিক এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়ত সম্ভব নয়। এই মন্তব্য করিয়াছেন অধ্যাপক কল্যাণ কুমার গঙ্গোপাধ্যায়। অধ্যাপক নীহাররঞ্জন রায় পরিষ্কারভাবেই বর্তমান তমলুক অতীতের তাম্রলিপ্ত এই বক্তব্য সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। তাহার মতে অতীতের বন্দরনগরী তাম্রলিপ্ত বর্তমান তমলুক হইতে অনেক দূরে প্রাচীন সরস্বতী নদীর তীরে কোথাও অবস্থিত ছিল।[২৩]

কিন্তু দেখা যাইতেছে অধিকাংশ লেখক, সাহিত্যিক এবং পুরাতত্ত্ববিদ্‌রা মোটামুটিভাবে বর্তমান তমলুকেই অতীতের তাম্রলিপ্ত বলিয়া মনে করেন। এই প্রসঙ্গে মেগাস্থিনিসের বিবরণের অনুবাদক J. W. Crindle, H. H. Wilson, Asiatic Research-এর Vol. VIII, Imperial Gazetteer of India, Vol. IV, Journal of Royal Asiatic Society, Vol. V, রাজেন্দ্র-লাল মিত্র, রমেশচন্দ্র মজুমদার, ক্যানিংহাম, এলফিন্‌স্টোন, ডব্লু, ডব্লু, হান্টার, দীনেশ চন্দ্র সরকার ও পরেশ চন্দ্র দাসগুপ্তের নাম স্মরণ করা যাইতে পারে। সাহিত্যিকদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হইলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় তাহার বাঙ্গালী জাতির পরিচয় সম্পর্কে লিখিতে গিয়া তাম্রলিপ্ত বা তমলুককে ঐতিহাসিক পূর্বযুগ হইতে একটি শ্রেষ্ঠ সাগরতীর্থ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তাহার মতে ইহা ছিল ভারতবর্ষের পূর্বদ্বার স্বরূপ। তিনি "তমলুক বাঙালীকে একটা অপূর্ব বিশিষ্টতা দিয়া রাখিয়াছে" বলিয়া মন্তব্য করেন।[২৩]

ভারতীয় এবং বিদেশী প্রায় সমস্ত পুস্তকে প্রাচীন তাম্রলিপ্তকেই বর্তমান তমলুক বলিয়াই চিহ্নিত করা হয়। ইহাতে কাহারও কাহারও সন্দেহের অবকাশ থাকিলেও যতক্ষণ না সেই সন্দেহ তথ্য দ্বারা গ্রাহ্য বলিয়া প্রমাণিত হয় ততদিন পর্যন্ত বর্তমান তমলুকই অতীতকালের বন্দর নগরী তাম্রলিপ্ত অধিকাংশ লেখক ও ঐতিহাসিকের এই মতামত গ্রাহ্য না করিবার পক্ষে কোন যুক্তি আছে বলিয়া মনে হয় না।

সূত্র নির্দেশ

১। ত্রৈলোক্যনাথ রক্ষিত, তমোলুকের ইতিহাস (১৩৭৯), পৃঃ ৩-৫
যোগেশচন্দ্র বসু, মেদিনীপুরের ইতিহাস (১৩৪৬), পৃঃ ৫৮-৬৩
দীনেশচন্দ্র সরকার, 'বন্দর নগরী তাম্রলিপ্ত' (ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে তাম্রলিপ্ত), পৃঃ ৯-১০

২। রক্ষিত, পূর্বে উল্লিখিত, পৃঃ ৬-১০, ১৩-৪৫, ৪৬-৬৪
History of Bengal, p. 492

৩। বিনয় ঘোষ, পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি (২য় খণ্ড), ১৯৭৮, পৃঃ ৩৪-৩৫

৪। History of Bengal, op. cit., pp. 39, 412-415
বসু, পূর্বে উল্লিখিত, পৃঃ ১০৬-১০৮

৫। সরকার, পূর্বে উল্লিখিত, পৃঃ ১৪-১৫
P. C. Dasgupta, The Archaeological Treasures of Tamralipta, p. 2-3

৬। নীহাররঞ্জন রায়, বাঙ্গালীর ইতিহাস (১৯৮০), পৃঃ ১১৬-১২৭
History of Bengal, Vol. 1, p. 659-668

৭। রামপ্রসাদ চন্দ, গৌড়রাজ মালা (১৯৭৫), পৃঃ ৩-৪
পরেশচন্দ্র দাসগুপ্ত, প্রত্নতত্ত্বের আলোকে তাম্রলিপ্ত (নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন পত্রিকা, ১৯৭৪ পৃঃ ৬
বসু, পূর্বে উল্লিখিত, পৃঃ ৩

৮। রায়, পূর্বে উল্লিখিত, পৃঃ ১৫৭-১৫৮

৯। তদেব, পৃঃ ৭২৬-৭২৭
History of Bengal, op. cit., pp. 427-428, 609

১০। Ibid, p. 266-268
রায়, পূর্বে উল্লিখিত, পৃঃ ১৯৬-১৯৯
রক্ষিত, „ „ পৃঃ ৭৩, ৭৭, ৭৯

১১। রায়, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ-২০৯ ২১১, ৩৫৬-৩৬০।
History of Bengal op. cit 664-669.

১২। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, বাঙ্গালার ইতিহাস (প্রথম খণ্ড), ১৯৭১, পৃঃ ২৪-২৫

১৩। বসু, পূর্বে উল্লিখিত, পৃঃ ৮০-৮১

১৪। S. S. Biswas, Terracotta Art of Bengal (1981), pp. 74-76
P. C. Dasgupta, op. cit. p 5.

১৫। পরেশচন্দ্র দাসগুপ্ত, পূর্বে উল্লিখিত পৃঃ ৭

১৬। তদেব 'দৈনিক যুগান্তর' রবিবার (১৪ই শ্রাবণ, ১৯৬০) উদ্ধৃত যুধিষ্ঠির জানা "বৃহত্তর তাম্রলিপ্তের ইতিহাস" (১৩৭১), পৃঃ ২২৮-৩০

১৭। „ রায় পূর্বে উল্লি খত পৃঃ ৯২৩

১৮। Nihar Ray, 'Tamralipta and Gange' ,Geographical Review of India, Vol 41, No.-3, Sept 1979, p. 208

১৯। "Unique fossils found in Tamluk", P. K. Mandal, The Telegraph 15th feb. 1984

২০। The statesman 1st may (cal) 1975

২১। কল্যাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মন্তব্য "তাম্রলিপ্ত সংগ্রহশালা ও গবেষণা কেন্দ্র" দর্শকের নথি (Visitors Book) 2.7.76.

২২। P. C. Dasgupta, op. cit, pp. 4, 5, 8
S. S. Biswas ,, pp. 192-198 (Plate no. LXB, C)

২৩। Nihar Ray. op, cit, p. 208
নীহাররঞ্জন রায়, পূর্বে উল্লিখিত, পৃঃ ৩৮৫

২৪। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনাবলী (প্রথম খণ্ড), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ১৩৭৯, পৃঃ ২১৩-২১৪

সপ্তম অধ্যায়

জনগোষ্ঠী ও তাহাদের সাংস্কৃতিক বিবর্তন

ভারতবর্ষের ইতিহাসের মত বঙ্গদেশের সঠিক তারিখযুক্ত প্রাচীন ইতিহাসের ও সূচনা আলেকজাণ্ডারের আক্রমণের সমকালেই হইয়াছিল বলা চলে (৩২৬ খ্রীঃ পূঃ)। এই ঘটনার বহু পূর্ব হইতেই বঙ্গদেশে সম্ভবতঃ কোন না কোন প্রকার রাজনৈতিক ও সামাজিক সংস্থার অস্তিত্ব ছিল বলিয়া মনে হয়। তবে তাহাদের সম্বন্ধে কোন নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায় নাই।

প্রাচীন বৈদিক সাহিত্যে বঙ্গদেশের বিশেষ কোন উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। ঐতেরেয় ব্রাহ্মণে ও ঐতেরেয় আরণ্যক গ্রন্থে বঙ্গদেশ ও বাঙ্গালীর জাতি সম্পর্কে যে সমস্ত উল্লেখ আছে তাহা সবই নিন্দাসূচক (যেমন অনার্য, দস্যু প্রভৃতি)।[১]

এইসব উক্তি হইতে সহজে অনুমান করা যায় যে বঙ্গদেশের আদিম অধিবাসীরা জাতিগত দিক হইতে এবং ভাষা ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে আর্যদের অপেক্ষায় সম্পূর্ণ পৃথক এক গোষ্ঠী ছিল। নৃতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে ইহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। বঙ্গের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর বিস্তৃত বিচার বিশ্লেষণের অবকাশ বা প্রয়োজন নাই। তথাপি বঙ্গদেশের প্রাথমিক যুগের ইতিহাসের মোটামুটি গতিপ্রকৃতি সম্যক্‌ভাবে উপলব্ধি করিবার জন্য এখানকার অধিবাসীদের সম্পর্কে কিছু ধারণা আবশ্যক।

মোটামুটিভাবে বঙ্গদেশের আদিম জনগোষ্ঠীকে দুইভাগে ভাগ করা যায়। একটি ছিল উপজাতি গোষ্ঠী যথা—শবর, পুলিন্দ, হাড়ি, ডোম, চণ্ডাল, ইত্যাদি। যাহাদের সমাজে অস্পৃশ্য বলিয়া গণ্য করা হইত এবং অন্য একটি যাহা উচ্চতর জাতিগোষ্ঠীর অন্তর্গত।

প্রথমোক্ত গোষ্ঠীর অধিকাংশই বঙ্গদেশে বসবাসকারী আদিম জনগোষ্ঠীর অন্তর্গত। এই মানব গোষ্ঠীকে 'অস্ট্রো এশিয়াটিক' বা 'অস্ট্রিক' এই সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে। বৈদিক সাহিত্যে ইহাদের নিষাদ বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে।[২]

রায়বাহাদুর রমাপ্রসাদ চন্দ্রও এই আদিম অনার্য জাতিগোষ্ঠীকে নিষাদরূপে চিহ্নিত করিয়াছেন। এই জনগোষ্ঠী বঙ্গদেশের আদিমতম জনজীবনে প্রধান

অংশ ছিল। পরবর্তীকালে উচ্চতর সভ্যজাতির সংস্কৃতির ক্রমাগত প্রসারণ ও প্রভাবের ফলে ধীরে ধীরে তাহাদের মধ্যে নানা পরিবর্তন দেখা যায়।

ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বঙ্গদেশের জনগোষ্ঠীর বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে বৈদিক সাহিত্যের অথর্ব বেদ ও সংহিতার পঞ্চম খণ্ডে বঙ্গ ও মগধ দেশের যে জনগোষ্ঠীর উল্লেখ পাওয়া যায় তাহাদের সম্পর্কে বৈদিক ঋষিগণ খুবই অবজ্ঞাসূচক ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন। আর্যগণ তাহাদিগকে পক্ষির সহিত তুলনা করিয়াছেন। অর্থাৎ বৈদিক যুগে এই অঞ্চলে যে আর্যদের বসতি ছিল না সেকথা তিনি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করিয়াছেন।[৩]

নৃতত্ত্ববিদ পণ্ডিতগণ অনুমান করেন যে বঙ্গদেশের আদিম অধিবাসীরা সম্ভবতঃ দ্রাবিড় জাতীয় ছিলেন। অর্থাৎ এই জনগোষ্ঠী দ্রাবিড় ও মঙ্গোলীয়দের সংমিশ্রণে উৎপন্ন। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ও এইমত সমর্থন করিয়াছেন। তবে বর্তমান কালে তাহাদের এই মন্তব্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ ঐক্যমত পাওয়া যায় না। বঙ্গদেশের জাতিগোষ্ঠী আদিমযুগে আর্য ছিলেন না। এই একটি তথ্যে সমস্ত ঐতিহাসিকেরা একমত। তাহাদের জাতিগোষ্ঠী আসলে কি ছিল তাহা এখনও বিতর্কিত বিষয়। বঙ্গদেশের অধিবাসীদের প্রথম অবিসংবাদিত উল্লেখ পাওয়া যায় প্রাচীন মহাকাব্যে যাহা বৈদিক যুগের শেষভাগে রচিত এবং বৌধায়ণ ধর্মসূত্রে।

আর্য সভ্যতার প্রসার

বৈদিক সভ্যতা খুব প্রাচীনকালে মিথিলা পর্যন্ত প্রসারিত হইয়াছিল তাহার স্পষ্ট প্রমাণ বৈদিক সাহিত্যেই আছে। মিথিলা বিহারের উত্তর অঞ্চল। সেখান হইতে বঙ্গদেশে প্রবেশ করা খুবই সহজসাধ্য। কারণ মিথিলা হইতে ব্রহ্মপুত্রের সীমানা পর্যন্ত অনুপ্রবেশের কোন প্রাকৃতিক বাধা নাই। সেজন্য বৈদিক যুগের প্রাথমিক অবস্থায় মিথিলা পর্যন্ত তাহার প্রভাব প্রসারিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গদেশেও কেন তাহা হয় নাই ইহা খুব আশ্চর্যের বিষয়। কোন কোন ঐতিহাসিক এ সম্পর্কে নানামতের অবতারণা করিয়াছেন। অথচ বৈদিক সাহিত্যের যুগে বঙ্গদেশে আর্যদের অনুপ্রবেশের কোন নির্ভরযোগ্য তথ্যই পাওয়া যায় না। অপরদিকে ভাষাগত ও জাতিগত প্রমাণের সাহায্যে তখনও পর্যন্ত বঙ্গদেশে আর্যদের প্রবেশ ঘটে নাই ইহা স্পষ্টভাবে দেখা যায়। ইহার কারণ সম্পর্কে সম্ভবতঃ এই অনুমানই যুক্তিসঙ্গত যে তখন বঙ্গদেশে মোটামুটি একটি উন্নত ধরনের সভ্যতা বিরাজমান ছিল। যদিও সেই সভ্যতা ছিল

বৈদিক সভ্যতার বাহিরে। প্রাচীন মহাকাব্যগুলিতে এবং পরবর্তীকালে বৌদ্ধ ও জৈন সাহিত্যে ধীরে ধীরে বিভিন্ন যোদ্ধা ও সাধুদের দ্বারা আর্যসভ্যতা কিভাবে বঙ্গদেশে প্রসারিত হইয়াছিল তাহার অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

মহাকাব্যের যুগে বঙ্গদেশের অধিবাসীদের আর অসভ্য, অস্পৃশ্য ও অপাঙ্‌ক্তেয় বলিয়া গণ্য করা হইত না। রামায়ণে একদল লোকের তালিকা আছে যাহারা অযোধ্যার অভিজাত ব্যক্তিদের সহিত রাজনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করিয়াছিলেন। এই তালিকায় অঙ্গ, বঙ্গ, মগধের অধিবাসীদের উল্লেখ আছে। সীতাকে খুঁজিবার জন্য যে অনুসন্ধানকারী দলকে প্রেরণ করা হইয়াছিল তাহাদের একটি দলকে পুণ্ড্র ও মান্দারা (সম্ভবতঃ দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গের মান্দারম) অঞ্চলে যাইবার জন্য নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল।

মহাভারতে দ্রৌপদির স্বয়ংবর সভায় উপস্থিত নরপতিদের মধ্যে তাম্রলিপ্তের অধিপতিদের নাম উল্লিখিত আছে পূর্বেই বলা হইয়াছে। এই ঘটনা হইতে সহজে অনুমেয় যে এই সময় অথবা ইহার অব্যবহিত পূর্বে বঙ্গদেশের আর্যসভ্যতার প্রসার ঘটিয়াছিল। মহাভারতের সভাপর্বে ভীমের দিগ্বিজয় প্রসঙ্গে যে কাহিনী আছে তাহাতে তাম্রলিপ্তের অধিপতিকে পরাজিত করিবার কথা উল্লেখ আছে। এই তাম্রলিপ্ত তখন কোন স্বাধীন রাজ্য ছিল কিনা তাহা বলা শক্ত। পাণ্ডবদের অশ্বমেধ যজ্ঞে তাম্রলিপ্তের অধিপতি প্রচুর ধনরত্নসহ উপস্থিত হইয়া রাজার প্রহরীর কাজ করিয়াছিলেন দেখা যায়। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধেও তাম্রলিপ্তের অধিপতি পাণ্ডবদের বিপক্ষে কৌরবদের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন বলা হইয়াছে।

মহাভারতের 'বনপর্বে' তীর্থযাত্রা অংশে উল্লেখ আছে গঙ্গা যেখানে সমুদ্রের সহিত মিলিত হইয়াছে সেই সঙ্গমস্থলটি (গঙ্গাসাগর) অতি পবিত্র তীর্থস্থান। নিম্নগঙ্গা অঞ্চলের মহা পবিত্রতার নিদর্শনের আরও স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় মহাভারতে ভগীরথ উপাখ্যানে যখন বলা হয় তাহার দ্বারা আনিত পূণ্যগঙ্গা স্রোত ধারায় তাহার মৃত পূর্বপুরুষেরা পুনর্জীবন লাভ করিয়াছেন এই গঙ্গা-সাগরে। এই সব ঘটনা হইতে স্পষ্টতই প্রমাণিত হয় যে মহাভারতের যুগে আর্যসভ্যতা পূর্বদিকে প্রসারিত হইয়া বঙ্গোপসাগর সীমান্ত পর্যন্ত পৌঁছিয়াছিল।[৪]

জৈন 'কল্পসূত্র' গ্রন্থে দেখা যায় খ্রীষ্টের জন্মের প্রায় ৮০০ বৎসর পূর্বে জৈন তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথ (আঃ খ্রীঃ পূঃ ৭৭৭ পুণ্ড্র), রাঢ় ও তাম্রলিপ্তে ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন। জৈনদের শেষ তীর্থঙ্কর মহাবীর ও পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। 'আচারঙ্গ সূত্রে' বলা হইয়াছে মহাবীর যখন ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে পথহীন অগম্য রাঢ়দেশে পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন তখন

সেখানকার অধিবাসীরা তাহাকে আক্রমণ করিয়া কুকুর লেলাইয়া দেয়। লেখক এই অঞ্চলের অধিবাসীদের প্রতি বিরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন এবং সন্ন্যাসীদের প্রতি বিশেষতঃ মহাবীরের প্রতি এই ব্যবহারে জৈন শাস্ত্রকারগণ খুবই নিন্দা করিয়াছেন। মহাবীর বঙ্গদেশের আর কোন কোন অঞ্চলে পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন তাহা নিশ্চিতভাবে জানা যায় না। তবে তাহার পরিভ্রমণের পথ খানিকটা দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে ছিল একথা অনুমান করা অসঙ্গত নয়। পার্শ্বনাথ তাম্রলিপ্তে পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন তাহার বর্ণনা প্রসঙ্গে জৈন শাস্ত্রকার-গণ কিন্তু এখানকার অধিবাসীগণ তাহার প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ করেন নাই। মনে হয় তাহার তাম্রলিপ্ত পরিভ্রমণকালে মহাবীরের ন্যায় কোন দুঃখজনক ঘটনার অভিজ্ঞতা হয় নাই।

মহাবীরের অপর নাম বর্ধমান স্বামী। তাহার শিষ্য প্রশিষ্যদের মধ্যে প্রধান একজনের নাম গোদাস। তাহার সময় হইতে জৈনধর্মের চারটি শাখার সৃষ্টি হয়। তাহার একটি শাখার নাম 'তাম্রলিপ্তিকা'। ইহা হইতে স্পষ্ট অনুমান হয় যে প্রায় দুই হাজার বৎসর পূর্বে মেদিনীপুর জেলায় জৈনদের বিশেষ প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল এবং সেখানে একটি বিশেষ শক্তিশালী জৈন ধর্মীয় শাখারও অভ্যুদয় হইয়াছিল।[৫]

প্রাচীন বঙ্গদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস সম্পর্কে বিশেষ কোন উল্লেখ বৈদিক সাহিত্যে পাওয়া যায় না। মহাভারত, রামায়ণ বা পুরাণে বঙ্গদেশের এমন কোন রাজার নাম নাই যাহাকে ঐতিহাসিক ব্যক্তি বলিয়া চিহ্নিত করা যাইতে পারে। সে যুগের লেখকরা বঙ্গদেশকে কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিচ্ছিন্ন রাজ্যে বিভক্ত বলিয়া জানিতেন। তাহাদের মধ্যে অন্তত ৯টির নাম তাহারা উল্লেখ করিয়াছেন। রামায়ণের ঐতিহ্য অনুসারে বঙ্গদেশের অধিপতি অযোধ্যার রাজার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন বলা হইয়াছে। মহাভারতের কাহিনী অনুসারে বঙ্গদেশের রাজারা কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

আর্য সভ্যতার শেষদিকে অর্থাৎ যখন মহাভারত 'মনুস্মৃতি' প্রভৃতি লিখিত হয় সেই সময় সম্ভবতঃ বঙ্গদেশের সামাজিক ও ধর্মীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে আর্যসভ্যতার প্রসার ঘটিয়াছে। কিন্তু তাহার পরবর্তীকালে এই সভ্যতা বিকাশের ইতিহাসের পর্যায়ক্রম খুব স্পষ্ট নয়। তবে একথা নিশ্চিত যে আর্যসভ্যতার অধীনে বঙ্গদেশের আদিম অধিবাসীদের গ্রহণ করিবার প্রচেষ্টা সেই সময় ভালভাবে হইয়াছিল। তাহার প্রমাণস্বরূপ বৈদিক সাহিত্যে বঙ্গদেশের আদিম জনগোষ্ঠী যাহা বঙ্গ, সুহ্ম, শবর, পুলিন্দ, কিরাত ও পুণ্ড্র প্রভৃতিকে "ক্ষত্রিয়" বলিয়া

অভিহিত করা হইয়াছে। বঙ্গদেশে এই সমস্ত জাতিগোষ্ঠীর কেহ কেহ এমনকি ব্রাহ্মণ রূপেও উল্লিখিত হইয়াছে তাহার প্রমাণ 'দীর্ঘতমা' কাহিনীতে আছে। পুরাণ ও মহাভারতে বর্ণিত কাহিনীতে উল্লিখিত আছে দীর্ঘতমা নামে এক অন্ধ বৃদ্ধ ঋষি যযাতির বংশজাত পূর্বদেশের রাজা মহাধার্মিক পণ্ডিত প্রবর সংগ্রামে অজেয় বলির (বলিরাজ) আশ্রয় লাভ করেন এবং তাহার অনুরোধে তাহার রাণী সুদ্রেষ্ণার গর্ভে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র ও সুহ্ম নামে পাঁচ পুত্রের জন্ম দান করেন। তাহাদের বংশধরদের বাসস্থানগুলি পরবর্তীকালে তাহাদেরই নামাঙ্কিত হইয়াছিল। এই কাহিনীতে উল্লিখিত প্রদেশগুলির অধিবাসীরা আর্য, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের মিশ্রণে উদ্ভূত। এই কাহিনীর ঐতিহাসিক বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। কিন্তু ইহাতে মহাভারত ও পুরাণের যুগে বঙ্গদেশে আর্যজাতির বিশেষ প্রভাব সূচিত হইয়াছিল স্পষ্ট জানা যায়।[৬]

এই কাহিনী হইতে আরো একটি ঘটনা প্রমাণিত হয় যে বঙ্গদেশে আগত আর্যদের সহিত-এদেশের অধিবাসীদের বিবাহ সম্পন্ন হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। উচ্চবর্ণের সহিত বৈবাহিক সূত্রেজাত ব্যক্তিরা সম্ভবতঃ বৈদিক সাহিত্যে ব্রাহ্মণ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু বঙ্গদেশের অধিকাংশ জনগোষ্ঠী আর্য সমাজে শূদ্ররূপে পরিগণিত হইয়াছিল।

ধর্মসূত্র ও স্মৃতির লেখকগণ পবিত্র বেদকে চিরন্তন ও শাশ্বত বলিয়া গণ্য করিতেন। ফলে বেদে উল্লিখিত চার জাতিতে বিভক্ত সমাজের কাঠামোর মধ্যে নূতন আগত জনগোষ্ঠীকে অন্তর্ভুক্ত করার মানসে তাহারা বলিতে লাগিলেন এই চার জাতির স্ত্রী-পুরুষের অন্যান্য গোষ্ঠীর সহিত মিলনের ফলে উদ্ভূত সন্তান-সন্ততিরাও ইহাদের অন্তর্গত বলিয়া গণ্য করা হইবে।

বৃহৎ ধর্মপুরাণে একজন রাজা বর্ণাশ্রমের নিয়মকে ভঙ্গ করিয়া আদিম চারি-বর্ণের মিলনের ফলে উদ্ভূত অন্যান্য মিশ্রিত জাতিকেও নিজেদের বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই ঘটনার ঐতিহাসিকতা কতটা সত্য বলা মুশকিল। তবে মনে হয় প্রয়োজনের তাগিদে ক্রমে প্রসারমান আর্যজাতি বিভিন্ন অঞ্চলে অধিবাসীদিগকে নিজেদের গোষ্ঠীভুক্ত করিবার জন্য এই ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ঠিক কোন সময়ে আর্যপ্রভাব বঙ্গদেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহার সঠিক সময় নির্ণয় করা সম্ভব নয়। তবে মনে হয় খ্রীষ্টীয় প্রথম ও দ্বিতীয় শতকে আর্যগণ অধিকতর সংখ্যায় বঙ্গদেশে আসিতেছিলেন। যুদ্ধযাত্রা, বাণিজ্য ও ধর্মপ্রচার উপলক্ষ্যে ক্রমশ বহুসংখ্যক আর্য এদেশে আগমন ও বসবাস করিতে

আরম্ভ করে। একইভাবে জৈন ও বৌদ্ধধর্মাবলম্বী লোকেরাও বঙ্গদেশে আসিয়াছিলেন। বঙ্গদেশে গুপ্তদের শাসন প্রতিষ্ঠিত হইবার ফলে এখানে আর্যপ্রভাব দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সেই সময় আর্যবসতি হিসাবে বঙ্গদেশ বিশেষ গুরুত্ব অর্জন করিয়াছিল। তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় যখন দেখা যায় অযোধ্যার একজন অভিজাত ব্যক্তি হিমালয়ের পাদদেশে উত্তর-বঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে তীর্থ পরিক্রমার জন্য আসিয়াছিলেন। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীতে বঙ্গদেশে প্রাপ্ত কতকগুলি শিলালিপিতে এদেশীয় লোকেদের নামের উল্লেখ দেখা যায়। এই নামের উপাধিগুলি বিশ্লেষণ করিলে তাহা পুরোপুরি আর্য প্রভাবিত বলিয়া মনে হয়। যে সমস্ত উপাধি দেখা গিয়াছে যেমন বর্মন, পাল, মিত্র, সেন, ঘোষ, কুণ্ডু, দত্ত, নন্দী, ভদ্র, দেব প্রভৃতি এখনও প্রচলিত আছে। বঙ্গদেশের বিভিন্ন জায়গায় নামের মধ্যেও আর্য নামের স্পষ্ট প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। এই সমস্ত ঘটনাবলী হইতে বোঝা যায় যে খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যে বঙ্গদেশ প্রায় সম্পূর্ণ আর্য সভ্যতার মধ্যে আসিয়াছিল।[৭]

এই সমস্ত ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ঘটনাবলী ইতিহাসের তথ্য হিসাবে কতটা গ্রহণযোগ্য তাহা বলা কঠিন। তবে ইহাতে কয়েকটি সাধারণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব। বঙ্গদেশ ও উড়িষ্যায় বসবাসকারী আদিম জনগোষ্ঠী আর্য ছিলেন না ইহা স্পষ্ট। তবে এই অঞ্চলে খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম সহস্র বৎসর হইতে ধীর ও মন্থর গতিতে আর্য অনুপ্রবেশ সূচিত হইয়াছিল।

ঐতিহাসিক যুগ আরম্ভ হইবার বহু পূর্ব হইতেই এই অঞ্চলে কতকগুলি সুপ্রতিষ্ঠিত সরকার ছিল। অর্থাৎ এই অঞ্চলটি কয়েকটি ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে বিভক্ত ছিল। তাহাদের মধ্যে কোন কোনটি মাঝেমাঝে অধিক শক্তিশালী হইয়া উঠিত। পরিশেষে বঙ্গদেশের রাষ্ট্রগুলি পশ্চিমে তাহাদের নিকটবর্তী রাষ্ট্রগুলির সহিত খুবই সু-সম্পর্ক বজায় রাখিয়া চলিত।[৮]

দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গের বাঙ্গালীর নৃতাত্ত্বিক পরিচয়

প্রাচীন জাতির নৃতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ প্রধানত তিনটি বিষয়ের উপর নির্ভর করিতে হয়। তাহার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হইল প্রাচীন মানবের কঙ্কালাস্থি। এই প্রসঙ্গে মেদিনীপুরের অদূরে সিজুয়া নামক স্থানে প্রাপ্ত প্রাক্-হরপ্পা যুগের জীবাশ্মীভূত এক ভগ্নচোয়াল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহা ছাড়া ১৯৬৩-১৯৬৫ সালে পশ্চিমবঙ্গে পাণ্ডুরাজার ঢিবিতেও চৌদ্দটি সমাধিস্থ কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে। এই সমস্ত কঙ্কালের বিচার বিশ্লেষণ করিয়া অনুমান করা হয়

বঙ্গদেশের জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে নানাদেশের জাতিগোষ্ঠীর সংমিশ্রন ঘটিয়াছিল।[৯]

বঙ্গদেশের উপজাতিদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ হইল সাঁওতালরা। তাহার পরে সংখ্যার দিক হইতে ওরাওরা এবং তৃতীয় স্থানে আছে মুণ্ডা। পশ্চিমবঙ্গে মোট ৪১টি উপজাতি আছে। তাহাদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ সাঁওতালরা প্রধানত মেদিনীপুর, পুরুলিয়া, বীরভূম, হুগলী ও মালদহ জেলায় বাস করে। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের জেলাসমূহের মধ্যে মেদিনীপুর জেলায় সবচেয়ে বেশী সাঁওতাল বাস করে। সাঁওতালদের মধ্যে কিস্কু বা মুর্মু গোষ্ঠীর মর্যাদা অন্য গোষ্ঠীর তুলনায় অধিক।

মুণ্ডারা বর্ধমান, ২৪ পরগনা, পশ্চিম দিনাজপুর, দার্জিলিং জলপাইগুড়ি, মেদিনীপুর ও পুরুলিয়া জেলায় বাস করে। ভাষার দিক হইতে মুণ্ডারা সাঁওতালদের সমগোত্রীয়। মনে হয় পুণ্ড্রের বংশধর মনে হইতেছে বর্তমান পোদজাতি এবং শবরদের বংশ হইতেছে কৈবর্ত। কৈবর্তদের অধিকাংশেরই বাস মেদিনীপুর ও হাওড়া জেলা। ইহারা অতি প্রাচীন জাতি। বর্তমানে চাষী কৈবর্তরা অর্থাৎ উচ্চশ্রেণীর কৈবর্তরা মাহিষ্য নামে পরিচিত।[১০]

জাতি ও গোষ্ঠী

জাতিভেদ আর্যসমাজের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। ফলে আর্যগণ বঙ্গদেশে বাস করিবার সময় হইতে এখানেও ইহার প্রবর্তন হয়। আর্যসমাজ মোটামুটি চারটি শ্রেণীতে বিভক্ত যথা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। কিন্তু বঙ্গদেশে আর্যদের আগমনের পূর্ব হইতে অনেক আদিম অধিবাসী বাস করিত। আর্য আগমনের পরবর্তীকালে প্রাচীন গ্রন্থে এই সব অধিকাংশ আদিম অধিবাসীদের (শবর, পুলিন্দ, কিরাত, পুণ্ড্র প্রভৃতি) ক্ষত্রিয় বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। কাজেই পরবর্তী আর্যসমাজ এই অঞ্চলে বহুজাতিতে বিভক্ত। প্রাচীন যুগের শেষভাগে বাংলায় রচিত প্রামাণিক শাস্ত্রীয় গ্রন্থে এই চারিবর্ণের উল্লেখ এবং তাহাদের বৃত্তি প্রভৃতি নির্দিষ্টভাবে বলা হইয়াছে। অর্থাৎ বঙ্গদেশের সমাজ আদিতে চারিবর্ণে বিভক্ত হইলেও পরবর্তীকালে ইহাদের মধ্য হইতে বহুসংখ্যক বিভিন্ন জাতির (Caste) উদ্ভব হইয়াছিল।

নবম শতাব্দীতে বঙ্গদেশের এই বহুসংখ্যক জাতিকে মোটামুটি চারভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ ও বৃহদ্ধর্মপুরাণ এই দুইখানি গ্রন্থে (আঃ রচনাকাল ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দী) প্রাচীন যুগের অবসানকালে

বঙ্গদেশের সমাজে জাতিভেদ প্রথা সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা করা যায়। বৃহদ্ধর্ম-পুরাণ গ্রন্থটি খুব পরিচিত গ্রন্থ নহে এবং সম্ভবতঃ প্রথমটি অপেক্ষা পরে রচিত। এই গ্রন্থে বঙ্গদেশের জাতিগোষ্ঠী সম্পর্কে বিশেষ উল্লেখ দেখা যায়। ইহাতে ব্রাহ্মণদের মাছ, মাংস খাওয়ার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। এই দুইটি বঙ্গদেশের সমাজ ব্যবস্থার বিশেষ বৈশিষ্ট্য। ভারতবর্ষের অন্যত্র ব্রাহ্মণেরা সকলে নিরামিষ আহারে অভ্যস্ত। অব্রাহ্মণদের মোটামুটি ৩৬টি জাতিতে বিভক্ত করা হইয়াছে। ইহাদের সকলকেই শূদ্র বলা হইয়াছে (বর্তমানে বঙ্গদেশের জাতিগোষ্ঠীও মোটা-মুটি ৩৬টি)। রাজা যেন বর্ণাশ্রম ধর্ম নষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে বলপূর্বক বিভিন্ন বর্ণের নরনারীর সংযোগ সাধন করেন এবং ইহার ফলে বিভিন্ন মিশ্রবর্ণের উৎপত্তি হয়। বৃহদ্ধর্মপুরাণে এই মিশ্রবর্ণের সকলেই শূদ্রজাতীয় বলা হইয়াছে এবং ইহাদিগকে উত্তম, মধ্যম, ও অধম শঙ্কর শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে।

নবম শতাব্দীতে বঙ্গদেশের জাতিগোষ্ঠির যে চিত্রটি পাওয়া যায় তাহা মোটামুটি চারভাগে ভাগ করা যায়। ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, কায়স্থ, শূদ্র। (ক) সৎশূদ্র (উত্তম শঙ্কর)—এই গোষ্ঠীর অন্তর্গত হইল করণ (করণিক), (খ) অম্বষ্ঠ (চিকিৎসক বা বৈদ্য), (গ) উগ্র (যোদ্ধা), (ঘ) মাগধ (বিদূষক ও সংবাদ আদান-প্রদানকারী), (ঙ) তন্তুবায় (তাঁতি), (চ) গন্ধববণিক (গন্ধদ্রব্য বিক্রেতা), (ছ) নাপিত (ক্ষৌরকার), (জ) গোপ (লেখক), (ঝ) কর্মকার (কামার), (ঞ) তৈলিক (সুপারি ব্যবসায়ী), (ট) কুমার (কুমোর), (ঠ) কংসকার (কাঁসারী), (ড) সঙ্খিক (শাঁখের ব্যবসায়ী), (ঢ) দাস (কৃষিজীবি), (ণ) বারুজীবি (পানচাষী), (ত) মোদক (ময়রা), (থ) মালাকার (পুষ্পবিক্রেতা)। তাহা ছাড়া আরো তিনটি গোষ্ঠী ছিল তাহাদের জীবিকা সঠিক নির্ণয় করা যায় নাই। যেমন (দ) সূত (সম্ভবত সূত্রধরঃ), (ধ) রাজপুত (সম্ভবতঃ রাজপুত) ও (ন) তাম্বুলি (সম্ভবতঃ পান ব্যবসায়ী)।

২। মধ্যম শঙ্কর—(ক) তক্ষণ (ছুতার), (খ) রজক (ধোপা), (গ) স্বর্ণকার, (ঘ) স্বর্ণবণিক, (ঙ) আভীর (গোয়ালা), (চ) তৈলকার (তেলী), (ছ) ধীবর (জেলে), (জ) শৌণ্ডিক (মদ্য ব্যবসায়ী), (ঝ) নটযাত্রা শিল্পি, (ঞ) শ্রাবক (শবর ?), (ট) শেখর (?), (ঠ) জলিক (জেলে)।

৩। অধম শঙ্কর—(ক) মলেগ্রহি (সম্ভবতঃ মালগোষ্ঠী), (খ) কুড়া (সম্ভবতঃ মাঝি), (গ) চণ্ডাল, (ঘ) বরুড় (বারুই ?), (ঙ) তক্ষ (ছুতোর ?), (চ) চর্মকার (মুচি), (ছ) খট্টজীবি (পাটনি ?), (জ) দোলা বাহি (পাল্কিবাহক বা বেয়ারা), (ঝ) মল্লা (মাল ?)।

৪। নিম্নজাতি ও আদি উপজাতি যাহা হিন্দুদের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে যেমন চামার, ডোম, বৈতি, বাগদি, হাড়ি, বেদিয়া বারুই, পোদ প্রভৃতি। বৃহদ্ধর্ম পুরাণে ও শূদ্রকের ৩৬টি জাতি উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু এই তালিকায় ৪১টি জাতি দেখিতে পাওয়া যায়। কাজেই মনে হয় পরবর্তীকালে, ৫টি যুক্ত হইয়াছিল। যাহাদের পিতামাতা উভয়েই বৈদিক চতুবর্ণভুক্ত তাহাদের উত্তর শঙ্কর যাহাদের মাতা চতুবর্ণভুক্ত কিন্তু পিতা উত্তম শঙ্কর তাহারা হইলেন মধ্যম শঙ্কর, আর যাহাদের পিতামাতা উভয়েই শঙ্কর তাহার অধম শঙ্কর বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

বঙ্গদেশের জনগোষ্ঠীকে আরও একভাবে ভাগ করা হইয়াছে জলচল এবং অ-জলচল। জলচল হইল সেই গোষ্ঠী যাহাদের স্পর্শে খাদ্য ও পানীয় দূষিত হইত না। ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ ও সৎ শূদ্ররা ইহাদের অন্তর্গত। অ-জলচল হিসাবে তাহাদের গণ্য করা হইত যাহাদের স্পর্শে উচ্চশ্রেণীর লোকেরা খাদ্য ও পানীয় দূষিত বলিয়া গণ্য করিত। উদাহরণস্বরূপ স্বর্ণ বণিক, স্বণ্ডিক, কুলু, মাল, জালিয়া, কৈবর্ত, তিয়ারা, যুগী এবং অগ্রদানী, গণকব্রাহ্মণ ও সেই সমস্ত ব্রাহ্মণ যাহারা স্বর্ণ বণিক, গোয়ালা, রজক, বাগদী ও কৈবর্তদের পুরোহিতের কাজ করিতেন।

সাধারণত প্রত্যেক বর্ণের বংশানুক্রমিক পৃথক বৃত্তি নির্দিষ্ট ছিল। তবে মনে হয় এই ব্যাপারে খুব সাংঘাতিক কঠোর কোন বিধিনিষেধ বাস্তব ক্ষেত্রে ছিল না। তাহার বহু প্রমাণ সাহিত্যেও পাওয়া যায়। বিভিন্ন জাতির মধ্যে অন্নগ্রহণ ও বৈবাহিক সম্বন্ধ বিষয়ে প্রাচীনকালে খুব কঠোরতা ছিল না। একজাতীর মধ্যে সাধারণত বিবাহাদি হইত। কিন্তু উচ্চশ্রেণীর বর এবং নিম্ন শ্রেণীর কন্যার বিবাহে শাস্ত্রীয় অনুমোদন ছিল। প্রাচীন যুগের শেষদিকে এইরূপ বিধি প্রচলিত ছিল, ভবদেবভট্ট (প্রায়শ্চিত্ত প্রকরণ), জীমূতবাহন (দায়ভাগ) গ্রন্থে ইহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। মধ্যযুগের গোড়ারদিকে বঙ্গদেশের হিন্দু সমাজে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে পান, ভোজন ও বিবাহাদির ব্যাপারে কঠোরতা ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিতে থাকে।

ব্রাহ্মণ ঃ খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ-সপ্তম শতক হইতে দলে দলে ব্রাহ্মণগণ উত্তর ভারত হইতে আসিয়া বঙ্গদেশে বসবাস শুরু করেন। ইহাদের সংখ্যা পরবর্তী শতাব্দীগুলিতে আরো বৃদ্ধি পাইয়াছিল। বিভিন্ন লিপি হইতে প্রমাণ পাওয়া যায় ভারতবর্ষের মধ্যাঞ্চল এবং দক্ষিণাঞ্চল হইতেও ব্রাহ্মণগণ বঙ্গদেশে আগমন করিয়াছিলেন। কালক্রমে বঙ্গদেশের ব্রাহ্মণগণ রাঢ়ীয়, বারেন্দ্র বৈদিক, শাকদ্বীপীপ্রভৃতি শ্রেণীতে

বিভক্ত হইয়া যান। প্রাচীন যুগের শেষভাগে ব্রাহ্মণরা রাজা অথবা ধনীব্যক্তি কর্তৃক দান করা ভূমি অথবা গ্রামে বাস করিতেন। এই সমস্ত গ্রামের নাম হইতে ব্রাহ্মণদের উপাধি আসিয়াছে বলিয়া মনে করা হয়। মুখটি, গাঙ্গুলী, মুখোপাধ্যায়, বন্দ্যোপাধ্যায়, গঙ্গোপাধ্যায়, পতিতুণ্ড, পিপলাই, ভট্টশালী, কুশারী, ঘোষাল, মৈত্র, লাহিড়ী প্রভৃতি উপাধি সম্ভবতঃ এইভাবেই আসিয়াছিল।

বঙ্গের কুলজী গ্রন্থে উল্লিখিত আছে যে গৌড়ের রাজা আদিশূর বৈদিক যজ্ঞ অনুষ্ঠানের জন্য কাণ্যকুব্জ হইতে সাগ্নিক পাঁচজন ব্রাহ্মণ আনাইয়া ছিলেন। কারণ বঙ্গের ব্রাহ্মণেরা নাকি তখন বেদে অভিজ্ঞ ছিলেন না। কালক্রমে এই ব্রাহ্মণ সন্তানগণের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইলে কেহ কেহ রাঢ় দেশেই এবং কতক বরেন্দ্র ভূমিতে বাস করিতে থাকেন। পরে বল্লাল সেনের রাজত্বকালে বাসস্থানের নামানুসারে তাহারা রাঢ়ী ও বারেন্দ্র এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হন। আদিশূরের পৌত্র ক্ষিতিশূরের পুত্র ধরাশূর নাকি রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদের মোট ৫৯টি (পদবি যুক্ত) ব্রাহ্মণ পরিবারকে মুখ্যকুলীন, গৌণ কুলীন ও শোত্রীয় এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করেন। বল্লাল সেনের আমলে বারেন্দ্রী ব্রাহ্মণগণ কুলীন, শোত্রীয় ও কাপ এই তিনভাগে বিভক্ত হন (তাহাদের পরিবারের সংখ্যা ছিল ১০০)। এই অনবদ্য কুলজী গ্রন্থে যে বিস্তারিত বিবরণ আছে তাহা কতটা ঐতিহাসিক তাহা বলা শক্ত।

বঙ্গদেশে বৈদিক ব্রাহ্মণগণ সংখ্যায় অল্প হইলেও তাহারা বিশেষ সম্মান ভাজন। ইহারা আবার পাশ্চাত্য এবং দাক্ষিণাত্য এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। পাশ্চাত্য বৈদিক যাহারা উত্তরভারত হইতে বঙ্গদেশে আসিয়াছিলেন এবং দাক্ষিণাত্য বৈদিকগণ উৎকল, দ্রাবিড় প্রভৃতি অঞ্চল হইতে আসিয়া বঙ্গদেশে বসবাস আরম্ভ করেন। হলায়ুধ তাহার 'বাহ্মণে সর্বস্ব' গ্রন্থে বলিয়াছেন যে রাঢ়ী ও বারেন্দ্র বাহ্মণদের বেদজ্ঞান কমিয়া গিয়াছিল। তাহা শুধু উৎকল ও পাশ্চাত্য ব্রাহ্মণদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এই মন্তব্য ঐতিহাসিক বলিয়া বিশ্বাস করা কঠিন। হলায়ুধের গ্রন্থে এই উল্লেখ ব্যতীত প্রাচীন যুগে বৈদিক ব্রাহ্মণদের অন্য কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। বল্লাল সেনের 'দানসাগর' ও 'বৃহদ্ধর্মপুরাণে' অন্যান্য শ্রেণীর ব্রাহ্মণদের উল্লেখ আছে। বঙ্গে গ্রহ-বিগ্রহ নামে এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ আছেন। ইহারা শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ বলিয়াও পরিচিত। ইহারা নাকি শাকদ্বীপী, মাতণ্ডাদি ইত্যাদি ৮ জন মুনির বংশধর। ইহা ছাড়াও অন্য কোন শ্রেণীর ব্রাহ্মণও সম্ভবতঃ প্রাচীন যুগে বঙ্গে বাস করিতেন। কিন্তু তাহাদের সম্পর্কে কোন নির্ভরযোগ্য বিবরণ পাওয়া যায় নাই।

সমাজের শ্রেষ্ঠ স্থানের অধিকারী ব্রাহ্মণদের কার্যাবলী ও জীবনধারার স্মৃতি অনুসরণ করিয়া খুবই উচ্চ আদর্শ অনুযায়ী চালিত হইত এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। তাহাদের পাণ্ডিত্য, চরিত্র ও অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা সমাজে আদর্শস্বরূপ ছিল। তাহারা শুধু ধর্মচর্চা ও শিক্ষকতার কাজে নিযুক্ত থাকিতেন। কিন্তু সকলে এই আদর্শ অনুসারে চলিতেন ইহা মনে করিবার কোন কারণ নাই। এমনকি শাস্ত্র অনুমোদিত নির্দিষ্ট কর্ম সকলে করিতেন না। ভবদেবভট্টও দর্ভপানি বংশানুক্রমিকভাবে রাজমন্ত্রী ছিলেন। অনেক ব্রাহ্মণ যুদ্ধবিদ্যায়ও পারদর্শী ছিলেন। ইহা ছাড়াও তাহারা অন্যান্য বৃত্তির সাহায্যে জীবিকা নির্বাহ করিতেন। ইহাদের মধ্যে কোন কোনটি যেমন কৃষিকার্য শাস্ত্রানুমোদিত ছিল। কিছু কিছু ছিল নিন্দনীয় কার্য যাহার জন্য তাহাদিগকে নিন্দা সহ্য করিতে হইত।

করণ (কায়স্থ) ঃ প্রাচীন বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণদের পরেই করণ জাতির প্রাধান্য ছিল। বৃহদ্ধর্মপুরাণে তাহাদের শঙ্কর জাতির মধ্যে প্রথমে উল্লেখ করা হইয়াছে। অনেকেই খুব উচ্চরাজ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। 'রামচরিত মানস' প্রণেতা সন্ধ্যাকর নন্দীর পিতা, শব্দপ্রদীপ নামক গ্রন্থের প্রণেতা এই শ্রেণীর লোক ছিলেন। তিনি বংশানুক্রমে পাল রাজাদের রাজবৈদ্য ছিলেন।

প্রাচীন ধর্মশাস্ত্রে করণ শব্দে একশ্রেণীর জাতি ও একশ্রেণীর কর্মচারী (লেখক, হিসাবরক্ষক) বোঝাইত। কায়স্থ শব্দে প্রথমে এই শ্রেণীর রাজ কর্মচারীই বোঝাইত, পরে তাহা জাতিবাচক সজ্ঞায় পরিণত হয়। প্রাচীন লিপিতে করণ ও কায়স্থ একই অর্থে ব্যবহৃত হইত। সুতরাং এইরূপ অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের ন্যায় বঙ্গদেশেও করণ কায়স্থতে পরিণত হইয়াছে। অর্থাৎ উভয়ে মিলিয়া এক জাতিতে পরিণত হইয়াছে।

খ্রীষ্টীয় পঞ্চম, ষষ্ঠ ও অষ্টম শতাব্দীর তাম্রশাসনে 'প্রথম কায়স্থ' ও 'জৈষ্ঠ্য কায়স্থ' প্রভৃতির উল্লেখ দেখিয়া মনে হয় তখনও বঙ্গে কায়স্থ বলিতে একশ্রেণীর রাজকর্মচারীকে বেঝাইত। খ্রীষ্টীয় দশম শতকে একখানি শিলালিপিতে গৌড়কায়স্থ বংশের উল্লেখ আছে। সুতরাং মনে হয় এই সময়ে বঙ্গে কায়স্থ জাতির উৎপত্তি হইয়াছিল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় বৃহদ্ধর্মপুরাণ ও ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে কায়স্থের কোন উল্লেখ নাই। কুলজী গ্রন্থের মতে আদিশূর কর্তৃক আনিত কনৌজের পঞ্চ ব্রাহ্মণের সঙ্গে যে পাঁচজন ভৃত্য আসিয়াছিলেন তাহারাই (ঘোষ, বসু, মিত্র, গুহ ও দত্ত) কুলীনকায়স্থদের আদিপুরুষ। ইহা কতটা ঐতিহাসিক তাহা সঠিক বলা সম্ভব নয়।

বৈদ্য (অম্বষ্ঠ) ঃ ব্রাহ্মণ পিতা ও বৈশ্য মাতার সন্তানদের বৈদ্য বলিয়া গণ্য করা হইত। বৈদ্য শব্দ প্রথমে চিকিৎসক বোঝাইত। পরে ইহা জাতিবাচক সংজ্ঞায় পরিণত হয়। ঠিক কোন সময়ে বঙ্গদেশে এই জাতির প্রতিষ্ঠা হয় তাহা বলা খুবই কষ্টকর। সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দীর চারিখানি দক্ষিণভারতীয় লিপিতে প্রথম বৈদ্যজাতির উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু বঙ্গদেশে দ্বাদশ শতকের পূর্বে বৈদ্যজাতির অস্তিত্বের কোন বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায় নাই।

প্রাচীন ধর্মশাস্ত্রে অম্বষ্ঠ জাতির উল্লেখ আছে। মনুসংহিতা অনুসারে চিকিৎসাই ইহাদের একমাত্র বৃত্তি ছিল। মধ্যযুগে বঙ্গদেশে অম্বষ্ঠ বৈদ্য জাতির অপর নাম বলিয়া গৃহীত হইত (সপ্তদশ সতকে)। সুপ্রসিদ্ধ ভরত মল্লিক (চন্দ্রপ্রভা গ্রন্থ এবং ভট্টিটীকাকার) নিজেকে অম্বষ্ঠ ও বৈদ্য বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। বৃহদ্ধর্মপুরাণে অম্বষ্ঠ ও বৈদ্য একই জাতির নাম। কিন্তু ব্রহ্ম-বৈবর্তপুরাণে ইহারা দুইটি ভিন্ন জাতি। কুলজী গ্রন্থে আদিশূরকে অম্বষ্ঠ ও বৈদ্য বলা হইয়াছে এবং সেন রাজাদের বৈদ্য বলা হইয়াছে। কিন্তু পূর্বেই বলা হইয়াছে ইহার ঐতিহাসিকতা সন্দেহের বিষয়। মনে হয় কায়স্থ ও করণের মত বঙ্গদেশে বৈদ্য ও অম্বষ্ঠ একসঙ্গে মিশিয়া গিয়াছিল। কিন্তু এই সম্বন্ধে নিশ্চিত-ভাবে কিছু বলা সম্ভব নয়।

কৈবর্ত-মাহিষ্য ঃ ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ অনুসারে ক্ষত্রিয় পিতা ও বৈশ্য মাতার সন্তানরা কৈবর্ত বলিয়া পরিচিত। কলিযুগে তাহারা ধীবরদের সহিত সম্পর্ক স্থাপন করায় নিম্নজাতিতে রূপান্তরিত হইয়াছিল বলা হয়। স্মার্ত পণ্ডিত ভবদেব ভট্টাচার্য কৈবর্তদের অন্ত্যজ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। স্মৃতি অনুসারে ক্ষত্রিয় পিতা ও বৈশ্য মাতার সন্তানেরা মাহিষ্য নামে পরিচিত। কাজেই ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে বর্ণিত কৈবর্তদের সহিত মাহিষ্যদের উৎপত্তির দিক হইতে একটি সাদৃশ্য দেখা যায়। এই ঘটনার দ্বারা মনে হয় এই দুই গোষ্ঠীর যে সাদৃশ্য দেখা যায় তাহার একটি ব্যাখ্যার চেষ্টা করা হইয়াছে। মনুস্মৃতিতে নিষাধ পিতা এবং আয়োগব মাতার সন্তানদের মার্গব বা দাস বলা হইত। ইহাদের অন্য নাম কৈবর্ত।

বল্লাল চরিতে কৈবর্তজাতি সম্বন্ধে অনেক কথা আছে, কিন্তু ইহা কতটা বিশ্বাসযোগ্য তাহা বলা শক্ত। রামপালের সময় কৈবর্তনায়ক দিব্যের বিদ্রোহ এবং পরবর্তী সময়ে রুদোক ও ভীম এই তিনজন রাজা বারেন্দ্রভূমিতে রাজত্ব করিতেন। ইহারা সকলে কৈবর্ত ছিলেন। সুতরাং সেই সময়ে রাজ্যে ও সমাজে কৈবর্তজাতির বিশেষ প্রভাব ছিল ইহা সহজেই অনুমেয়।

পূর্ববঙ্গের মাহিষ্যরা হালিক ও জালিক দাস নামে পরিচিত। বর্তমান বঙ্গদেশের পশ্চিমাঞ্চল ও মেদিনীপুর জেলায় চাষী কৈবর্তদের সহিত তাহাদের মিল আছে। মেদিনীপুরের মাহিষ্যদের অনেক জমিদার আছেন এবং এই জেলায় তাহারা খুবই সম্ভ্রান্ত শ্রেণী। পূর্ববঙ্গের জেলেদের কেহ কেহ কৈবর্ত বলিয়া পরিচিত। অমরকোষ অনুসারে কৈবর্তদের মধ্যে চাষী ও মৎসজীবি উভয়েই আছেন। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, মনু ও জাতকের কাহিনী অনুসারে প্রাচীনকাল হইতে কৈবর্তরা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। একদল চাষী কৈবর্ত এবং অন্যদল জেলে কৈবর্ত। 'বল্লাল চরিত' অনুসারে বল্লাল সেনই কৈবর্তদের সৎশূদ্রে রূপান্তরিত করিয়াছিলেন। এই কাহিনী হইতে ইহা অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে বিষ্ণুপুরাণে কৈবর্তদের অ-ব্রাহ্মণ বলিয়া উল্লিখিত হইলেও পরবর্তীকালে তাহারা ধীরে ধীরে আর্যসমাজের মধ্যে প্রবেশ লাভ করিয়াছিল এবং তাহাদের মিশ্রিত গোষ্ঠী মাহিষ্য নামে পরিচিত হইয়াছিল।

সমাজের সর্বনিম্ন শ্রেণী : প্রাচীন বৌদ্ধ চর্যাপদে ডোম, চণ্ডাল এবং শবর জাতির উল্লেখ আছে। ইহাদের প্রথম দুইটি শ্রেষ্ঠ বঙ্গদেশে প্রাচীনকালেই ছিল যাহারা সমাজে সর্বনিম্নস্তরে অবস্থিত। শবরদের কথা বিভিন্ন প্রাচীন বাংলা-সাহিত্যে উল্লেখ আছে এবং পাহাড়পুরে তাহাদের উৎকীর্ণ ছবিও পাওয়া গিয়াছে। ইহারা সমাজে অস্পৃশ্য, বিশেষত ডোমরা। সেজন্য তাহারা শহরের বাহিরে বাস করিত। তাহারা ঝুড়ি তৈরি করিয়া, তাঁত চালাইয়া জীবিকা নির্বাহ করিত। ডোম মেয়েরা সাধারণভাবে নাচগান করিয়া বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরিয়া ঘুরিয়া অর্থ উপার্জন করিত। শবররা সাধারণত পাহাড় অঞ্চলে বাস করিত। তাহাদের স্ত্রীরা কানে দুল, গুঞ্জামালা ও ময়ূরপুচ্ছের মাধ্যমে দেহ-সজ্জা করিত। শিকারই ইহাদের প্রধান জীবিকা ছিল। চণ্ডালেরা সুযোগ পাইলে বিবাহিত মেয়েদের চুরি করিত। বল্লাল সেনের নৈহাটি লিপি অনুসারে পুলিন্দরাও বনে-জঙ্গলে পাহাড়ে বাস করিত। শিকার ইহাদের প্রধান জীবিকা হওয়ায় স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে তীর, ধনুক, বর্শা চালনায় খুব পারদর্শী ছিলেন। পশুর মাংসই ইহাদের প্রধান খাদ্য। ইহারা সম্ভবতঃ বঙ্গদেশের আদিম অধিবাসীদের বংশধর।

বঙ্গদেশের জনগোষ্ঠী আর্যসভ্যতার প্রসারের পূর্বে প্রধানত অষ্ট্রিক ও দ্রাবিড় ভাষাভাষির সংখ্যাই ছিল অধিক। ইহা ছাড়া ছিল অসংখ্য কোষে বিভক্ত গৃহ ও অরণ্যচারী জনগোষ্ঠী। মহাভারতের কালে মনে হয় মেদিনীপুর জেলায়, আর্য-অনার্য এই উভয় জাতির অধিকার ছিল। এই জেলার দক্ষিণপূর্বাংশে তাম্রলিপ্ত

প্রদেশে মনে হয় আর্যগণ রাজত্ব করিতেন। উত্তর-পশ্চিমাংশের জঙ্গলময় প্রদেশটি অনার্যদের অধিকারে ছিল।

সর্বভারতীয় জাতিবিন্যাসের ধারার সমস্তটাই মেদিনীপুরের ক্ষেত্রে দেখা যায় না। এখানে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈষ্ণ শূদ্র এবং অন্ত্যজ ও আদিবাসী গোষ্ঠী-গুলির এক বিশেষ শ্রেণী হিসাবে পরিগণিত। মেদিনীপুরে বঙ্গদেশের অন্যান্য অঞ্চলের মত বৈশ্যদের তেমন প্রাধান্য নাই। এখানে ব্রাহ্মণদের মধ্যে উৎকল শ্রেণীর সংখ্যা বেশী এবং মাহিষ্যরা সংখ্যাগরিষ্ঠ।[১১]

সামাজিক জীবন

হিন্দু সমাজের উচ্চশ্রেণীর জনগণের জীবনযাত্রা জন্মের পূর্ব হইতে মৃত্যুর পর পর্যন্ত কতকগুলি আধা ধর্মীয় রীতিনীতির দ্বারা পরিচালিত হইত। শিশুর জন্মের পূর্বেই তাহার মঙ্গলের জন্য নানাপ্রকার হোম প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হইত। জন্মের পর জাতকর্মে নামকরণ অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, উপনয়ন ইত্যাদি পালন করা হইত। তাহার পর ছাত্রজীবনের আরম্ভ। শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া গুরুগৃহ হইতে ফিরিয়া আসিলে সমাবর্তন উৎসব হইত। ইহার পর বিবাহ অনুষ্ঠিত হইত। মৃত্যুরপর শ্রাদ্ধ ও অন্যান্য পারলৌকিক কার্য সমাধা হইত। এই সমস্ত সংস্কার কার্য ছাড়াও বাঙ্গালীর দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় ধর্মের খুব উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। প্রতিটি অনুষ্ঠান পালনের জন্য তাহার রীতিনীতি সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ প্রাচীন যুগে পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া কোন্ কোন্ তিথিতে কোন্ কোন্ খাদ্য নিষিদ্ধ এবং কোন কাজ করা উচিত কি উচিত নয় ইহাও বিস্তারিতভাবে লিখিত ছিল। এই সমস্ত আধা ধর্মীয় অনুষ্ঠান বাদে বঙ্গদেশের জনগণ আরো নানাপ্রকার উৎসবের আয়োজন করিত। এই সব অনুষ্ঠানের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হইল দুর্গাপূজা, ইহা ছাড়া গণেশ, মনসা, সরস্বতী, হোলি প্রভৃতি উৎসবের উল্লেখ করা যাইতে পারে। রামচরিত মানসে দুর্গাপূজার সময় জনগণের উৎসাহ ও উদ্দীপনার বিশেষ বিবরণ পাওয়া যায়। বোঝা যায় এখনকার মত প্রাচীন যুগেও দুর্গাপূজা বাঙালীর একটি প্রধান উৎসব ছিল। ভ্রাতৃদ্বিতীয়া, আকাশপ্রদীপ, জন্মাষ্টমী, অক্ষয়তৃতীয়া প্রভৃতি সুপরিচিত অনুষ্ঠানগুলির বিশেষ প্রচলন ছিল।[১২]

অর্থনৈতিক অবস্থা

বঙ্গদেশ চিরকালই কৃষিপ্রধান দেশ। এখানকার বেশীর ভাগ লোকই গ্রামে বাস করে এবং চাষবাসের মাধ্যমেই তাহাদের জীবিকা নির্বাহ হয়।

বঙ্গদেশের প্রধান শস্য হইল ধান। তাহা ছাড়া এখানে প্রচুর পরিমাণে ইক্ষুর চাষ হইত। ফলে চিনি বিদেশে রপ্তানী হইত। কেহ কেহ মনে করেন অধিক পরিমাণে গুড় উৎপন্ন হইত বলিয়া এদেশের নাম গৌড় হইয়াছে। অন্যান্য শস্যের মধ্যে সরিষা, আম, কাঁঠাল, কলা ইত্যাদি বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। যাহারা জমি চাষ করিত তাহাদের জমির উপর কিরূপ অধিকার ছিল এবং রাজা কিংবা জমিদারের কিরূপ খাজনা দিতে হইত সে বিষয়ে সঠিক জানা যায় না, সম্ভবতঃ রাজাই জমির মালিক ছিলেন এবং যাহারা চাষ করিতেন তাহারা জমিভোগ করিবার জন্য রাজাকে খাজনা দিতেন। রাজা মন্দির প্রভৃতি ধর্মপ্রতিষ্ঠান এবং ব্রাহ্মণকে প্রতিপালন করিবার জন্য জমি দান করিতেন। এই জমি বংশানুক্রমে ভোগ করা যাইত।

প্রাচীনকালে জমি মাপ করিবার জন্য বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের নল ব্যবহার করা হইত। গুপ্ত যুগের জমির পরিমাপ সূচক কুল্যবাপ ও দ্রোণবাপ এই দুইটি সংজ্ঞা ব্যবহার করা হইত। কুল্যবাপ শব্দটি কুলা অর্থাৎ কুল্য হইতে উৎপন্ন এবং এক কুলা বীজ দ্বারা যতটুকু জমি বপন করা যায় সম্ভবতঃ তাহাকে কুল্যবাপ বলা হইত। এই মাপের আটভাগের একভাগকে দ্রোণবাপ বলা হইত। কিন্তু ইহাদের কোনটির মাপ কি তাহা সঠিকভাবে বলা সম্ভব নয়। ইহা ছাড়াও 'সমতটীয় নল' এবং 'বৃষভ শঙ্কর' নলের উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রথমটি সম্ভবতঃ সমতট প্রদেশ এবং দ্বিতীয়টি সম্ভবতঃ বৃষভশঙ্কর উপাধিধারী সেন সম্রাট বিজয় সেনের নাম হইতে উদ্ভূত। কিন্তু ইহাদের কোন্‌টি কি পরিমাণের মাপ ছিল তাহা জানা যায় নাই।

শিল্প (Arts and Crafts)

বঙ্গ কৃষিপ্রধান দেশ হইলেও এখানে নানাপ্রকার শিল্পজাত দ্রব্যও প্রস্তুত হইত। বস্ত্রশিল্পের জন্য এদেশে বহু প্রাচীনকাল হইতে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে ক্ষৌম্য, দুকূল, পত্রোর্ণ ও কার্পাসিক এই চারপ্রকার বস্ত্রের উল্লেখ আছে। ক্ষৌম্য শনের সূতায় প্রস্তুত মোটা কাপড়। কাশী ও উত্তরবঙ্গে ইহা তৈরী হইত। একজাতীয় সূক্ষ্ম কাপড়ের নাম দুকূল। কৌটিল্যের মতে বঙ্গদেশের দুকূল শ্বেত ও স্নিগ্ধ। পুণ্ড্র দেশীয় দুকূল শ্যাম ও মনির ন্যায় স্নিগ্ধ। পত্রোর্ণ রেশমের ন্যায় একজাতীয় কীটের লালায় তৈরী। মগধ ও উত্তরবঙ্গে এই জাতীয় বস্ত্র তৈরী হইত। কার্পাসিক অর্থাৎ কার্পাস তুলার কাপড়ের জন্য বঙ্গদেশ চিরকালই প্রসিদ্ধ ছিল। অর্থাৎ খুব প্রাচীনকালে

বঙ্গের বস্ত্রশিল্প খুব উন্নতি লাভ করিয়াছিল। খ্রীষ্টীয় প্রথমশতকে বঙ্গদেশ হইতে প্রচুর পরিমাণে সূক্ষ্ম বস্ত্র বিদেশে রপ্তানি হইত। বঙ্গদেশের মসলিন যে সমগ্র জগৎ বিখ্যাত ছিল তাহারও উদ্ভব প্রাচীন যুগে হইয়াছিল।

প্রাচীন যুগে আর যে শিল্প প্রভূত উন্নতি লাভ করিয়াছিল তাহা হইল চিনি শিল্প। সমুদ্রের জল শুষ্ক করিয়া লবণ তৈরীর ব্যবস্থা প্রাচীনকালেই সমুদ্রোপকূলবর্তী অঞ্চলে বহুল পরিমাণে প্রচলিত ছিল। 'ইর্দা' লেখতে দেখা যায় দশম শতাব্দীতে দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন সমুদ্রোপকূলবর্তী অঞ্চলে লবণ তৈরী করার জন্য অনেক কূপ তৈরী করা হইয়াছিল। এই উদ্দেশ্যে দণ্ডভুক্তি মণ্ডলের অনেক গ্রামবাসীকে লবণের জন্য কূপ খননের অনুমতি দেওয়া হইয়াছিল। একাদশ শতকে রামপালের লেখতে এবং দ্বাদশ শতকে ভোজবর্মার লেখতে এই দানের উল্লেখ দেখা যায়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় পাল ও সেনরাজাদের ভূমিদান লেখতে এই ধরণের দানের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। ইহাতে মনে হয় দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গে সমুদ্রোপকূলবর্তী কোন কোন অঞ্চলে লবণ তৈরীর প্রভূত প্রচলন থাকিলেও দশম শতাব্দীর ঠিক পরেই ইহা উল্লেখযোগ্য কুটির শিল্পে পরিণত হইতে পারে নাই। সম্ভবতঃ আদ্র প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং গঙ্গা ব্রহ্মপুত্র নদীর অতিরিক্ত পরিমাণে লবণযুক্ত জল সমুদ্রে আসার ফলে লবণ শিল্পের প্রসার বিঘ্নিত হইয়াছিল।

বঙ্গদেশের প্রাচীন মৃৎশিল্পের প্রচুর নিদর্শন পাহাড়পুরের পোড়ামাটির কাজে দেখিতে পাওয়া যায়। সেকালের বিলাসিতার উপকরণ যোগাইবার জন্য স্বর্ণকার মণিকাররা তাহাদের শিল্পে যথেষ্ট উন্নতি সাধন করিয়াছিল। কর্মকার ও সূত্রধরগণ গৃহ, নৌকা, শকট প্রভৃতি নির্মাণ করিত এবং দৈনন্দিন জীবনযাত্রার নানা উপকরণ যোগাইত। ইহা ছাড়া দারুশিল্প ও প্রাচীনকালে সূক্ষ্মশিল্পে উন্নীত হইয়াছিল। প্রস্তর ও ধাতুশিল্প এই সময়ে যথেষ্ট উন্নতিলাভ করিয়াছিল।

বঙ্গদেশের শিল্পিদের সংঘবদ্ধ জীবন সম্পর্কে কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। নগর শ্রেষ্ঠী, প্রথম স্বার্থবাহ, প্রথম কুলিক প্রকৃতি এইরূপে সংঘের প্রধান ছিলেন। বিজয় সেনের দেওপাড়া লিপি অনুসারে বরেন্দ্র অঞ্চলে শিল্পিদিগের একটি বিধিবদ্ধ সংঘ ছিল এইরূপে অনুমান করার সঙ্গত কারণ আছে। এই সংঘবদ্ধ শিল্প জীবনের ফলে পরবর্তীকালে বঙ্গদেশে শিল্পীগোষ্ঠী ক্রমশ বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীতে পরিণত হইয়াছিল। তন্তুবায়, গন্ধবণিক, স্বর্ণকার, কর্মকার, শঙ্খকার, কুম্ভকার, কংসকার, মালাকার তক্ষ, তৈলকার, প্রকৃতি প্রথমে বিভিন্ন শিল্পসংঘ ছিল। পরে ইহারা ধীরে ধীরে সমাজের একটি ভিন্ন সম্প্রদায়ে পরিণত

হইয়াছে। অর্থাৎ বঙ্গদেশে পরবর্তীকালে জাতি বিভাগ হইতে প্রাচীনকালের শিল্পবৃত্তি ও ব্যবসায়ের একটি পরিষ্কার ছবি পাওয়া যায়।

দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গে সাধারণ জনজীবন প্রাচীনকালে মোটামুটি স্বচ্ছল ছিল মনে হয়। তাহাদের এই আর্থিক স্বচ্ছলতা বহুলাংশে নির্ভর করিত ব্যবসা বাণিজ্যের উপর। এই সময়কার ইতিহাস ভূমিদান, বিক্রয়ের দলিলপত্র পাওয়া যায়। বঙ্গের ব্যবসায়ীদের এবং শিল্পদের সংঘবদ্ধ জীবনের কিছু কিছু পরিচয়ও এই সময়ে পাওয়া যায়। নগরশ্রেণী, স্বার্থবাহ এই সমস্ত বণিক ও ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর প্রতিনিধিরা রাষ্ট্রের প্রধান কার্যে সহায়তা করিতেছে, অর্থাৎ তাহাদের রাজনৈতিক ও সামাজিক গুরুত্ব সরকার স্বীকার করিয়া লইয়াছে। এইভাবে তাহারা সরকারের বিভিন্ন কাজকে প্রসারিত করিতে সাহায্য করিত। প্রাচীন-কালে ব্যবসায়ী ও শিল্পী শ্রেণীর এই গোষ্ঠীগুলি স্বাভাবিক কারণে সমাজ জীবনে খুবই গুরত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করিতেছিল। এই বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে থাকিয়া সমাজের সাধারণ লোকেরা নিজেদের দৈনিক ও অপর অপর প্রয়োজন মিটাইতে সক্ষম হইত। অর্থাৎ সেই প্রাচীন যুগে বঙ্গদেশের সরকার এইসব গোষ্ঠীকে শুধু স্বীকৃতিই দেয়নি উপরন্তু সরকার তাহাদের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিতও হইয়াছিল।

বাণিজ্য

শিল্পের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গে বাণিজ্যিক প্রসার বৃদ্ধি পাইয়াছিল। বঙ্গদেশ নদীমাতৃক বলিয়া দেশের বিভিন্ন স্থানে শিল্পজাত দ্রব্য প্রেরণে যথেষ্ট সুবিধা ছিল। বঙ্গদেশের বিভিন্ন স্থানে হাট, গঞ্জ এবং নূতন নূতন নগর গড়িয়া উঠিয়াছিল। স্থলপথে যাইবার জন্য সড়ক যোগাযোগ উন্নত ছিল এবং প্রাচীন নগরগুলি বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র হইয়াছিল।

বঙ্গদেশের বাণিজ্য কেবল দেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলনা। স্থলপথ এবং জলপথে ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলের সহিত এমনকি বিদেশের সহিতও বাণিজ্যিক বিনিময় হইত। খুব প্রাচীনকাল হইতেই সমুদ্র পথে ব্যবসা-বাণিজ্য চলিত। প্রাচীন তাম্রলিপ্ত বঙ্গের প্রধান সমুদ্র বন্দর ছিল। এখান হইতে পণ্য ও শিল্পজাত সামগ্রী বোঝাই জাহাজ পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে যাতায়াত করিত। এইরূপে শিল্প বাণিজ্যের প্রসারের ফলে বঙ্গদেশের ধনসম্পদ প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

প্রাচীন মুদ্রা

খ্রীষ্টের জন্মের চার বা পাঁচশত বৎসর পূর্বেই বঙ্গদেশে মুদ্রার প্রচলন হইয়াছিল। ভারতবর্ষে সর্বপ্রাচীন চিহ্নযুক্ত মুদ্রা (Punchmarked) বঙ্গদেশে অনেক পাওয়া গিয়াছে। বঙ্গদেশে কুষাণ যুগের মুদ্রাও কয়েকটি পাওয়া গিয়াছে এবং গুপ্তযুগের স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রা বহুসংখ্যক পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু বঙ্গের স্বাধীন রাজাদের বিশেষ পরিমাণে কোন মুদ্রা পাওয়া যায় নাই। দীর্ঘ চারিশত বৎসরের পাল রাজত্বের তিনটি তাম্র মুদ্রা পাহাড়পুরে পাওয়া গিয়াছে। ইহাও পালযুগের কিনা তাহা লইয়া ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ আছে। কিন্তু সেন রাজাদের কোন মুদ্রা তখনও পাওয়া যায় নাই। ইহা হইতে অনেকে অনুমান করেন এই যুগে ব্যবসায়ীকে আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে প্রচলিত মুদ্রার পরিবর্তে কড়ির প্রচলন ছিল। এই কড়ির প্রচলন বঙ্গদেশের বাজারে ১৭৫০ খ্রীঃ পর্যন্ত বহাল ছিল। গুপ্ত পরবর্তী বঙ্গদেশের রাজাদের (বিশেষত পাল ও সেন) আমলে মুদ্রার অভাবের কারণ কি ইহার কোন সন্তোষজনক উত্তর এখনও পাওয়া যায় নাই।[১৩]

ধর্ম

ভাষাগত ও জাতিগত তথ্যের উপর নির্ভর করিয়া একথা স্পষ্টভাবেই অনুমান করা যায় যে বঙ্গদেশের আদিম অধিবাসীরা আর্য গোষ্ঠী। তাহারা নিজস্ব একটি সভ্যতা ও সংস্কৃতি এই অঞ্চলে গড়িয়া তুলিয়াছিল। রামায়ণ, মহাভারত এবং জৈন ও বৌদ্ধ সাহিত্য পাঠ করিলে মনে হয় বঙ্গদেশ ধীরে ধীরে উত্তরভারত হইতে আগত সন্ন্যাসী ও যোদ্ধাদের দ্বারা আর্য সভ্যতার আওতায় আসিয়াছিল। ঠিক কবে এই আর্যকরণ আরম্ভ হইয়াছিল তাহা বলা শক্ত। তবে একথা বলা যায় যে আদিম বঙ্গদেশের সভ্যতা ও সংস্কৃতি ক্রমে ক্রমে ভারতের প্রধান তিনটি (বৈদিক, বৌদ্ধ ও জৈন) ধর্মমতের দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিল এবং সর্বক্ষেত্রেই পুরাণ ধর্ম বিশ্বাসের উপর অধিকতর উন্নততর ধর্মের সংঘাতের ফল খুবই সুদূরপ্রসারী হইয়াছিল।

পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম শতকে বঙ্গদেশে বিভিন্ন অঞ্চলে প্রাপ্ত লিপি হইতে স্পষ্টভাবেই বঙ্গদেশে বৈদিক সভ্যতার আগমনের সংবাদ পাওয়া যায়। ইহার গতি এবং শক্তি বঙ্গদেশে পাল যুগে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। পালযুগের অনেকগুলি লিপিতে বেদ-বেদাঙ্গ, মীমাংসা ও ব্যাকরণে পণ্ডিত ব্রাহ্মণদের এবং বৈদিক যাগযজ্ঞ ও অনুষ্ঠানে সক্ষম ব্রাহ্মণদের ভূমিদানের উল্লেখ আছে। একাদশ, দ্বাদশ শতকে সেন যুগের বৈদিক সংস্কৃতি বঙ্গদেশে অধিক প্রসার লাভ করে।

ভবদেব ভট্টের লিপিতে বৈদিক ক্রিয়াকলাপে পটু স্বর্ণ গোত্র ব্রাহ্মণদের বসতি-পূর্ণ ১০০টি গ্রামের নাম উল্লেখ করা হইয়াছে। একথা সহজে অনুমান করা যায় ভারতবর্ষে গুপ্তযুগে বৈদিক সংস্কৃতির পুনরুভ্যুত্থানের ফলে বঙ্গদেশে তাহার প্রসার ঘটিয়াছিল। এই ধারা দ্বাদশ শতক পর্যন্ত অব্যাহত ছিল।

আদিশূর কর্তৃক কান্যকুব্জ হইতে ব্রাহ্মণ অনয়ন করিবার কাহিনীর মধ্যে বঙ্গদেশে সে যুগে অনুষ্ঠানের জন্য অভিজ্ঞ ব্রাহ্মণের একান্ত অভাব ছিল এইরূপ মনে করিবার কোন সঙ্গত কারণ নাই। কারণ সে যুগে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদের ভারতবর্ষের এক প্রদেশ হইতে অন্য প্রদেশে গিয়া বসবাস করিবার বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। তবে মনে হয় বঙ্গদেশে কয়েক শতাব্দী ধরিয়া পালদের আমলে বৌদ্ধধর্ম প্রচলনের ফলে হয়ত ঠিক সেই সময়ে ভারতবর্ষের তুলনায় এখানে বেদের চর্চা খুব কমই হইত।

ভারতের অন্যান্য প্রদেশের ন্যায় গুপ্ত যুগে বঙ্গদেশে পৌরাণিক ধর্ম যথেষ্ট প্রসার লাভ করিয়াছিল। দেবরাজ ইন্দ্র অথবা পুরন্দর দৈত্য রাজা বলির হাতে তাহার-পরাজয়, বিষ্ণু (হরিমুরারী), লক্ষ্মী এবং তাহার বাহন গরুড় বিষ্ণুর নাভিকমল হইতে ব্রহ্মার উৎপত্তি। সত্যযুগে বলি এবং দ্বাপরে কর্ণের দান-শীলতা, অগস্ত্যমুনির সমুদ্রশান, পরশুরাম কর্তৃক ক্ষত্রিয় সংহার, রামচন্দ্রের বীরত্ব, পৃথু, সাগর, নল, ধনঞ্জয়ে, যযাতি প্রভৃতির কাহিনী। বঙ্গদেশে আবিষ্কৃত তাম্রশাসনে বারেবারে উল্লিখিত হইয়াছে।

বঙ্গদেশে যে বৈষ্ণব ও শৈবধর্মের প্রসার ছিল তাহাও বিভিন্ন তাম্রশাসন হইতে জানা যায়। ভাগবতে উপাস্য দেবতা বিষ্ণু কৃষ্ণে রূপান্তরিত হইয়াছে। কৃষ্ণের জন্ম বাল্যলীলা এবং তিনি যে বিষ্ণুর অবতার তাহার উল্লেখ পাওয়া যায়। বিভিন্ন নামে শিব (সদাশিব, অর্ধনারীশ্বর, ধূর্জটি ও মহেশ্বর), তাহার শক্তি সর্বানী, উমা অথবা সতী, দক্ষযজ্ঞে সতীর দেহত্যাগ, কার্তিক, গণেশ প্রভৃতির উল্লেখ এই সমস্ত তাম্রশাসনে আছে। এই সব দেবদেবীর মূর্তির সংখ্যা গঠন প্রণালীর বিভিন্নতা হইতে মনে হয় বঙ্গদেশে ইহাদের পূজা বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল এবং ইহাদের উপাসকগণ বহুসংখ্যক সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিল।

বৈষ্ণব ধর্ম ঃ বাঁকুড়া হইতে ১২ মাইল উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত শুশুনিয়া পাহাড়ের গুহায় উৎকীর্ণ রাজা চন্দ্রবর্মার লিপিতে সর্বপ্রথম বিষ্ণুপূজার উল্লেখ পাওয়া যায়। এই গুহাচিত্রে একটি চক্র খোদিত আছে। অনুমিত হয় যে ইহা একটি বিষ্ণুমন্দির ছিল। রাজা চন্দ্রবর্মা চতুর্থ শতাব্দীতে রাজত্ব করিতেন এবং তিনি চন্দ্রস্বামী অর্থাৎ বিষ্ণুর উপাসক ছিলেন।

বঙ্গদেশে বৈষ্ণব ধর্মে ষষ্ঠ, সপ্তম শতক হইতে কৃষ্ণলীলার অনেক কাহিনী উল্লেখ আছে। পরবর্তীকালে রাধা বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রাধান্য লাভ করিলেও খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকে সাতবাহন রাজাগণের রচিত 'গাথা সপ্তশতী' ব্যতীত প্রাচীনকালে রাধার কোন উল্লেখ নাই। পাহাড়পুরে একখানি প্রস্তরে কৃষ্ণ ও একটি স্ত্রীমূর্তি খোদিত আছে। কেহ কেহ ইহাকে রাধা-কৃষ্ণের যুগল মূর্তি বলিয়া অনুমান করেন। তবে এ বিষয়ে সঠিকভাবে কিছু বলা সম্ভব নয়।

অষ্টম হইতে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত বঙ্গদেশে বৈষ্ণবধর্ম বিশেষ প্রচলিত ছিল। এই সময়ে তৈরী বহু বিষ্ণু মূর্তি তাহার প্রমাণ। রাজা লক্ষ্মণসেন পরম বৈষ্ণব ছিলেন এবং রাজকীয় শাসনের প্রারম্ভে শিবের পরিবর্তে বিষ্ণুস্তবের প্রচলন করেন। রাধা সম্ভবতঃ জয়দেবের অব্যবহিত পূর্বে বাঙ্গালী মনীষার আবিষ্কার। শাক্তধর্মের প্রভাব খর্ব করিবার জন্য বোধ হয় রাধার পরিকল্পনা করা হইয়াছে। শিবের ন্যায় কৃষ্ণও পরম শক্তি। রাধা তাহাকে লাভ করিবার একটি উপায় মাত্র।

লক্ষ্মণসেনের সভাকবি জয়দেবের গীতগোবিন্দ বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের বিশেষ আদৃত গ্রন্থ। ইহাতে বিষ্ণুর দশাবতারের বর্ণনা আছে পরে তাহা সমগ্র ভারতে গৃহীত হইয়াছে। জয়দেব বর্ণিত 'অবতারবাদ' ভারতবর্ষে প্রামাণিক বলিয়া গৃহীত হওয়ায় তাহা বঙ্গের বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের একটি প্রধান দান বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। জয়দেব বর্ণিত রাধা-কৃষ্ণ লীলাও সম্ভবতঃ বঙ্গদেশেই প্রথমে প্রচলিত হয় এবং পরে সমগ্র ভারতে প্রসিদ্ধি লাভ করে।

শৈব ধর্ম: বৈষ্ণব ধর্মের ন্যায় শৈব ধর্মও গুপ্তযুগে প্রচলিত ছিল। ষষ্ঠ শতকে মহারাজা বন্যগুপ্ত ও সপ্তম শতকে শশাঙ্ক ও ভাস্করবর্মা শৈব ধর্মের পৃষ্ঠ-পোষক ছিলেন। পাহাড়পুরে মন্দির গাত্রেও শিবের কয়েকটি মূর্তি দেখিতে পাওয়া যায়। শিবের উপাসনা নানাভাবে দেখা যায়। রুদ্র শিব, পশুপতি এবং লিঙ্গ প্রভৃতি বিভিন্নভাবে শিবের পূজা প্রচলিত ছিল। সম্রাট নারায়ণপালের তাম্রশাসন হইতে জানা যায় তিনি একটি শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া তথাকার ব্যয়নির্বাহের জন্য একটি গ্রাম দান করিয়াছিলেন। ইহা হইতে বোঝা যায় যে বঙ্গদেশে পাশুপত সম্প্রদায় খুব প্রবল ছিল। 'সদাশিব' সেন রাজাদের ইষ্ট-দেবতা ছিলেন। বিজয়সেন ও বল্লালসেন শৈব ছিলেন। লক্ষ্মণসেন ও তাহার বংশধরগণ বৈষ্ণব হইলেও কুলদেবতা 'সদাশিব'কে পরিত্যাগ করেন নাই।

খুব প্রাচীন কাল হইতে বঙ্গদেশে শক্তি পূজার প্রচলন ছিল দেবীপুরাণে বলা হইয়াছে। রাঢ় ও বরেন্দ্রের বামাচারী সম্প্রদায় বিভিন্নরূপে দেবী উপাসনা রচিত।

দেবীপুরাণ সম্ভবতঃ সপ্তম শতকের শেষ অথবা অষ্টম শতকের গোড়ায় রচিত হইয়াছিল। বঙ্গদেশে বহু তান্ত্রিক গ্রন্থে শাক্ত মত প্রচারিত হইয়াছিল। কিন্তু এই শ্রেণীর গ্রন্থগুলির রচনাকাল নির্ণয় করা কঠিন। তবে মনে হয় প্রাচীন যুগ শেষ হইবার পূর্বেই বঙ্গদেশে তন্ত্রোক্ত শাস্ত্রমত প্রসারিত হইয়াছিল।

অন্যান্য ধর্ম সম্প্রদায়ঃ বিষ্ণু, শিব ও শক্তি ব্যতীত অন্যান্য দেবদেবীর পূজাও বঙ্গদেশে প্রচলিত ছিল। তবে ইহাদের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। ষষ্ঠ শতক হইতে আরম্ভ করিয়া পরবর্তীকালে বর্ণিত বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্তি (কার্তিকেয় গণেশ, ইন্দ্র, কুবের, বৃহস্পতি প্রভৃতি) বঙ্গদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পাওয়া গিয়াছে। 'রাজতরঙ্গিনীতে' খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে পুণ্ড্রবর্ধনে কার্তিকেয়ের এক মন্দির আছে বলিয়া উল্লেখ আছে। অন্যান্য দেবদেবীর মূর্তির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইল গঙ্গা, যমুনা এবং মাতৃকা মূর্তি।

প্রাচীন বঙ্গদেশে আরও দুইটি দেবতার প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায় তাহারা হইলেন সূর্য ও তাহার পুত্র রেবন্ত। পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম শতকে এবং পরবর্তীকালে পাল ও সেন যুগে প্রচুর সূর্যের মূর্তি পাওয়া গিয়াছে। লক্ষ্মণসেনের পরবর্তীকালে কেশব সেন ও বিশ্বরূপ সেন তাহাদের তাম্রশাসনে "পরম সৌর" বলিয়া নিজেদের উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং আর্যসভ্যতার উপাসক সৌর সম্প্রদায় বঙ্গদেশের প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল বলা যাইতে পারে। এই সূর্য কিন্তু বৈদিক সূর্যদেবতা নহে। সম্ভবতঃ মগ ব্রাহ্মণগণ কুষাণ যুগে এই সূর্য পুজার প্রচলন করেন।

প্রাচীন যুগে অনেক রেবন্ত মূর্তি পাওয়া গিয়াছে। কোন কোন পুরাণে তাহাকে সূর্যের পুত্র বলা হইয়াছে। অগ্নীপুরাণ গ্রন্থে যদিও এই দেবতার বিষদ বিবরণ পাওয়া যায় না। তবে মনে হয় এই দেবতা গোঁড়া ব্রাহ্মণ সমাজে খুব জনপ্রিয় হয় নাই। ইহারা সম্ভবতঃ লোক সংস্কৃতির দেবতা হিসাবে পরিগণিত হইত।

জৈন ধর্মঃ বৌদ্ধধর্মের ন্যায় জৈনধর্মও পূর্বভারতে প্রবর্তিত হইয়াছিল। জৈনধর্মের প্রবর্তক মহাবীর বৈশালীর নিকট জন্মগ্রহণ করেন এবং তাহার জীবনের অনেকটা সময় মগধ ও চম্পায় অতিবাহিত করেন। মহাবীরের পরবর্তী তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথের পূণ্য স্মৃতির সঙ্গে পূর্বভারতের পার্শ্বনাথ পাহাড়ের যুক্ত আছে।

প্রাচীন জৈন শাস্ত্রে মহাবীরের রাঢ়দেশের আগমনের কাহিনী ও সেখানে তাহাদের প্রতিটি লোকেদের মন্দ ব্যবহারের কথা বলা হইয়াছে। তিনি

গঙ্গা অতিক্রম করিয়া পূর্বদিকে আসিয়াছিলেন এমন কোন প্রমাণ নাই। তবে জৈন শাস্ত্রে বহুবার বঙ্গদেশের কথা উল্লিখিত আছে। ঠিক কোন সময়ে বঙ্গদেশে জৈনধর্ম প্রতিষ্ঠা লাভ করে সঠিকভাবে তাহা বলা সম্ভব নয়।

জৈনধর্মের প্রাচীন নাম নিগ্রন্থ এবং এই জৈনদের গুপ্ত যুগে পরিচয় ছিল। 'দিব্যদান' নামক গ্রন্থে অশোকের সম্পর্কে একটি কাহিনী আছে। তাহাতে বলা হইয়াছে পুণ্ড্রবর্ধন নগরীর নিগ্রন্থীগণ (জৈনগণ) মহাবীরের চরণে পতিত বুদ্ধের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছে। এই সংবাদে ক্রুদ্ধ অশোক নাকি পাটালীপুত্রের সমস্ত জৈনদের হত্যার আদেশ দিয়াছিলেন। এই কাহিনীর কতটা সত্যতা আছে বলা মুশকিল। সেজন্য এই কাহিনীর উপর নির্ভর করিয়া অশোকের সময় উত্তরবঙ্গে জৈন সম্প্রদায়ের লোকেরা বসবাস করিতেন, এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভবতঃ যুক্তিসঙ্গত নয়।

খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে উত্তর ও নিম্নবঙ্গে জৈনধর্ম দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রাচীন জৈন গ্রন্থ 'কল্পসূত্র' মতে মৌর্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের সমসাময়িক জৈন আচার্য ভদ্রবাহুর শিষ্য গোদাস যিনি গোদাসগণ নামক জৈন ধর্মের যে বিশেষ শাখার প্রতিষ্ঠা করেন তাহা কালক্রমে চারটি উপশাখায় বিভক্ত হয়। এই চারটি উপশাখার তিনটি হইল পুণ্ড্রবর্ধনীয়, কোটিবর্ষীয় ও তাম্রলিপ্তিকা। এই তিনটিই বঙ্গের তিনটি সুপরিচিত নগরীর নাম হইতে উদ্ভূত তাহাতে সন্দেহ নাই। "কল্পসূত্রে" উল্লিখিত এই শাখাগুলি কাল্পনিক নয় সত্যিই ছিল। কারণ খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে উৎকীর্ণ শিলালিপিতে তাহাদের উল্লেখ আছে। সুতরাং উত্তরবঙ্গে (পুণ্ড্রবর্ধন, কোটীবর্ষ) ও দক্ষিণবঙ্গে (তাম্রলিপ্ত) যে খুব প্রাচীনকাল হইতেই জৈন ধর্মের প্রসার লাভ করিয়াছিল তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

পাহাড়পুরে প্রাপ্ত একটি তাম্রশাসনে খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে বা তাহার পূর্বে ঐ স্থানে একটি জৈন বিহার ছিল বলিয়া উল্লিখিত আছে। হিউয়েন-সাঙ-এর ভ্রমণকালে (৭ম শতকে) উত্তর, দক্ষিণ ও পূর্ববঙ্গে দিগম্বর জৈনদের সংখ্যা খুব বেশী ছিল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। মনে হয় তাহার পরবর্তীকালে বঙ্গদেশে জৈন ধর্মের প্রভাব হ্রাস পায়। পাল ও সেন রাজাদের আমলে জৈনদের কোন উল্লেখ নাই। তবে ইহা একেবারে লুপ্ত হয় নাই, প্রাচীন জৈন মূর্তি হইতে তাহা প্রমাণিত হয়। মনে হয় দিগম্বর জৈনরা পালযুগের শেষদিকে সম্ভবতঃ অবধূতঃ সম্প্রদায়ের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছিল।

বৌদ্ধ ধর্ম : বঙ্গদেশে কবে প্রথম বৌদ্ধধর্ম প্রতিষ্ঠা লাভ করে তাহার সঠিক

কোন তথ্য পাওয়া যায় না। 'ত্রিপিটক' গ্রন্থে আর্যাবর্তের পূর্বসীমা রাজমহলের নিকট ক-জঙ্গল বলা হইয়াছে। এই গ্রন্থে পরবর্তী সংস্কৃত সংস্করণে পূর্বসীমা পুণ্ড্র-বর্ধন রাজ্য বলা হইয়াছে। এই গ্রন্থের ঘটনাসমূহ প্রায় অশোকের যুগের বলিয়া মনে হয়। সেজন্য পূর্ণ বর্ণনা অনুসারে সম্ভবত বৌদ্ধধর্ম অশোকের পূর্বেই উত্তরবঙ্গে অনুপ্রবেশ ঘটিয়াছিল ধরা হয়।

দিব্যবদানের কাহিনী হিউয়েন-সাঙ-এর বর্ণনায় মনে হয় সম্রাট অশোকের সময় বঙ্গদেশে বৌদ্ধধর্ম প্রচলিত ছিল। খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে বৌদ্ধধর্ম উত্তরবঙ্গে প্রতিষ্ঠিত ছিল তাহা সাঁচী স্তূপে উৎকীর্ণ দুইটি মূর্তি হইতে অনুমান করা যায়। ইহারা দুইজন পুণ্ড্রবর্ধনের অধিবাসী বলিয়া অনুমান করা হয়। ইহা যদি সত্যি হয় তাহা হইলে খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে উত্তরবঙ্গে বৌদ্ধধর্ম প্রসার লাভ করিয়াছিল এ সম্বন্ধে স্থির নিশ্চয় হওয়া যায়। বঙ্গদেশে বৌদ্ধধর্মের একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল তাহার সুনির্দিষ্ট প্রথম প্রমাণ নাগার্জুনকোণ্ডা লিপিতে পাওয়া যায়। ইহার সময়কাল খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয়-তৃতীয় শতক বলিয়া মনে করা হয়। পৃথিবীর যে দেশগুলি সিংহলী বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের দ্বারা দীক্ষিত হইয়াছিল তাহার দীর্ঘ তালিকার মধ্যে বঙ্গদেশের উল্লেখ আছে।

প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের সংখ্যা খুব কম থাকায় খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে বৌদ্ধ-ধর্মের কি অবস্থা বঙ্গদেশের ছিল তাহা জানা খুবই শক্ত। তবে গুপ্তযুগের প্রারম্ভে বৌদ্ধধর্মের প্রাধান্য থাকায় একথা অনুমান করা যায় যে ইহার অবস্থা গুপ্ত পূর্বযুগে খুব খারাপ ছিল।

ফা-হিয়েন যখন পঞ্চম শতাব্দীর গোড়ার দিকে ভারতবর্ষ পরিভ্রমণে আসেন তখন তিনি বঙ্গদেশে বৌদ্ধধর্মের বিশেষ প্রভাব লক্ষ্য করিয়াছিলেন। তিনি ভারতবর্ষে বিভিন্ন স্থানে পরিক্রম করিয়া অবশেষে তাম্রলিপ্তে আগমন করেন। তিনি এখানে দুই বৎসর অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তাহার বিবরণে মনে হয় সেই সময়ে তাম্রলিপ্তে ২২টি বৌদ্ধবিহার ছিল। তিনি এখানে বৌদ্ধধর্ম গ্রন্থ নকল করিয়াছিলেন এবং বৌদ্ধমূর্তির ছবি আঁকিয়া ছিলেন। তাহার বিস্তৃত বর্ণনায় তাম্রলিপ্ত বৌদ্ধবিহারের একটি উজ্জ্বল ও সুন্দর চিত্র পাওয়া যায়।

ফা-হিয়েনের এই বিবরণ গুপ্তযুগে প্রাপ্ত অনেক প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনেও সমর্থন মেলে। গুপ্ত সম্রাট বিনয় গুপ্তের রাজত্বকালে একটি ভূমিদানপত্র পাওয়া গিয়াছে। যাহার সাহায্যে মহাজান বৌদ্ধদিগকে ভূমিদানের কথা উল্লিখিত আছে। মনে হয় খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতকে বঙ্গদেশে বৌদ্ধধর্মের খুব প্রতিপত্তি ছিল।

সপ্তম শতাব্দীতে বঙ্গদেশে বৌদ্ধধর্ম যে খুব প্রভাবশালী ছিল তাহা বহু চীন

দেশীয় পরিব্রাজকদের পরিভ্রমণ হইতে জানা যায়। এই সমস্ত ভ্রমণকারিদের মধ্যে হিউয়েন-সাঙ-এর বিবরণ সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। তিনি বিভিন্ন অঞ্চল পরিভ্রমণ করিয়া বঙ্গদেশে ও তাহার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে কয়েকটি খুব প্রতিপত্তি-শালী বৌদ্ধবিহারের উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন রাজমহলের নিকটবর্তী ক-জঙ্গলে ৬-৭টি বৌদ্ধবিহার আছে যেখানে প্রায় তিনশত বৌদ্ধভিক্ষু বাস করিতেন। উত্তরবঙ্গে (পুণ্ড্রবর্ধনে) তিনি প্রায় ২০টি বৌদ্ধবিহার ও ৩০০০ জনের মত মহাজান ও হীনজান পন্থী বৌদ্ধ অনুরাগীর উল্লেখ করিয়াছেন। তাহার বিবরণ অনুসারে সমতট, কর্ণস্বুবর্ণ ও তাম্রলিপ্তে বৌদ্ধধর্মের আস্থা অতটা প্রভাবশালী ছিল না। কর্ণস্বুবর্ণে ১০টি মঠ এবং ২০০০ হীনজান মতাবলম্বী বৌদ্ধভিক্ষু বাস করিতেন। তাম্রলিপ্তেও ১০টি মঠ ও ১০০০ ভিক্ষুর কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

সপ্তম শতাব্দীতে আরও একজন চৈনিক পরিব্রাজক ইৎ-সিঙ ভারতবর্ষে আসেন। তিনি এই অঞ্চলে বেশ কিছুদিন অতিবাহিত করেন। তিনি তাম্র-লিপ্তের বৌদ্ধ বিহারগুলির বিস্তৃত বিবরণ রাখিয়া গিয়াছেন। এই সমসাময়িককালে শেচিং (Sheng-Chig) আর একজন চৈনিক পরিব্রাজক সমতটের রাজধানীতে কয়েক সহস্র বৌদ্ধ ভিক্ষু-ভিক্ষুনীর উল্লেখ করিয়াছেন। এই সমস্ত বর্ণনা হইতে পরিষ্কারভাবে বোঝা যায় সপ্তম শতাব্দীতে বঙ্গদেশে বৌদ্ধধর্ম খুব প্রভাবশালী ছিল। হিউয়েন-সাঙ-এর বর্ণনা হইতে পরিষ্কারভাবে বোঝা যায় বৌদ্ধধর্মের মধ্যে তখন অনেকগুলি বিভিন্ন চিন্তাধারার উৎপত্তি হইয়াছিল। কর্ণস্বুবর্ণের বৌদ্ধগণ ছিলেন সামন্তীয় এবং তাম্রলিপ্তের বৌদ্ধগণ ছিলেন সর্বাস্তিবাদীয় এবং সম্যতীয় বৌদ্ধরা ছিল মহাযানী বৌদ্ধ। সম্যতীয় বৌদ্ধরা সর্বাস্তিবাদীদের এক শাখা। ইৎ-সিঙ যদিও চারটি বিভিন্ন বৌদ্ধ গোষ্ঠীর কথা বলিয়াছেন কিন্তু ইহাদের সম্পর্কে খুব বেশী বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় না। তবে একথা সত্যি মহাযান ও হীনযান বৌদ্ধদের মধ্যে ভাগাভাগী সে যুগে খুব একটা প্রকট হইয়া দেখা দেয় নাই। সপ্তম শতাব্দীর একজন বাঙালী বৌদ্ধ বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। ইনি হইলেন বিখ্যাত বৌদ্ধ পণ্ডিত শীলভদ্র অথবা অতীশ দীপঙ্কর।

অষ্টম শতকে পাল রাজাগণের অভ্যুদয়ে বঙ্গদেশে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব খুব বৃদ্ধি পাইয়াছিল। পাল রাজারা নিজেদের পরম সৌগত বলিয়া উল্লেখ করিতেন। তাহারা মাহাযান বৌদ্ধ ধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং তাহাদেরই চেষ্টায় সেই সময় ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে যখন বৌদ্ধধর্ম ক্রমশ ক্ষীণবল হইয়া আসিতেছিল, সেই সময় তাহাদের পৃষ্ঠপোষকতায় বৌদ্ধধর্ম বঙ্গ ও বিহারে

প্রবল শক্তিশালী হইয়াছিল। তাহাদের রাজত্বের শেষদিকে তুর্কী আক্রমণের ফলে প্রথমে মগধ পরে উত্তরবঙ্গে বৌদ্ধ বিহারগুলি ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে ভারতের বৌদ্ধধর্ম পূর্বপ্রান্তস্থিত এই সর্বশেষ আশ্রয় স্থান হইতে বিতাড়িত হইয়া আত্মরক্ষার জন্য নেপাল তিব্বতে গমন করে। ইহারই ফলস্বরূপ বৌদ্ধধর্ম ভারতবর্ষ হইতে প্রায় বিলুপ্ত হইয়া যায়।

অষ্টম শতক হইতে দ্বাদশ শতকের মধ্যে বিহারে ও বঙ্গদেশে পাল রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় বৌদ্ধধর্মের অনেক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধিত হয়। এই সময়ের মধ্যে তিব্বত, দক্ষিণ যবদ্বীপ, সুমাত্রা, মালয় প্রভৃতি অঞ্চলে বৌদ্ধধর্ম যথেষ্ট বিস্তার লাভ করিয়াছিল। বঙ্গের পাল রাজাগণ ভারতের বৌদ্ধধর্মের শেষ শ্রেষ্ঠ পৃষ্ঠপোষক হিসাবে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী দেশগুলিতে যথেষ্ট সম্মান লাভ করিয়াছিলেন। পাল রাজারা বহু বৌদ্ধবিহার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে কয়েকটি বিশেষ প্রসিদ্ধ। যেমন বিক্রমশীলা মহাবিহার, সোমপুর ও ওদন্তপুর বিহারসমূহ।

বঙ্গদেশে সেন রাজাগণ বৌদ্ধধর্মের প্রতি বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন না। ফলে তাহারা বৌদ্ধধর্মের কোন পৃষ্ঠপোষকতাও করেন নাই। একদিকে পৃষ্ঠপোষকতার অভাব অন্যদিকে বখ্‌তিয়ার খিলজির আক্রমণ বঙ্গদেশের বৌদ্ধধর্মের পতনের ইহাই বোধহয় অন্যতম কারণ।

সহজীয়া ধর্ম ঃ প্রাচীন কাল হইতে বৌদ্ধধর্মমতে অনেক পরিবর্তন ঘটিয়াছে। হিউয়েন-সাঙ সপ্তম শতাব্দীতে ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের যেরূপ প্রচলন দেখিয়াছিলেন তাহা গৌতম বুদ্ধ, অশোক এমন কি কণিষ্কের সময়কার বৌদ্ধধর্ম অপেক্ষায় অনেক পৃথক ছিল। কিন্তু পালযুগে বঙ্গদেশে বৌদ্ধধর্মের যে রূপ ধারণ করিয়াছিল তাহার প্রকৃতি এই সমস্ত হইতে পৃথক। প্রাচীন সর্বাস্তিবাদ, সমজাতীয় প্রভৃতি বৌদ্ধমত এই সময় বিলুপ্ত হইয়াছে। এমনকি অপেক্ষাকৃত আধুনিক মাহাযান বৌদ্ধধর্মমতবাদ ও নানা রহস্যজনকরূপে পরিগ্রহ করিয়া ব্রহ্মযান, তন্ত্রযান প্রভৃতিতে পরিণত হইয়া সম্পূর্ণ নূতন আকার ধারণ করিয়াছিল।

ছোটখাট প্রভেদ থাকিলেও এই সমস্ত নূতন ধর্মমতগুলির মধ্যে যথেষ্ট ঐক্য ছিল। সেইজন্য ইহাদিগকে মোটামুটিভাবে সহযান বা সহজীয়া ধর্ম বলা হইয়াছে। এই ধর্মের আচার্যগণ সিদ্ধাচার্য নামে খ্যাত। ইহাদের সংখ্যা মোট ৮৪ জন। সম্ভবতঃ দশম শতাব্দী হইতে দ্বাদশ শতাব্দীতে এই সমস্ত সিদ্ধাচার্যগণ জন্মগ্রহণ করেন। ইহারা অপভ্রংশ ও দেশীয় ভাষায় গ্রন্থ রচনা করিতেন। তিব্বতীয় বৌদ্ধাচার্যগণ বঙ্গ ও বিহারে বৌদ্ধ পণ্ডিতগণের সহায়তায় ইহাদের

লিখিত গ্রন্থরাজী তিব্বতীয় ভাষায় রচনা করেন। সেই সব অনুবাদ তিব্বতীয় তেঙ্গুর নামক গ্রন্থে আছে। মূল গ্রন্থ প্রায় সবটাই লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। প্রাচীন বাংলা ভাষায় রচিত প্রায় সবই এই সিদ্ধাচার্যগণের রচনা। এই সিদ্ধাচার্যগণের মধ্যে সরহ, লুইপাদ, কৃষ্ণপাদ প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বৈদিক ধর্ম, পৌরাণিক পূজাপদ্ধতি, জৈন এবং এমনকি বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের প্রতি তীব্র শ্লেষ, কটাক্ষ, ব্যঙ্গোক্তি প্রভৃতি গ্রন্থসমূহের মধ্যে স্থান পাইয়াছে। এই সিদ্ধাচার্যগণ প্রাচীন সংস্কার ও ধর্মমতের তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন। তাহারা যে স্বাধীন চিন্তা ও বিচারবুদ্ধির পরিচয় দিয়াছেন তাহা খুবই আশ্চর্যজনক। এই সহজীয়া মতই আবার চরম গুরুবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। একদিকে সূক্ষ্ম ও স্বাধীন চিন্তা অন্যদিকে নির্বিচারে গুরুর প্রতি আস্থা, এই পরস্পরবিরোধী মুখ্য প্রবৃত্তির উপর সহজীয়া ধর্মের ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছিল।

যে ধর্মে কেবল গুরুর বচনই প্রামাণিক তাহার সাধন প্রণালীও অনেক পরিমাণে গুহ্য ও রহস্যাবৃত। এই সাধন প্রণালী একপ্রকার যোগবিশেষ। যন্ত্রযান, সহজযান, কালচক্রযান প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন সাধন প্রণালীর মধ্যে সামান্য কিছু পার্থক্য আছে। চরম গুরুবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত ও গোপন রহস্যে আবৃত থাকায় সহজীয়া ধর্ম ক্রমে আধ্যাত্মিক অধঃপতনের দিকে অগ্রসর হইল। বৌদ্ধ-ধর্মের বিধিনিষেধ যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল তাহা এই অধঃপতনের যুগে নিশ্চিত-ভাবে লোপ পাইল। একই কারণে হিন্দুর তন্ত্রোক্ত সাধন ও একই পরিণতি লাভ করিয়াছে। ফলে সহজীয়া ধর্ম ও তান্ত্রিক সাধনা একাকার হইয়া বঙ্গদেশের ধর্মজগতে এক ভীতিপ্রদ অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছিল। বঙ্গদেশের শাক্তধর্মও এই সহজীয়া ধর্মের সহিত মিলিত হইয়া গিয়াছিল। ফলে এক দিকে নূতন নূতন শাক্ত সম্প্রদায় অপরদিকে নাথপন্থী সহজীয়া অবধূত, বাউল প্রভৃতি সৃষ্টি হইল।

সম্প্রতি নেপালে এক নূতন শাক্ত সম্প্রদায়ের কতকগুলি শাস্ত্রগ্রন্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই সম্প্রদায় কৌল নামে অভিহিত। ইহাদের গুরু মৎসেন্দ্রনাথ। কৌল নামটি কুল হইতে উৎপন্ন, ইহার তত্ত্বগুলি সহজীয়া মতবাদ হইতে গৃহীত। কিন্তু একটি বিষয়ে সহজীয়াদের অপেক্ষায় ইহাদের প্রভেদ ছিল। ইহারা জাতি-ভেদ মানিয়া চলিত। নাথপন্থীদের গুরু মৎসেন্দ্রনাথ ও তাহার শিষ্য ছিলেন গোরক্ষনাথ। ময়নামতীর গান হইতে মনে হয় এককালে বঙ্গদেশে ইহাদের খুব প্রভাব ছিল।

বৌদ্ধধর্ম বঙ্গদেশ হইতে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এতবড় একটা ধর্মমতের প্রভাব একেবারে নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে ইহা বিশ্বাস করা কঠিন।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে বঙ্গদেশে ধর্মঠাকুরের পূজা বৌদ্ধধর্মের শেষ চিহ্ন। তবে একথা সত্য বঙ্গদেশে বৌদ্ধধর্ম কেবলমাত্র একটি লৌকিক ধর্মে পর্যবসিত হয় নাই। মধ্যযুগে যে সমস্ত ধর্মমত প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল তাহা অনেকাংশেই প্রত্যক্ষ বা প্রচ্ছন্নভাবে বৌদ্ধধর্মের দ্বারা প্রভাবিত ছিল এ বিষয়ে প্রায় সকল পণ্ডিতেরাই এক মত। বঙ্গদেশে যে চিত্র পাওয়া যায় দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রেও তাহা প্রযোজ্য বলিয়া বলা যাইতে পারে। তাম্রলিপ্ত প্রসঙ্গে এই সবের কিছু কিছু উল্লেখ পূর্বে করা হইয়াছে।[১৪]

শিল্পকলা

প্রাচীন বঙ্গে স্থাপত্য শিল্পের ইতিহাস রচনা খুবই কঠিন কাজ। কারণ সেযুগের প্রাসাদ, মন্দির, স্তূপ, বিহার প্রভৃতির কোন চিহ্ন এখন নাই বলিলেই চলে। ফা-হিয়েন, হিউয়েন-সাঙ-এর বিবরণ এবং প্রাচীন শিলালিপি ও তাম্র-শাসনগুলি বিশ্লেষণ করিলে এ বিষয়ে সন্দেহ থাকে না যে প্রাচীন যুগে বঙ্গদেশে বিচিত্র কারুকার্যমণ্ডিত বহু প্রাসাদ, স্তূপ, বিহার মন্দির প্রভৃতি ছিল। কিন্তু প্রায় সবই ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। প্রাচীন প্রশস্তিকারেরা উচ্ছ্বসিত ভাষায় যে বিশাল গগনস্পর্শী মন্দির প্রভৃতিকে 'ভূ-ভূষণ' কুলপর্বত সদৃশ অথবা সূর্যের গতিরোধকারী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন তাহার কোন নিদর্শনই এখন খুঁজিয়া পাওয়া সম্ভব নয়। দ্বাদশ শতকেও সন্ধ্যাকর নন্দী বরেন্দ্রভূমিতে যে সব প্রাসাদ ও মহাবিহার, খচিত অট্টালিকা ও মন্দির দেখিয়াছিলেন তাহা সবই ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। বঙ্গের প্রাচীন স্থাপত্য শিল্পের গৌরব শুধু রহিয়া গিয়াছে কিন্তু তাহার নিদর্শন প্রায় নাই বলিলেই চলে।

একে বঙ্গদেশের অট্টালিকা নির্মাণে প্রস্তর সুলভ নয়। সেজন্য অধিকাংশ নির্মাণ কার্যে ইটের ব্যবহার হইত। আর্দ্র বায়ু ও অতিরিক্ত বৃষ্টি, এবং নদী প্লাবনের ফলে এগুলি শীঘ্রই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। তাহা ছাড়া পরবর্তীকালে বৈদেশিক আক্রমণকারীদের দ্বারাও প্রচুর প্রাচীন কীর্তি বিনষ্ট হইয়াছে।

সামান্য যে কয়েকটি ভগ্নপ্রায় মন্দির এই ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা পাইয়া এখনও টিকিয়া আছে, তাহা অনেক সময় জঙ্গল পরিপূর্ণ মৃত্তিকা স্তূপ খনন করিয়া বা অন্যান্য খনন কার্যের মাধ্যমে পুরাতত্ত্ব অনুসন্ধিৎসুগণ কখনও কখনও অতীত কীর্তির সামান্যতম নিদর্শনও আবিষ্কার করিয়াছেন প্রাচীন বঙ্গদেশের স্থাপত্য শিল্পের ইতিহাস রচনায় ইহারাই সামান্য সম্বল।

বৌদ্ধ স্তূপ ঃ বৌদ্ধ স্তূপই ভারতবর্ষে সর্বপ্রাচীন স্থাপত্য শিল্পের নিদর্শন।

ভগবান বুদ্ধের অস্থি অথবা তাহার ব্যবহৃত বস্তু রক্ষা করিবার জন্য প্রথমে স্তূপের পরিকল্পনা গৃহীত হয়। পরে বিশেষ বিশেষ ঘটনা চিরস্মরণীয় করিবার জন্য যে যে স্থানে এইসব ঘটিয়াছিল সেখানে এই ধরণের স্তূপ নির্মিত হইত। বৌদ্ধদের পূর্বেও হয়ত এই প্রথা ছিল এবং পরে জৈনরাও স্তূপ নির্মাণ করিত। তবে বৌদ্ধগণের স্তূপই বিশেষ বিখ্যাত। পরবর্তীকালে বৌদ্ধগণ স্তূপকে পবিত্র মন্দিরের ন্যায় পূজা ও অর্চনা করিত। প্রাচীন বঙ্গদেশে অনেক বৌদ্ধস্তূপ নির্মিত হইয়াছিল।

স্তূপের তিনটি অংশ। সর্বপ্রাচীন স্তূপে অনুচ্চ গোলাকৃতি অধোভাগের উপর গম্বুজাকৃতি মধ্যম অথবা প্রধান অংশ এমনভাবে নির্মিত হইত যাহাতে অধো-ভাগের কতকটা স্থান মুক্ত থাকে এবং ইহার উপর দিয়া গম্বুজের চারিদিকে ঘুরিয়া আসা যায়। এই উন্মুক্ত অংশ ভক্তগণের প্রদক্ষিণ পথস্বরূপ ব্যবহার করা হইত।

কালক্রমে স্তূপের আকৃতি ক্রমশ দীর্ঘকায় হইতে থাকে। হিউয়েন-সাঙ পুণ্ড্রবর্ধন সমতট কর্ণসুবর্ণের যে যে স্থানে গৌতম বুদ্ধ ধর্মোপদেশ দান করিয়াছিলেন সেই সেই স্থানে মৌর্য সম্রাট অশোক নির্মিত স্তূপগুলি তিনি দেখিয়াছিলেন। ইহাতে প্রমাণিত হয় যে হিউয়েন-সাঙ-এর সময় বঙ্গদেশে এমন বহু প্রাচীন বৌদ্ধস্তূপ ছিল যাহা লোকে অশোকের নির্মিত বলিয়া মনে করিত। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে বুদ্ধ এই সকল স্থান পরিদর্শন করিয়াছিলেন কিনা এবং তাহা স্মরণীয় করিবার জন্য অশোকই এই সকল স্তূপ নির্মাণ করাইয়াছিলেন কিনা তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। উপরন্তু ঐ সময়কার কোন স্তূপের ধ্বংসাবশেষ আজ পর্যন্ত বঙ্গদেশে আবিষ্কৃত হয় নাই।

বঙ্গদেশে যে সব স্তূপ দেখা যায় তাহা সাধারণত ক্ষুদ্রাকৃতি। ১০১৫ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত একটি বৌদ্ধপুঁথিতে বরেন্দ্রের মৃগস্থাপন স্তূপের একটি চিত্র আছে। চীনা পরিব্রাজক সপ্তম শতকে স্তূপটি নাকি দেখিয়াছিলেন। বৌদ্ধ-গ্রন্থের পুঁথিতে বঙ্গের আরও দুই-তিনটি স্তূপের ছবি আছে। ইহার একটি 'তুলাক্ষেত্রে বর্ধমান স্তূপ'। পাহাড়পুর ও বহুলাড়ার (বাঁকুড়ার) বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইষ্টক স্তূপের অর্ধভাগ আবিষ্কৃত হইয়াছে। এইগুলি গোল, চতুষ্কোণ বা ক্রশের আকার। বিহারের প্রাচীন স্তূপ ও বঙ্গদেশের স্তূপের অর্ধভাগের সহিত ইহাদের অনেকের নিকট সাদৃশ্য আছে।

যোগীগুম্ফা নামক স্থানে একটি ক্ষুদ্রাকার স্তূপ পাওয়া গিয়াছে। ইহাকে বঙ্গদেশের স্তূপের শেষ বিবর্তন বলিয়া ধরা যাইতে পারে। হিউয়েন-সাঙ তাম্রলিপ্তে যে অশোকস্তম্ভ দেখিয়াছিলেন তাহার পার্শ্বস্থ সিড়িতে তিনি বৌদ্ধ ভিক্ষুদের বসিতে ও বেড়াতে দেখিয়াছিলেন।

বৌদ্ধ বিহার ঃ প্রাচীন ভারতের বিহারগুলির মাঝখানে একটি প্রশস্ত আঙ্গিনায় চারিদিকে গৃহ নির্মাণের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। এই সমস্ত গৃহগুলি সাধারণত কাষ্ঠ নির্মিত হইত। কোন কোন ক্ষেত্রে ইষ্টক ও প্রস্তর নির্মিতও হইত। পরবর্তীকালে বিহারের জীবনযাত্রা আরো বৃদ্ধি পাইলে তখন বিশাল বিশাল স্তম্ভযুক্ত বহুতল বিহার নির্মাণের প্রচলন হইয়াছিল। প্রথম অবস্থায় বিহারগুলি ছিল সন্ন্যাসীদের আবাসস্থল। পরে ইহা প্রধান প্রধান শিক্ষাক্ষেত্রে রূপান্তরিত হইয়া ছিল,অনেকটা আধুনিক যুগের আবাসিক বিশ্ববিত্যালয়ের মত।

এই সমস্ত বিহারগুলির ঐশ্বর্য, বিশালত্ব সম্পর্কে কিছু ধারণা হিউয়েন-সাঙ কর্তৃক কর্ণসুবর্ণ, পুণ্ড্রবর্ধনে দুইটি বৌদ্ধবিহারের বর্ণনায় পাওয়া যায়। পাহাড়-পুরে ধ্বংশাবশেষে প্রাপ্ত বিভিন্ন প্রত্নবস্তুগুলির সাহায্যে এ সমস্ত বিহারের ঐশ্বর্য ও এখানকার অধিবাসীদের জীবনযাত্রা সম্পর্কে পরিষ্কার একটি ধারণা লাভ করা যায়। ভারতবর্ষে এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত বিহারগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ বিহার হইল ধর্মপাল নির্মিত সোমপুরের বিহার। ইহার বিশালত্ব ও সৌন্দর্য লোকের মনে বিস্ময় উদ্রেক করিত। ইহার মহাবিহার নামটি খুবই সার্থক। ফা-হিয়েন, হিউয়েন-সাঙ তাম্রলিপ্তে অনেক ছোট ছোট বৌদ্ধ বিহারের বর্ণনা দিয়াছেন। দুঃখের বিষয় ইহার কোনটির ধ্বংসাবশেষ এখনও পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। সেজন্য বঙ্গদেশের অন্যান্য স্থানে বিভিন্ন স্থানে বিহারগুলির ধ্বংসাবশেষের সাহায্যেই কেবল প্রাচীন দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গের বিহার সম্পর্কে কতকটা ধারণা লাভ করা যায়।

মন্দির ঃ বঙ্গদেশে বহু মন্দির তৈয়ারী হইয়াছিল। কিন্তু প্রাচীনকালের অধিকাংশ মন্দিরই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। প্রাচীনযুগের শেষদিকে একাদশ-দ্বাদশ শতকের সামান্য কয়েকটি মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গিয়াছে। বৌদ্ধধর্মের কোন কোন গ্রন্থে মন্দিরের ছবি আছে। কতকগুলি প্রস্তর মূর্তি ও মৃৎফলকে মন্দির উৎকীর্ণ আছে। এই সমস্ত মন্দিরের প্রতিকৃতির সাহায্যে বঙ্গের প্রাচীন মন্দির সম্পর্কে কিছু ধারণা করা যাইতে পারে। ছাতের আকৃতি অনুসারে বঙ্গদেশের প্রাচীন মন্দিরগুলিকে চারি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়।

ইহাদের প্রথম শ্রেণীর মন্দিরগুলির ছাত উপর্যুপরী কতকগুলি চতুষ্কোণ স্তরের সমষ্টি। প্রতি দুই স্তরের মধ্যবর্তীভাগ অন্তর্নিহিত থাকায় এই স্তরগুলি বেশ পৃথক পৃথক দেখা যায়। গুপ্তযুগের ভাস্কর্যে এই শ্রেণীর মন্দির উৎকীর্ণ আছে। ইহার পরিণতি দেখা যায় উড়িষ্যার মন্দিরে সম্মুখস্থ জগমোহনের মন্দিরে (উড়িষ্যায় ইহাদের নাম ভদ্র অথবা নীড় দেউল)। দ্বিতীয় শ্রেণীর মন্দিরের ছাত

উড়িষ্যার মন্দিরের ন্যায় শিখরে ঢাকা। চতুষ্কোণ গর্ভগৃহের প্রাচীরগাত্র হইতে উচ্চশিখরে চারটি ধার উঠিয়া ঈষৎ বাঁকা হইতে হইতে প্রায় সংলগ্ন হইয়া যায়। এই সংযোগস্থলকে একটি গোলাকার প্রস্তর স্তম্ভে আবদ্ধ করা হয় এবং শিখর গাত্রে কারুকার্য খচিত অনেক লম্বালম্বি পংক্তি থাকে। এই মন্দিরের নাম রেখদেউল।

প্রথম শ্রেণীর ভদ্র দেউলে সর্বোচ্য স্তরের উপর একটি স্তূপ অথবা শিখর স্থাপন করিয়া অন্য দুই শ্রেণীর মন্দির কোন কোন ক্ষেত্রে এই স্তূপ বা শিখর কেবল সর্বোচ্য স্তরের উপরে নহে প্রতিস্তরের কোণে অথবা সম্মুখভাগে দেখা যায়।

বৌদ্ধ পুঁথির চিত্র ও ভাস্কর মূর্তি হইতে জানা যায় প্রাচীন বঙ্গে এই চার শ্রেণীর মন্দিরই ছিল। তবে শেষোক্ত দুই শ্রেণীর কোন প্রাচীন মন্দির এ পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই। বাঁকুড়ার এক্তেশ্বরের মন্দির প্রাঙ্গনে নন্দীর যে ক্ষুদ্র একটি প্রাঙ্গন আছে তাহাই বঙ্গদেশের প্রথম শ্রেণীর মন্দিরের একমাত্র নিদর্শন। এতদ্ব্যতীত বঙ্গদেশে যে কয়েকটি মন্দির পাওয়া গিয়াছে তাহার সবকয়টি দ্বিতীয় শ্রেণীর। বর্ধমানের বরাকরে একটি ও বাঁকুড়ায় দুইটি, এই মোট তিনটি মাত্র মন্দির প্রস্তরের নির্মিত। অবশিষ্ট কয়েকটি ইষ্টক নির্মিত। এই মন্দিরগুলির শিখরও উড়িষ্যার মন্দিরের অনুরূপে। দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গের স্থাপত্যরীতির উপর চান্দেল্ল এবং সর্বোপরী সোমবাসী রাজাদের সৃষ্ট বিখ্যাত উড়িষ্যার স্থাপত্যরীতির (ভূবনেশ্বরের লিঙ্গরাজ মন্দির) প্রভাব এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে স্মরণীয়।

প্রাচীনবঙ্গের মন্দির খুব বেশী না থাকিলেও এই সমস্ত মন্দিরের অংশ বিশেষ যথা চৌকাঠ, স্তম্ভ, দরজায় এত উৎকৃষ্ট কারুকার্যের নিদর্শন আছে যে তাহা হইতে সেই সময়কার মন্দিরের সৌন্দর্য সম্পর্কে কিছু অনুমান করা যাইতে পারে। অনেক কাষ্ঠনির্মিত দরজা ও স্তম্ভের গাত্রে যে সূক্ষ্ম-সূক্ষ্ম কারুকার্য দেখিতে পাওয়া যায় তাহাই প্রাচীনবঙ্গের লুপ্ত মন্দিরশিল্পের প্রকৃত স্মৃতি স্বরূপ।

ভাস্কর্যঃ প্রাচীনবঙ্গের দেবমন্দিরই স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পের প্রধান কেন্দ্রস্থল ছিল। বঙ্গদেশের ভাস্কর্য প্রভূত উন্নত ছিল। মন্দিরের সঙ্গে সঙ্গে ইহার অধিকাংশ বিনষ্ট হইয়াছে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে মন্দির ধ্বংস হইলেও দেব-দেবীর মূর্তিগুলি রক্ষা পাইয়াছে। বঙ্গদেশের বিভিন্ন স্থানে বহু দেব-দেবীর মূর্তি পাওয়া গিয়াছে। তবে ইহাদের অধিকাংশই নবম শতকের পরে। যে সমস্ত ভাস্কর্যের নিদর্শন বহু প্রাচীনকালের বলিয়া মনে হয় তাহাদের সংখ্যা খুব বেশী নহে। রাজা চন্দ্রবর্মার

রাজধানী পুষ্করণা (বাঁকুড়া জেলা), সুপ্রসিদ্ধ বন্দরনগরী তাম্রলিপ্ত ও অন্যান্য স্থানগুলিতে প্রাপ্ত উৎকীর্ণ পোড়ামাটির মূর্তি সর্বপ্রাচীন ভাস্কর্যের নিদর্শন। ইহাদের মধ্যে বসনভূষণের বৈচিত্র্যে তাম্রলিপ্তে প্রাপ্ত যক্ষ-যক্ষিণীর মূর্তির মধ্যে মৌর্য, গুপ্ত, শুঙ্গ, কুষাণ যুগের মূর্তিও পাওয়া গিয়াছে। ইহাদের মধ্যে একটি যক্ষিণীমূর্তির মস্তকের পরিধান ভারুতে প্রাপ্ত যক্ষিণীমূর্তির অনুরূপ।

মহাস্থানগড়, চন্দ্রকেতুগড়, বানগড় প্রভৃতি অঞ্চলে প্রাপ্ত পোড়ামাটির মূর্তিতে শুঙ্গ, কুষাণ যুগের শিল্পের লক্ষণ পাওয়া যায়। কুষাণ শিল্পরীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল তাহার পরিধেয় বসন। এই যুগের মূর্তিদের পরিধানে একটি বিশেষ রীতি ছিল এবং এই বসন মূর্তির সারা দেহে কাঁধ হইতে হাঁটু পর্যন্ত আবৃত করিয়া দিত। এই ধরণের শিল্পরীতি সে যুগে ভারতবর্ষের আর কোথাও ছিল না। পরবর্তীকালে এই রীতি মথুরার শিল্পীগণ খানিকটা অনুকরণ করিয়াছিলেন। মথুরা রীতিতে নির্মিত যক্ষিণীমূর্তির মধ্যে অনেক বেশী দৈহিক সৌন্দর্য লক্ষ্য করা যায়। তাহাদের ভঙ্গি অনেকটা বিদগ্ধ।

এই কুষাণ ও মথুরার শিল্পরীতি গুপ্ত যুগে আসিয়া পরিণতি লাভ করিয়াছিল যাহার প্রকৃত প্রমাণ সারনাথে পাওয়া যায়। পূর্বের যুগে বৃহৎ স্থূল মূর্তির পরিবর্তে গুপ্ত যুগে মূর্তিগুলি অনেক প্রাণবন্ত, দৈহিক সুষমামণ্ডিত এবং অন্তর্নিহিত আধ্যাত্মিক শক্তিতে সমুজ্জ্বল। এই ধরণের রীতিতে গঠিত অনেক মূর্তি বঙ্গদেশের বিভিন্ন স্থানে পাওয়া গিয়াছে। বিশেষত তাম্রলিপ্তে পোড়ামাটির অনেক মূর্তি এই যুগের বলিয়া নিশ্চিতভাবে মনে হয়। গুপ্ত যুগের মূর্তিদের দেহে অলঙ্কার বাহুল্য নাই। কিন্তু শিল্পীদের সহজ শিল্প নৈপুণ্যে তাহারা সমুজ্জ্বল। ইহাই গুপ্তযুগের বৈশিষ্ট্য।

এই মূর্তিগুলি প্রাচীন বঙ্গদেশের ভাস্কর্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। গুপ্তপূর্ব যুগের মূর্তিগুলিকে যেমন সংযম ও গাম্ভীর্যের সঙ্গে কমনীয়তা ও ভাবপ্রবণতার অপূর্ব সমন্বয় দেখা যায় তেমনি গুপ্ত আদর্শে তৈরী মূর্তিগুলির মধ্যে কমণীয় অথচ শান্তসমাহিতভাব পরিপূর্ণ মুখশ্রী এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গের লাবণ্য ও সুষমা লক্ষ্য করা যায়। এই সকল মূর্তি হইতে প্রমাণিত হয় যে খ্রীষ্টের জন্মের বহু পূর্ব হইতেই বঙ্গদেশে ভাস্কর্যের চর্চা ছিল এবং বঙ্গদেশের শিল্পীগণ গুপ্তযুগ পর্যন্ত ভারতের সাধারণ শিল্পকলার সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিয়া চলিত।

নবম, দশম, একাদশ ও দ্বাদশ এই চারি শতাব্দীর শিল্পকে পাল যুগের শিল্প নামে অভিহিত করা যাইতে পারে। যদিও দ্বাদশ শতকের শেষদিকে সেন রাজাগণ বঙ্গদেশে আসিয়াছিল এবং বর্ম, চন্দ্র প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজাগণ

স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিয়াছিলেন তথাপি এই চারি শতাব্দীর শিল্পকলা একই বিশেষ লক্ষণযুক্ত।

এই যুগের প্রস্তর ও ধাতুশিল্পের যে সব নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে তাহাদের বিষয়বস্তু কেবল দেবদেবীর মূর্তি। বাস্তব সম্পর্কে তাহাদের কোন প্রত্যক্ষ যোগাযোগ নাই। এই ধরণের শিল্পকার্য শিল্পীর স্বাধীন ইচ্ছার বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে দেবদেবীর যে ধ্যান আছে সাধারণভাবে তাহার অনুকরণের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিত। উপকরণেও শিল্পীর তেমন স্বাধীনতা ছিল না। অষ্টধাতু, কালো কষ্টিপাথর বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে ইহাই ছিল মূর্তি তৈয়ারীর প্রধান উপাদান। রৌপ্য ও স্বর্ণ নির্মিত মূর্তির সংখ্যা খুবই কম। কাষ্ঠ নির্মিত মূর্তিও মাত্র অল্প সংখ্যক পাওয়া গিয়াছে।

পালযুগের চারিশত বৎসরে স্বাভাবিক কারণে শিল্পের অনেক বিবর্তন ঘটিয়াছিল। কিন্তু এই বিবর্তনের সঠিক ইতিহাস জানার কোন উপায় নাই। এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত বহু মূর্তির মধ্যে মাত্র কয়েকটিতে সময়সূচক লিপি উৎকীর্ণ আছে।

মূর্তির রচনা বিন্যাস, গঠন প্রণালী ও সৌন্দর্যের দিক দিয়া বিচার করিলে ইহাদিগকে কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। কিন্তু এই প্রভেদ কতটা স্থানকাল ভেদে এবং কতটা শিল্পীর ব্যক্তিগত রুচি ভেদ ঘটিয়াছে বলা শক্ত। একজন প্রসিদ্ধ শিল্প সমালোচক (নীহাররঞ্জন রায়) বঙ্গদেশে পালযুগে শিল্প বিবর্তন সম্পর্কে আলোচনা করিতে গিয়া ভিন্ন ভিন্ন শতকের শিল্পের লক্ষণ ও বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করিয়াছেন। তাহার মতে নবম শতাব্দীতে দেহের কমণীয়তা, সুডৌল গঠন ও শান্ত-সমাহিত মুখশ্রী, দশম শতাব্দীতে শক্তিব্যঞ্জক দৃঢ় বলিষ্ঠ দেহ, একাদশ শতাব্দী ক্ষীণতনু, সুকোমল ভাবপ্রবণতা, মুখমণ্ডলে অপ্রার্থিত দিব্যভাব ও দেহের উর্ধভাগের লাবণ্য ও সুষমা এবং দ্বাদশ শতকে ভাবব্যঞ্জনাহীন মুখশ্রী অঙ্গ-প্রতঙ্গের কৃত্রিম আড়ষ্টতা ও বসন ভূষণের প্রাচুর্য ইহাই এই চারি-যুগের বঙ্গদেশের শিল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্য। শিল্পের হিসাবে বঙ্গের মূর্তিগুলি মোটামুটি এইভাবে শ্রেণীবদ্ধকরা হয়তো সম্ভবপর। কিন্তু ইহারা পরপর চারি শতাব্দীর প্রতিনিধি কিনা বলা কঠিন।

পালযুগের শিল্প সম্বন্ধে সাধারণভাবে কয়েকটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায়। শিল্পীরা পাথরের বা ধাতুর উপর খোদাই করিতে যে অসাধারণ দক্ষতা লাভ করিয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। জীবযন্তু, লতাপাতার কাজ এমন নিখুঁত ও সুক্ষ্মভাবে করা হইয়াছে যে বহুকাল ব্যাপী বিশেষ সাধনা ছাড়া তাহা সম্ভব

নয়। একথা স্পষ্টভাবে বোঝা যায় পাঁচ ও ছয়শত বৎসর এই অঞ্চলে একটি উচ্চাঙ্গের শিল্পধারা প্রচলিত ছিল। এযুগের মূর্তিগুলি পরীক্ষা করিলে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে না।

চিত্রশিল্প ঃ পালযুগের পূর্বেকার কোন চিত্র অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। তথাপি খুব প্রাচীনকাল হইতে এদেশে যে চিত্রাঙ্কনের চর্চা ছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ফা-হিয়েন তাম্রলিপ্তে বৌদ্ধবিহার অবস্থানকালে বৌদ্ধ মূর্তির ছবি আঁকিতেন। সুতরাং তাম্রলিপ্তে চিত্রশিল্প যে পুরাতন ও সুপ্রসিদ্ধ ছিল একথা নিশ্চয়ই অনুমান করা যাইতে পারে।

সাধারণ মন্দির ও বৌদ্ধ স্তূপগুলির প্রাচীর গাত্র চিত্রদ্বারা শোভিত হইত। পরবর্তীকালে ভারতের বহুস্থানে এইরূপ বহু চিত্র পাওয়া গিয়াছে। সম্ভবতঃ বঙ্গের অনেক মন্দিরে ও বিহারে বহু চিত্র ছিল তাহা ঐসব মন্দিরের সঙ্গেই ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে।

একাদশ ও দ্বাদশ শতকে লিখিত কয়েকটি বৌদ্ধধর্মের পুঁথিতে বজ্রযান, তন্ত্রযান, মন্ত্রোক্ত দেবদেবীর ছবি ব্যতীত প্রাচীন বঙ্গদেশে আর কোন ছবি পাওয়া যায় নাই। ইহার মধ্যে রামপালের রাজত্বে ২৯তম বর্ষে এবং হরিবর্মার ১৯তম বর্ষে লিখিত দুইখানি অষ্ট-সহস্রিকা এবং হরিবর্মার অষ্টম বর্ষে লিখিত একখানি পঞ্চবিংশতি সহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতার পুঁথি বঙ্গের চিত্রবিদ্যা আলোচনার সর্বপ্রধান সহায়।

রেখা বিন্যাস ও বর্ণ সমাবেশে এই দুই-এর প্রাধান্য অনুসারে চিত্র দুইটির প্রধান শ্রেণী বিন্যাস কল্পিত হইয়াছে। অজন্তা ও ইলোরার চিত্রশিল্পে এই দুই শ্রেণীর চিত্র দেখা যায় এবং ইহারই প্রভাব ভারতবর্ষে অন্যত্র পরিলক্ষিত হয়। পশ্চিম ভারতের চিত্রে রেখাশিল্পের প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। কিন্তু বঙ্গদেশের চিত্রে বর্ণ সমাবেশ ও রেখা বিন্যাস উভয়ের প্রভাব বিদ্যমান। বঙ্গের শিল্পীরা রেখা বিন্যাসে অধিকতর দক্ষতা দেখাইয়াছেন। ইহার সাহায্যে তাহারা যে সৌন্দর্য ও মাধুর্যের অবতারণা করিয়াছেন তাহার তুলনা ভারতবর্ষে দুর্লভ। বঙ্গের এই চিত্রশিল্পের প্রভাব আসাম, বিহার ও নেপাল পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল।

পরিকল্পনার দিক দিয়া বঙ্গের চিত্রও প্রস্তরের উৎকীর্ণ মূর্তির মধ্যে খুব বেশী প্রভেদ নাই। উভয়ের বিষয়বস্তু ও রচনা পদ্ধতি, ভঙ্গী ও অঙ্গ সৌষ্ঠব একই ধরণের। কেন্দ্রস্থলে মূল দেবদেবীর এবং দুই পার্শ্বে আনুসঙ্গিক মূর্তিগুলি এবং কদাচিত অলঙ্কার রূপে দৃশ্যাবলী ব্যবহৃত হইয়াছে।

রামপালের রাজত্বের ৩৯তম বর্ষে লিখিত অষ্টসহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতার পুঁথিতে যে কয়েকটি চিত্র আছে তাহা বঙ্গদেশের চিত্রশিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হিসাবে গ্রহণ করা যাইতে পারে। সাধারণত কয়েকটি বর্ণ ও সূক্ষ্ম রেখাপাতের সাহায্যে শিল্পীর এই সমুদয় চিত্রের একটি লীলায়িত মাধুর্য ও অনবদ্য সৌন্দর্যের সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা এক কথায় অনবদ্য।

কেবলমাত্র রেখার সাহায্যে চিত্রাঙ্কনে বঙ্গদেশের শিল্পীরা কতদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন সুন্দরবনে প্রাপ্ত ডোম্মনপালের তাম্রশাসনের অপর পৃষ্ঠে উৎকীর্ণ বিষ্ণুর রেখাচিত্র তাহার উৎকৃষ্ট নিদর্শন। বঙ্গদেশের এই বিশেষ শিল্পরীতি পরবর্তীকালে শুধু নেপাল, বার্মার শিল্পরীতিকে প্রভাবিত করে নাই ইহা মধ্যযুগে ও অন্যান্য শিল্পরীতির পাশাপাশি বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার স্থানীয় শিল্পরীতি রূপে প্রচলিত ছিল। যাহার আধুনিক ধারা কালিঘাটের পটের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। অর্থাৎ সর্বভারতীয় শিল্পরীতির পাশাপাশি বঙ্গদেশের এই স্থানীয় বিশেষ শিল্পরীতি একইসঙ্গে অবিচ্ছিন্ন গতিতে প্রবাহিত হইয়াছিল।

বঙ্গদেশের শিল্পীদের সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। তিব্বতীয় লামা তারানাথ লিখিয়াছেন ধীমান ও তাহার পুত্র বিটপাল প্রস্তর ও ধাতুর মূর্তি গঠন ও চিত্রাঙ্কনে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তাহার শিষ্য-প্রশিষ্যগণ একটি শিল্পী সম্প্রদায় গঠন করিয়াছিলেন। এই শিল্পীদ্বয়ের নির্মিত মূর্তি বা তাহাদের অন্য কোন বিবর্তন পাওয়া যায় নাই। কিন্তু বঙ্গদেশে যে শিল্পীসংঘ ছিল তাহা বিজয় সেনের দেওপাড়া প্রশস্তিতে লিপিবদ্ধ আছে। ভট্টভবদেবের 'প্রায়শ্চিত্য প্রকরণ' গ্রন্থ অনুসারে চিত্রোপযোগী শিল্পী সমাজে হেয় বলিয়া পরিগণিত হইতেন। কেন অবশ্য সেকথা তিনি উল্লেখ করে নাই।

প্রস্তর ও ধাতুর মূর্তি নির্মাণ ব্যয়সাপেক্ষ। সুতরাং অর্থশালী লোকেরাই এই সমুদয় তৈয়ারী করাইতেন। বঙ্গদেশের শিল্পীগণ নানা প্রকার বাধা নিষেধের মধ্যে কাজ করা সত্ত্বেও যে সূক্ষ্ম সৌন্দর্যবোধ ও দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন তাহা প্রমাণ করে যে তাহাদের মধ্যে শিল্পরীতির একটি সহজ ও স্বাভাবিক অনুভূতি ছিল। ধর্ম ও অভিজাতবর্গের অনুগ্রহে ও পৃষ্ঠপোষকতায় শিল্পীরা সমাজের উচ্চশ্রেণীর মনোরঞ্জন ও প্রয়োজনে কাজ করিতেন। প্রকৃত লোকশিল্পের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় পাহাড়পুর, ময়নাবতী, মহাস্থানগড় এবং তাম্রলিপ্ত ও চন্দ্রকেতুগড় প্রভৃতি স্থানে। এই লোকশিল্পের প্রচলন হয়ত পরবর্তীযুগ পর্যন্ত ছিল। কিন্তু তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ এখনও বিশেষ পাওয়া যায় নাই।[২৫]

প্রাত্যহিক জীবনযাত্রা

হিন্দু সমাজের উচ্চশ্রেণীর জনগণের জীবনযাত্রা জন্মের পূর্ব হইতে মৃত্যুর পর পর্যন্ত কতকগুলি আধা-ধর্মীয় রীতিনীতির দ্বারা চালিত হইত।

বাঙ্গালীর ব্যবহারিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের মূল অনুসন্ধান করিতে গেলে অষ্ট্রিক ও দ্রাবিড় ভাষাভাষি আদি সমাজের প্রচলিত শব্দের ধারাবাহিক ইতিহাসের মধ্যে কিছু কিছু সম্ভব। এই হিসাবে বাঙ্গালীর প্রাচীনতম নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক উপাদান এই শব্দগুলির মধ্যে পাওয়া সম্ভব। প্রাচীন বৌদ্ধ ও জৈন সাহিত্যেও এবিষয়ে কিছু পরোক্ষ উপাদান পাওয়া যায়। এছাড়া কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র ও বাৎসায়নের কামশাস্ত্রেও কিছু কিছু ইতস্তত বিক্ষিপ্ত সংবাদ আছে। গুপ্তোত্তর যুগের ইতিহাস জানিতে হইলে ইহাদের উপর নির্ভর করিতে হয়।

গুপ্তযুগ হইতে আরম্ভ করিয়া প্রাচীন যুগের শেষ পর্যন্ত অসংখ্য লিপিমালায় এবং প্রস্তর ও ধাতব দেবদেবীর মূর্তি ও পোড়ামাটির ফলকে বাঙ্গালীর দৈনন্দিন জীবন সম্পর্কে মোটামুটি বিস্তৃত ও নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া সম্ভব। সমসাময়িক সংস্কৃত ও প্রাকৃত অপভ্রংশ সাহিত্যেও এ বিষয়ে নানা খবর পাওয়া যায়। বঙ্গের সুবিস্তৃত স্মৃতি সাহিত্য, বৃহদ্ধর্মপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, চর্যাগীতিমালা, দোহাকোষ, সদুক্তিকর্ণামৃত ও প্রাকৃতিক পোঙ্গলের কিছু কিছু শ্লোক এবং রামচরিত ও পবনদূতের মত কাব্য প্রভৃতি গ্রন্থে সমসাময়িক বাঙ্গালীর দৈনন্দিন জীবনের নানা তথ্য আছে। শ্রীহর্ষের নৈষধ চরিতে দৈনন্দিন জীবন সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। কিন্তু তাহার বাঙালীত্ব সর্বজনগ্রাহ্য নহে। প্রাচীন স্মৃতিশাস্ত্র বিশ্লেষণ করিলে বোঝা যায় বাঙ্গালীদের এই দৈনন্দিন উৎসবের দিনগুলি অনেক শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধের বেড়াজালে শক্তভাবে আবদ্ধ ছিল। কিন্তু এই সমস্ত উৎসব তাহাদের জীবনে বিভিন্ন লোকেদের সহিত মেলামেশা ও ভাবের আদান-প্রদানের সুযোগ আনিয়া দিত। সেইজন্য এই সমস্ত উৎসব সামাজিক জীবনে খুবই উপভোগ্য ছিল।

দৈনন্দিন জীবন : এমন কোন নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায় নাই যাহার সাহায্যে প্রাচীনকালে বঙ্গের জনগণের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা সম্বন্ধে একটা ধারণা পাওয়া যাইতে পারে। প্রাচীনযুগের একেবারে শেষভাগে লিখিত চর্যাপদের মধ্যে একমাত্র বাঙ্গালীর জীবনযাত্রা সম্বন্ধে কিছু নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কিছু লিপি মূর্তি এবং বৈদেশিক বিবরণের মধ্য হইতে সামান্য কিছু তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব। ইহার সাহায্যে মোটামুটিভাবে চতুর্থ হইতে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্য পর্যন্ত বাঙ্গালীদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার একটা

সাধারণ চিত্র অঙ্কিত করা সম্ভব। হিউয়েন-সাঙ-এর ভ্রমণ বৃত্তান্তে বাঙ্গালীদের সাধারণ চরিত্র সম্পর্কে কিছু মন্তব্য করিয়াছেন। তাঁহার বিবরণে দেখা যায় তাম্রলিপ্তের জনগণ ছিল সাহসী ও কষ্টসহিষ্ণু। তাহারা সব ব্যাপারে তাড়াহুড়ো করিয়া কাজ করিত এবং কর্ণস্থবর্ণের লোকেরা ছিল সাধু এবং অমার্জিত। ইৎ-সিঙ তাম্রলিপ্তের বৌদ্ধবিহারবাসী সন্ন্যাসীদের উচ্চনৈতিক মানের কথা বলিয়াছেন। হিউয়েন-সাঙ বঙ্গদেশের জনগণ সাধারণভাবে শিক্ষার প্রতি আগ্রহী বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। কাশ্মীরের কবি খেমেন্দ্র তাহার হাস্যরসাত্মক কাব্য "দশোপোদেশে" গৌড় হইতে কাশ্মীরে আগত ছাত্রদের প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, তাহাদের খুবই শীর্ণদেহ ও রুক্ষ মেজাজ এবং সামান্য প্ররোচনায় তাহারা ক্ষিপ্ত হইয়া ওঠেন। বাঙ্গালীদের চরিত্রে কলহ-প্রবণতার বিষয় বিজ্ঞানেশ্বরের এক উক্তিতে পরিষ্কারভাবে উল্লেখ আছে। কিন্তু লেখকগণ সর্বদাই প্রাচীন বাঙ্গালীদের উচ্চমানের নৈতিক চরিত্রের কথা বার বার উল্লেখ করিয়াছেন। তাহারা সর্বপ্রকার অপরাধমূলক কার্যকলাপ (ব্রাহ্মণ হত্যা, মদ্যপান, চারিত্রিক শৈথিল্য) প্রভৃতিকে ঘৃণ্য অপরাধ বলিয়া মনে করিতেন। সেইজন্য এই সকল অপরাধমূলক কার্যকলাপ হইতে জনগণকে বিরত হইতে উপদেশ দিতেন এবং কেহ এই ধরণের অপরাধ করিলে তাহার জন্য কঠোর শাস্তিবিধানের কথা বলিয়াছেন। একই সঙ্গে তাহারা জনগণকে সত্য, পবিত্রতা, দান, দয়া প্রভৃতি চর্চায় উৎসাহ দিতেন।

সমাজজীবনে নারীর স্থান : বাৎসায়নের কামসূত্র হইতে জানা যায় যে বঙ্গদেশের নারীরা ছিলেন শান্ত, নম্র ও মধুর বাক্যালাপে অভ্যস্ত। তাহারা কোমলাঙ্গী ও অনুরাগবতীও ছিলেন। প্রাচীনকালে বাঙ্গালী মেয়েদের যে বর্ণনা আছে তাহাতে মনে হয় তাহাদের মধ্যে পর্দা প্রথার প্রচলন ছিল না। তাহারা অনায়াসে বাহিরে ভ্রমণ করিতেন। কিন্তু বাৎসায়নের কোন কোন উক্তি হইতে মনে হয় রাজ-পরিবারের মেয়েরা খুব খোলাখুলি ঘোরাফেরা করিতে অভ্যস্ত ছিলেন না। তাহারা পর্দার আড়াল হইতে বাহিরের লোকেদের সহিত কথাবার্তা বলিতেন। প্রাচীন বঙ্গদেশে মেয়েদের লেখাপড়া শেখার প্রচলন ছিল, তবে ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের ন্যায় তাহাদের এখানে স্বাধীন সত্বা একেবারেই ছিল না মনে হয়। তাহাদের সর্বদা কন্যা, স্ত্রী অথবা মাতা হিসাবে প্রথমে পিতা পরে স্বামী ও শেষে পুত্র বা পরিবারবর্গের অধীন বলিয়া দেখান হইয়াছে। এ বিষয়ে অবশ্য কিছু বৈশিষ্ট্য বঙ্গদেশে লক্ষ্য করা যায়। বঙ্গদেশের পাল ও সেন আমলের লিপিগুলি পাঠ করিলে মনে হয় লক্ষ্মীর মত

কল্যাণী, বসুধার মত সর্বংসহা, স্বামীব্রত নিরতা নারীত্বই ছিল বঙ্গদেশের প্রাচীন আদর্শ। বিশ্বস্ত সহৃদয় বন্ধুসম এবং স্থৈর্য, শান্তি ও আনন্দের উৎসস্বরূপ স্ত্রী হওয়া ছিল তাহাদের একান্ত কাম্য। স্বামীর ইচ্ছা স্বরূপিনী হওয়া তাহাদের বাসনা এবং বীর পুত্রের জননী হওয়ার ইচ্ছাই ছিল তাহাদের চরম পরিণতি।

জীমূতবাহন অপুত্রক স্বামীর মৃত্যুর পর অন্য কোন পুরুষ না থাকিলে বিধবা স্ত্রীকে তাহার স্বামীর সম্পত্তির অধিকারিণী বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং মনে হয় বঙ্গদেশে এই প্রকার বিধি প্রচলিত ছিল। প্রাচীন বঙ্গদেশে নারীরা কতকগুলি আইনসঙ্গত অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা ভোগ করিতেন। অবশ্য ইহার মূল ভিত্তি ছিল স্বাভাবিক সম্পর্ক এবং আত্মীয়দের কর্তব্যবোধ। হিন্দু সমাজে বহুবিবাহ প্রথার ফলে স্বাভাবিক কারণে নারীদের অনেক অসুবিধা ভোগ করিতে হইত। বিবাহিত নারীরা অনেক সময় প্রয়োজনে সূতা কাটিয়া অথবা তাঁত বুনিয়া স্বামীদের আর্থিক সাহায্য করিতেন। স্বামীর মৃত্যুর পর নারীদের জীবনযাত্রা কি হওয়া উচিত সেসব বিষয়ে নানা কঠোর অনুশাসন ছিল। নিরামিষ আহার, সর্ববিধ বিলাসবর্জন এবং কৃচ্ছ্রসাধন প্রভৃতি তাহাদের করিতে হইত। এই অবস্থায় বিধবাদের জীবনযাত্রা খুব একটা সুখকর ছিল না। বিবাহিত স্ত্রীদেরও অনেক সময় স্বপত্নীর সহিত একত্রভাবে কষ্টের জীবন সহ্য করিতে হইত। সহমরণ প্রথা প্রাচীনকালেও প্রচলিত ছিল এবং বৃহদ্ধর্মপুরাণে ইহার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা আছে।

খাদ্য ও পানীয় : ভাত, মাছ, মাংস, তরিতরকারি, শাকসব্জী, দুধ ও ফল এই সবই ছিল বাঙালীদের প্রধান খাদ্য। বঙ্গদেশের বাহিরের ব্রাহ্মণেরা সাধারণত মাছ-মাংস খাইতেন না এবং ইহা নিন্দনীয় বলিয়া মনে করিতেন। কিন্তু বঙ্গদেশের ব্রাহ্মণেরা আমিষ ভোজন করিতেন এবং ভবদেবভট্ট নানা প্রকার যুক্তি প্রয়োগে ইহার সমর্থন করিয়াছেন। হরিণের মাংস বাঙালীদের খুবই প্রিয় ছিল। বৃহদ্ধর্মপুরাণে রুই, পুঁটি, শোল প্রভৃতি আঁশযুক্ত মাছ ব্রাহ্মণদের ভক্ষ্য বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। জীমূতবাহন বাঙ্গালীদের ইল্লিশ (ইলিশ) মাছের তৈলের উল্লেখ ও বহুল ব্যবহারের কথা বলিয়াছেন। ইহা ছাড়া শামুক, কাঁকড়া, মোরগ, গরু, শূকর প্রভৃতির মাংস ছিল একেবারে নিষিদ্ধ। তবে এসবের প্রচলন নিম্নস্তরের লোকেদের মধ্যে ছিল।

মাদক দ্রব্যের মধ্যে ভাত, আটা, মধু এবং গুড় হইতে প্রস্তুত নানাপ্রকার মদ্যের উল্লেখ চর্যাপদে দেখিতে পাওয়া যায়। ভবদেব ভট্টের মতে সুরাপান সকলের মধ্যে নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু ইহা কতটা কার্যকরী ব্যবস্থা ছিল তাহা

সন্দেহের বিষয়। দুগ্ধজাত দ্রব্য বাঙালীদের একটি অত্যন্ত প্রিয় খাদ্য ছিল (ক্ষির, দধি, ঘৃত, ছানা)। ভবদেব ভট্ট স্বাস্থ্যের কারণে কিছু কিছু দুগ্ধজাত দ্রব্য গ্রহণ করা অনুচিত বলিয়া বলিয়াছেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় প্রাচীন বাঙালীর খাদ্য তালিকায় কোথাও ডালের উল্লেখ নাই।

পোশাক ও অলঙ্কার: প্রাচীন সাহিত্য বিশ্লেষণ করিলে মনে হয় সে যুগের বাঙালী স্ত্রী-পুরুষেরা সাধারণত দুইখণ্ড বস্ত্র পরিধান করিতেন। সম্ভবতঃ ছেলেরা এখনকার মতই মালকোচা দিয়া খাট ধুতি পরিতেন, যাহা অধিকাংশ সময়ই হাঁটুর নীচে নামিত না। কিন্তু মেয়েদের শাড়ি পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত পৌঁছাইত। ধুতি ও শাড়ি কেবল শরীরের নিম্নার্ধ আবৃত করিত। উর্ধাঙ্গ কখনও অনাবৃত থাকিত এবং মেয়েরা ওড়না ব্যবহার করিতেন। বাঙালীদের ইহা ছিল সাধারণ পরিধেয় বস্ত্র। কিন্তু বিশেষ উৎসব অনুষ্ঠানে অন্যরকম পোশাকের প্রচলন ছিল দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাচীন বাঙ্গালীরা স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে কেহই মস্তকে কোন আচ্ছাদন ব্যবহার করিতেন না, সেজন্য তাহাদের চুলের নানারকম বাহার দেখিতে পাওয়া যায়। মেয়েদের, কোন কোন ক্ষেত্রে পুরুষদেরও আংটি, দুল, চুড়ি, হার, বালা প্রভৃতি ব্যবহারের উল্লেখ আছে। ইহাদের মধ্যে কিছু কিছু মেয়েদের জন্য বিশেষভাবে শঙ্খ নির্মিত।

বিভিন্ন সাহিত্যে উল্লেখ আছে যে ছেলেরা চামড়ার জুতা, খড়ম, বাঁশের লাঠি ও ছাতা ব্যবহার করিতেন। বিবাহিত নারীরা কপালে সিঁদুর পরিতেন। তাহারা সিঁদুরে ঠোঁটও রাঙ্গাইতেন এবং লাক্ষা দিয়া পা নানাভাবে চিত্রিত করিতেন।

চর্যাপদে বাঙালীদের কিছু আসবাবপত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন বিছানার চাদর, তালা, চাবি ইত্যাদি। রামচরিত মানসে ধনী ব্যক্তিদের বাড়িতে নানাপ্রকার কারুকার্যখচিত আসবাবপত্রের উল্লেখ আছে। বিভিন্ন অঞ্চলে পোড়ামাটির খেলনা, ফুলদানি ও নানাপ্রকার ব্যবহারের বিভিন্ন প্রকার পাত্রেরও সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। সাধারণ জীবনযাত্রায় সবই তখন নিশ্চয়ই ব্যবহার করা হইত এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে।

ক্রীড় চর্চা ও আমোদ-প্রমোদ: বাঙালীদের মধ্যে দাবা ও পাশা খেলা খুবই জনপ্রিয় ছিল। প্রথমটি প্রাচীন বৈদিক যুগ হইতে প্রচলিত এবং বঙ্গদেশে কোন কোন ধর্মীয় উৎসবেরও অঙ্গ ছিল। দ্বিতীয়টি কবে বঙ্গদেশে প্রচলিত হইয়াছিল তাহা বলা শক্ত। কিন্তু চর্যাপদে (দশম শতাব্দী) ইহার স্পষ্ট উল্লেখ আছে। চর্যাপদে কণ্ঠসঙ্গীত, যন্ত্রসঙ্গীত, অভিনয় ও নৃত্য অনুষ্ঠানের উল্লেখ দেখা

যায়। রামচরিতে বাঙ্গালীদের প্রচলিত নানা বাদ্যযন্ত্রের উল্লেখ আছে। সঙ্গীত ও নৃত্য সাধারণভাবে উচ্চশ্রেণীর নারীর মধ্যেই প্রচলিত ছিল। এই প্রসঙ্গে মন্দিরের দেবদাসীদের কথা বলা যাইতে পারে। তাহারা ভারতের নাট্যশাস্ত্রের নিয়ম অনুসারে দেবস্থানে নৃত্য-গীতের চর্চা করিতেন। তাহারা সাধারণ বিশেষ কোন মন্দিরে দেবতার আরাধনার কাজেই কলাবিদ্যা উৎসর্গ করিতেন। সাহিত্যে, শিলালিপিতে এবং নানাবিধ চিত্রে প্রাচীন বঙ্গদেশে স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে নৃত্য অথবা বাদনরত বহু ছবি পাওয়া গিয়াছে।

অন্যান্য ক্রীড়ার মধ্যে বাগান পরিচর্যা ও জলক্রীড়ার উল্লেখ দেখা যায়। পুরুষেরা কুস্তি, শিকার, মল্লযুদ্ধ প্রভৃতি নানারকম শারীরিক কসরৎ প্রদর্শন করিতেন।

যানবাহন ঃ যানবাহনের ব্যাপারে বঙ্গদেশের গরু ও অশ্বচালিত শকট এবং হস্তী ও নৌকার উল্লেখ পাওয়া যায়। অশ্ব, শকট হস্তী সাধারণভাবে ধনীদের ব্যবহারে লাগিত। চর্যাপদে বঙ্গদেশের সেনাবাহিনী কর্তৃক উট অধিকারের কাহিনী দেখিতে পাওয়া যায়। তবে ইহার প্রচলন খুব একটা ছিল বলিয়া মনে হয় না। নদীমাতৃক বঙ্গদেশে পরিবহন ব্যবস্থার অধিকাংশ জলপথে চালিত হইত বলাই বাহুল্য। চর্যাপদে নদীপথে ছাড়া সমুদ্রগামী জাহাজেরও উল্লেখ আছে। গ্রামের লোকেরা ভেলা ব্যবহার করিত।

বিলাসিতা ও নৈতিকতা ঃ বঙ্গদেশে প্রাচীনকালেও আধুনিককালের মত গ্রামবহুল ছিল। রামচরিত মানসে পল্লীবঙ্গের অপূর্ব বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। অবশ্য তখনও বঙ্গদেশে কতকগুলি সমৃদ্ধশালী শহরের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই শহরগুলি বেশীরভাগ ক্ষেত্রে বঙ্গদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে শাসনের প্রধান কেন্দ্র ছিল। প্রাচীনবঙ্গের কবি ও লেখকগণ এই সমস্ত শহরের ঐশ্বর্য ও সৌন্দর্যের বর্ণনা রাখিয়া গিয়াছেন। এই শহরগুলিতে প্রশস্ত রাজকীয় প্রাসাদ, মন্দির, মঠ, সাধারণের জন্য উদ্যান এবং বৃহৎ জলাশয় প্রভৃতির উল্লেখ আছে। কোন কোন শহরে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনায় তালগাছ রোপন করিয়া শহরের সৌন্দর্য ও শহরবাসীদের বসবাসের মনোরম পরিবেশ রচনা করা হইয়াছিল।

এইসব শহরে নানা ধরণের লোকেরা (ধনী, দরিদ্র, বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী) বাস করিতেন। ধনীদের দামী পোশাক ও মূল্যবান আসবাবপত্র, জড়োয়া গহনা এবং পান ও ভোজনের প্রাচুর্যের মধ্যে তাহাদের বিলাসিতার পরিচয় পাওয়া যাইত। বিভিন্ন উৎসবে ভোজের ব্যাপারে প্রয়োজনের অতিরিক্তি খাদ্যদ্রব্য

অপচয় আধুনিক যুগের মত প্রাচীন যুগেও বাঙালীদের একটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বলিয়া মনে হয়।

এই ধরণের ঐশ্বর্য ও বিলাসিতা খুব স্বাভাবিকভাবে নৈতিক মানের অবনতির অন্যতম কারণ। প্রাচীন সাহিত্যে এবং প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনে সে যুগের নৈতিক চরিত্রের যে অধঃপতন ঘটিয়াছিল তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। ধোয়ীর কাব্যেও তাহার বহু উদাহরণ আছে। নৈতিক মানের অবনতির ফলে সমাজে কতকগুলি মন্দ রীতি ও আচারের প্রচলন হইয়াছিল। তাহার মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য হইল ক্রীতদাস প্রথা। ইহার উল্লেখ জীমূতবাহনের পুস্তকে পাওয়া যায়। দ্বিতীয় আর একটি হইল মন্দিরের সেবায় দেবদাসী নিয়োগ। এই প্রথার উদ্দেশ্য ও প্রকৃতি এবং আরম্ভকাল যাহাই হোক না কেন পরবর্তী যুগে ইহা বাঙালীদের নৈতিক অধঃপতনের অন্যতম একটি কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। দেবদাসীরা খুবই শিক্ষিতা ও নৃত্যপটীয়সী হইতেন। সমাজের উচ্চস্তরের নৈতিক জীবনের উপর পরবর্তীকালে ইহাদের প্রভাব খুবই লক্ষ্য করা যায়। এমনকি উচ্চশ্রেণীর মধ্যেও নটনটীবৃত্তির প্রচলন ছিল তাহার প্রমাণ আছে। কবি জয়দেবের গৃহিনী প্রাক্‌বিবাহ জীবনে কুশলী নটী ছিলেন এবং সঙ্গীতে তিনি ছিলেন 'প্রসিদ্ধা।

নৈতিক মানের অধঃপতনের অন্যতম কারণ হইল খ্রীষ্টীয় একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধধর্মের মধ্য হইতে তান্ত্রিক সাধনার দিকে অতিরিক্ত আগ্রহ ও ঝোঁক। এই তান্ত্রিক সাধনা ও তাহার আচার-আচরণ হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের উচ্চমানকে অনেকটাই নিম্নগামী করিয়াছিল। এই দুইটি নৈতিক অধঃপতনে বাঙালীদের জীবনীশক্তিকে অনেকটা পরিমাণে হ্রাস করিয়া দিয়াছিল। এই অবক্ষয়ীত সমাজ ব্যবস্থার মধ্য হইতে নানাপ্রকার কুসংস্কারের উদ্ভব হইয়াছিল। এইসব কুসংস্কার মানুষে-মানুষে এবং স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে মধুর পবিত্র সম্পর্ককে কলুষিত করিয়া তুলিয়াছিল।

প্রাক্‌-মধ্যযুগে বঙ্গদেশের অধিবাসীরা ভৌগোলিক একটা অখণ্ডতার মধ্যে বসবাস করিলেও তাহাদের মধ্যে জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারা গঠনের পক্ষে যাহা সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন ছিল তাহা হইল ভাষাগত ঐক্য। প্রাচীন যুগে এই ভাষাগত ঐক্য তখনও গড়িয়া ওঠে নাই। ভাষাগঠনের পক্ষে যে দুইটি উপাদান প্রয়োজন তাহা হইল জাতিগত ও ভৌগোলিক ঐক্য, বাঙ্গালীদের অধিকাংশ জাতিগত দিক হইতে মোটামুটি একই গোষ্ঠীর অন্তর্গত। প্রাচীন বঙ্গদেশের ভৌগোলিক ঐক্য তখনও সম্পূর্ণ পরিমাণে সাধিত হয় নাই।

কিন্তু সাহিত্যের ক্ষেত্রে বাঙ্গালীর ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চল অপেক্ষায় সম্পূর্ণ আলাদা নিজস্ব ধরণের এক বৈশিষ্ট্য রচনা করিতে সক্ষম হইয়াছিল। এই নিজস্বতার মধ্য দিয়া সমগ্র বাঙ্গালী জাতির মধ্যে যে সাংস্কৃতিক ঐক্যের সুর ধ্বনিত হইয়াছিল তাহাই কালক্রমে জনচেতনায় রূপান্তরিত হইয়া প্রসার লাভ করিয়াছিল। ইহা ছাড়াও বাঙ্গালীদের চরিত্রে এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট্য দশম ও দ্বাদশ শতাব্দীতে দেখা যায় যাহা ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের অধিবাসী অপেক্ষায় তাহাদের একটি স্বাতন্ত্রতা দান করিয়াছিল। এই বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হইল বাঙ্গালীদের নিজস্ব ভাষার সূচনা (বাংলা) এবং মাতৃরূপে দৈবশক্তিকে আরাধনা (দুর্গা), তান্ত্রিকতা বর্জন এবং মস্তকে আচ্ছাদন পরিহার, খাদ্যে মাংসের প্রাচুর্য এবং উত্তরাধিকারের বিশেষ নিয়ম-কানুন। এই সবই বাঙ্গালীদের ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চল হইতে সম্পূর্ণ পৃথক করিয়া রাখিয়াছিল। এই সমস্ত বৈশিষ্ট্যগুলি বর্তমানের মধ্য দিয়া বাঙ্গালীদের শেষপর্যন্ত ভারতীয়দের মধ্য হইতে একটি সম্পূর্ণ পৃথক চরিত্র দান করিয়াছে। মোটকথায় দ্বাদশ শতকের শেষদিকে বাঙ্গালী ঐক্যবদ্ধ জাতি হিসাবে আত্ম-প্রকাশ না করিলেও তাহাদের স্বতন্ত্রজাতি হিসাবে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার সমস্ত সম্ভাবনাই তখন স্পষ্টরূপে দেখা দিয়াছিল। সমগ্র বঙ্গদেশের সহিত দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীদের মধ্যে ও প্রাচীনকালে ঐতিহাসিক এই বিবর্তন সংগঠিত হইয়াছিল ইহা অনুমান করা খুবই যুক্তিসঙ্গত।

সূত্র নির্দেশ

১। History of Bengal, Vol. I, p. 568
২। রমেশচন্দ্র মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস (প্রথম খণ্ড), পৃঃ ১০-১১
৩। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বাঙ্গালার ইতিহাস' (প্রথম খণ্ড), পৃঃ ১০-১৮
৪। History of Bengal, op. cit, pp. 8-9
৫। যোগেশচন্দ্র বসু, মেদিনীপুরের ইতিহাস, পৃঃ ৬৮, ৭০, ৭১
৬। মজুমদার, পূর্বে উল্লিখিত, পৃঃ ১৪-১৫
৭। History of Bengal, op. cit, pp. 566-567
৮। Ibid, p. 10
৯। অতুল সুর, বাঙালীর নৃতাত্বিক পরিচয়, পৃঃ ২১-২৭
১০। অতুল সুর, বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাস, (১৯৭৬), পৃঃ ২৩-২৯
১১। History of Bengal, op. cit, pp. 557-592
মজুমদার, পূর্বে উল্লিখিত, পৃঃ ১৮৮-২০১
নীহাররঞ্জন রায়, " পৃঃ ২৩৭-৩৩৬

১২। History of Bengal, op. cit, pp. 593-608
মজুমদার, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ: ২০১-২০৮
১৩। History of Bengal, op. cit, pp. 642-669
মজুমদার পূর্বে উল্লিখিত পৃ: ২০৯-২১৩
১৪। History of Bengal, op. cit, pp. 394-428
মজুমদার পূর্বে উল্লিখিত পৃ: ১৫৪-১৭৩
রায় " " পৃ: ৬০৫-৭১৫
১৫। History of Bengal, op. cit, pp. 480-556
মজুমদার পূর্বে উল্লিখিত পৃ: ২১৮-২৩৯
রায় " পৃ: ৭৬৩-৮৩২
সরসীকুমার সরস্বতী, পালযুগের চিত্রকলা, ১৯৭৮
১৬। History of Bengal, op. cit, pp. 608-622
রায় পূর্বে উল্লিখিত পৃ: ৫৯১-৬০৩
মজুমদার " পৃ: ২০৬-২০৮

বংশপঞ্জী

পাল রাজবংশ (১)

- দয়িত বিষ্ণু
  - বপ্যট
    - (১) প্রথম গোপাল=দেদ্দা দেবী (৭৫০—৭৭০)
      - (২) ধর্মপাল=রন্নাদেবী (৭৭০—৮১০)
        - ত্রিভুবন পাল
        - (৩) দেবপাল (৮১০—৮৫০)
          - রাজ্যপাল
      - বাকপাল
        - জয়পাল
          - (৪) প্রথম শূরপাল=লজ্জাদেবী (৮৫০—৮৫৪)
            - (৫) নারায়ণপাল (৮৫৪—৯০৮)
              - (৬) রাজ্যপাল (৯০৮—৯৪০)
                - (৭) দ্বিতীয় গোপাল (৯৪০—৯৬০)
                  - (৮) দ্বিতীয় বিগ্রহপাল (৯৬০—৯৮৮)

সাময়িক অবনতি ও পুনরভ্যুত্থান

(৯) প্রথম মহীপাল
(৯৮৮—১০৩৮)

- (১০) নয়পাল (১০৩৮—১০৪৫)
- স্থিরপাল
- বসন্তপাল

পাল রাজবংশ (২)

(১১) তৃতীয় বিগ্রহপাল=যৌবনশ্রী

- (১২) দ্বিতীয় মহীপাল (১০৭০)
- (১৩ শূরপাল (১০৭০—১০৭৫)
- (১৪) রামপাল (১০৭৭—১১২০) — কৈবর্ত বিদ্রোহ
  - রাজ্যপাল
  - (১৫) কুমারপাল (১১২০—১১৩০)
  - (১৭) মদনপাল=চিত্রমতিকা দেবী (১১৪৪)
    - (১৬) তৃতীয় গোপাল (১১৩০—১১৪৪)
      - (১৮) গোবিন্দপাল (১১৪৪—১১৫৫)

(তারিখগুলি আনুমানিক, সঠিক তারিখ সম্পর্কে মতান্তর আছে।)

১। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, "বাঙ্গালার ইতিহাস", প্রথম খণ্ড, পৃ: ১৫৫—১৫৬ (১৯৭১)

২। History of Bengal (D. W.), Vol. I, Pages 176-177.

সেন রাজবংশ

বীর সেন

|

সামন্ত সেন=যশোদেবী

|

(১) বিজয় সেন=বিলাসদেবী (শূর রাজবংশের কন্যা)
(১০৯৫ ১১২৫-৫৮)

|

(২) বল্লাল সেন=রামদেবী (চালুক্য বংশের কন্যা)
(১১৫৮—১১৭৯)

|

(৩) লক্ষ্মণ সেন=তাড়াদেবী / তন্দ্রা দেবী
(১১৭৯—১২০৬)

|

মাধব সেন	(৫) কেশব সেন	(৪) বিশ্বরূপ সেন
	(১২২৫—১২২৮)	(১২০৬—১২২৫)

১। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, "বাঙ্গালার ইতিহাস", প্রথম খণ্ড, পৃ : ২৬২ (১৯৭১)।

২। History of Bengal (D. W.), Page 231.

দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাসের সহিত সম্পর্কিত কয়েকটি ভারতীয় রাজন্যবর্গ।

উড়িষ্যার পূর্বগঙ্গ বংশ

অনন্তবর্মন চোড়গঙ্গদেব (১০৭৭—১১৪৭)
|
কুমারদেব (পুত্র) (১১৪৭—১১৫৬)
|
রাঘব (ভ্রাতা) (১১৫৬—১১৭০)

সোমবংশী বংশ

জন্মেঞ্জয় (৮৫০ - ৮৮৫)
- প্রথম যযাতি (৮৮৫—৯২৫)
- বিচিত্রধর
  - উদ্যোত কেশরী (১০৪০—১০৬৫)

শৈলোদ্ভব বংশ

শৈলোদ্ভব প্রথম রণভিতা
|
মাধব রাজা প্রথম সৈন্যভিতা

দাক্ষিণাত্যের চোল বংশ

প্রথম রাজেন্দ্র চোল ১০১২—১০৪৪)

N. K. Sahu, P. K. Mishra, J. K. Sahu — *History of Orissa*, 1981 Pp. 86, 113, 183, 203.

Mazumdar, Raychowdhury and Dutta, *An Advanced History of India*—1967, Pp. 250-1, 256.

গ্রন্থপঞ্জী

বাংলা

১। রমেশচন্দ্র মজুমদার —বাংলাদেশের ইতিহাস (প্রাচীন যুগ) ১৩৭৭ সাল।

২। নীহাররঞ্জন রায় —বাঙ্গালার ইতিহাস (আদিপর্ব) ১৯৮২।

৩। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় —বাঙ্গালীর ইতিহাস (প্রথম খণ্ড) ১৯৭১।

৪। যোগেশচন্দ্র বসু —মেদিনীপুরের ইতিহাস, ১৩৪৬ সাল।

৫। বিনয় ঘোষ —পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি (দ্বিতীয় খণ্ড) ১৯৭৮।

৬। ত্রৈলোক্যনাথ রক্ষিত —তমোলুকের ইতিহাস ১৯৭২।

৭। যুধিষ্ঠির জানা —বৃহত্তর তাম্রলিপ্তের ইতিহাস ১৩৭১ সাল।

৮। তরুণদেব ভট্টাচার্য —মেদিনীপুর—১৯৭৯।

৯। দীনেশচন্দ্র সরকার —"বন্দরনগরী তাম্রলিপ্ত" (ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে তাম্রলিপ্ত) ১৯৮২।

১০। কল্যাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায়—"তাম্রলিপ্ত সংগ্রহশালা ও গবেষণা কেন্দ্র" দর্শকের নথিতে (Visitors book) মন্তব্য, (২/৭/৭৬)

১১। পরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত —প্রত্নতত্ত্বের আলোকে তাম্রলিপ্ত (নিখিলবঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন, স্মারক গ্রন্থ)—১৯৭৪।
—"তমলুক" ভারত কোষ, তৃতীয় খণ্ড, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ।

১২। কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত —"রাজনৈতিক ইতিহাসে প্রাচীন তাম্রলিপ্ত" (ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে তাম্রলিপ্ত), ১৯৮২।

১৩। রমাপ্রসাদ চন্দ —গৌড় রাজমালা ১৯৭৫।

১৪। অতুল সুর —বাঙালীর নৃতাত্ত্বিক পরিচয় ১৯৭৯।

১৫। " —বাঙালীর সামাজিক ইতিহাস ১৯৭৬।

১৬। নির্মলকুমার বসু —হিন্দুসমাজের গড়ন ১৩৫৬ সাল।

১৭। বিমলচন্দ্র সিংহ —পশ্চিমবঙ্গের জনবিন্যাস ১৩৬২ সাল।

১৮। অশোক মিত্র —পশ্চিমবঙ্গের পূজাপার্বন ও মেলা (তৃতীয় খণ্ড) ১৯৭১।

১৯। ননীগোপাল চৌধুরী —বিদেশী পর্যটক ও রাজদূতদের বর্ণনায় ভারত ১৯৮৪।

২০। অমূল্যচন্দ্র সেন —জৈনধর্ম—১৩৫৮ সাল।

২১। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় —রচনাবলী (প্রথম খণ্ড) ১৩৭৯ সাল।

২২। সরসীকুমার সরস্বতী —পালযুগের চিত্রকলা ১৯৭৫।

পত্রিকা

২৩। ইতিহাস —নবপর্যায় প্রথম/দ্বিতীয় সংখ্যা ১৩৭৩ সাল। "বৈদ্য-অম্বষ্ঠ" (প্রতিবাদ ও উত্তর), দীনেশচন্দ্র সরকার ও রমেশচন্দ্র মজুমদার।

২৪। ঐতিহাসিক —প্রবন্ধ সঙ্কলন ১ম সংখ্যা ১৩৮৩ সাল। "চব্বিশ পরগণার লবণ শিল্প ও মলঙ্গীশোষণ" (১৭৭২—১৭৭৭)।

২৫। " " —৪র্থ সংখ্যা ১৯৭৭ "সপ্তগ্রাম"।

২৬। সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা —১৩৮৩ প্রথম/দ্বিতীয় সংখ্যা "প্রথম শূরপালের তাম্রশাসন"।
২৭। " —১৩৮৭ চতুর্থ সংখ্যা "এগরো তাম্রশাসন"।
২৮। " —১৩৯০ তৃতীয় সংখ্যা "ধর্মপালের তাম্রশাসন"।
সব কয়টির লেখক দীনেশচন্দ্র সরকার।

ENGLISH BOOKS

1. Basak R. G. —The History of North Eastern India—1967
2. Biswas S. S. —Taracota Art in Bengal, 1981
3. Dani A. H. —Pre-History and Proto-History of Eastern India—1981
4. Dasgupta P. C.—Archaeological Treasures of Tamralipta—1975.
5. " —"Some Early Indian Literary references of Tamralipta" —October 1953.
6. Dutta R. C. —The Early Hindu Civilization—1963.
7. Dasgupta S. B.—Obscure Religious Cults.—1976.
8. Ghosh A. (Ed)—Indian Archaeology. A review—1955.
9. Ghoshal U. N.—Studies in Indian History and Culture—1957.
10. Kosambi D. D.—An Introduction to the Study of Indian History, 1956
11. Mazumdar R.C.—History of Bengal, Vol. I—1968 (D. U.)
" —The Classical Account of India—1960.
" —Ancient India—1967.
12. Mazumdar, Roy Chowdhary, Dutta —An Advanced History of India—1967.
13. Majumdar R.C. (Ed)—History and Culture of the Indian people. *Bharatiya Vidyabhaban*. Vol—II, Vol—III, IV, V. 1954, 1955, 1967
14. Mukarjee R. K.—The Gupta Empire—1959.
" —Hindu Civilization. Vol—I, II—1951
" —Ancient Indian Education—1960.
15. Maiti S. K. —Economic life of the Northern India in the Gupta period—1957.
16. Nioygi P. —The Economic History of Northern India—1962.
17 O'Mally —District Gazetteer, Midnapore—1911
18. Roy N. R. —"Tamralipta and Ganga", Geographical review of India—Vol-41, No-3, Sept.—1979
19. Sahu N. K., Mishra P. K., Sahu J. K. —History of Orissa—1981
20. Saraswati S. K.—Early Sculpture in Bengal—1962

21. Sen B. C. —Some Historical Aspects of the Inscriptions of Bengal—1957
22. Smith V. S. —The Early History of India—1957
23. Thapar R. —The History of India, Vol-I—1966
24. Tiwari S. P. —Comprehensive History of Orissa—1983
25. Wheeler S. M. —Early India and Pakistan, No Date.
,, —Cambridge History of India, Vol—1955.
26. A Comprehensive History of India, Vol-II—1957, Vol-III, Part-I—1981, Part—II 1982.
27. Bengal Past and Present, "Monuments of Midnapore", Adris Banerjee, May-Dec—1974.
28. ,, —"Economic Change and the Santals of West Bengal", E. Duyker, January-Dec—1982.

প্রাচীন বঙ্গদেশের সামগ্রিক ইতিহাসের পটভূমিকায়, দক্ষিণ পশ্চিম বঙ্গের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের তথ্যনিষ্ঠ ও গবেষণামূলক প্রথম বিস্তারিত মূল্যায়ন।

কান্তি প্রসন্ন সেনগুপ্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের কৃতী ছাত্র। বর্তমানে তাম্রলিপ্ত মহাবিদ্যালয়ে ইতিহাস বিভাগে অধ্যাপনা করেন।

ISBN : 81-7074-004-5

প্রচ্ছদ : অমল শঙ্কর মৈত্র

Rs. 25.00

কে পি বাগচী এ্যাণ্ড কোম্পানী
২৮৬ বি বি গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০১২